শিক্ষায় পথিকৃৎ

বিভুরঞ্জন গুহ

শিক্ষায় পথিকৃৎ

শ্রীবিভুরঞ্জন গুহ, এম্.-এ.
অধ্যাপক, গুরুচরণ কলেজ, শিলচর
পূর্ব অধ্যাপক : কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ ;
'শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা', 'অবাধ্য শিশু ও শিক্ষা সমস্যা'
প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৮সি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

প্রথম সংস্করণ : কার্তিক, ১৩৬৩
দ্বিতীয় সংস্করণ : আশ্বিন, ১৩৬৫

মূল্য—৪'৫০ নঃ পঃ

মুদ্রাকর : শ্রীগঙ্গারাম পাল
মহাবিদ্যা প্রেস
১৫৬, তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

স্বর্গগতা মাতৃদেবী

ও

দেবতুল্য পিতৃদেবের

শ্রীচরণে

নিবেদন

আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে বহু পরীক্ষা ও পরিবর্তন চলিতেছে। য়ুরোপ ও আমেরিকার তো কথাই নাই, আমাদের দেশেও অন্ততঃ দুইটি উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা বর্তমান কালে হইতেছে; একটির প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ, আর একটির প্রবর্তক গান্ধীজি। স্বাধীনতার পর শিক্ষার ক্ষেত্রে নূতন জোয়ার আসিয়াছে। সকলেই একমত, বর্তমানের শিক্ষাপ্রণালীর আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে নানা চিন্তা, আলোচনা ও পরিকল্পনা গঠন চলিতেছে। কিন্তু আমাদের দেশে ও অন্যান্য দেশে শিক্ষাসংস্কারকগণ যে সব পরীক্ষা করিয়াছেন এবং যে শিক্ষাদর্শকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাহা জানা থাকিলে ভবিষ্যৎ পথনির্দেশের সহায়তা হইতে পারে। সেই উদ্দেশ্যেই এই পুস্তকখানা রচিত হইল। সহজ ভাষায় শিক্ষার ক্ষেত্রে যাঁহারা নূতন পথের সন্ধান দিয়াছেন তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও শিক্ষানীতি আলোচিত হইয়াছে। শিক্ষক-শিক্ষণের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে ইহা অবশ্য পাঠ্য, কিন্তু দেশের অগণিত সাধারণ পাঠকেরও এ বিষয়ে ঔৎসুক্য আছে তাহা নিশ্চিত জানি। নানা মাসিক পত্রিকায় গত দুই বৎসর যাবৎ এই পুস্তকে সন্নিবেশিত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছে এবং তখন হইতে অনেক কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকা এ বিষয়ে নানা প্রশ্ন করিয়াছেন, সাহিত্য সভায় আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং, আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা অনেকেই এ জাতীয় চিন্তায় আনন্দ পান তাহা নিঃসন্দেহ।

শিক্ষার ইতিহাসের ধারা রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারার চেয়ে কম মনোহারী নয়। দুই বৎসর পূর্বে 'শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েকপাতা'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুত কালে, দৈবাৎ কুইক্-এর 'এসেস অন্ এডুকেশন্যাল্ রিফর্মস' বইখানা হাতে আসে। চিত্তাকর্ষক উপন্যাসের মত বইখানা আমাকে আকর্ষণ করে। তার পরে আমার শ্যালিকা অধ্যাপিকা শান্তি দত্ত এম. এ. এড্ (লণ্ডন) এর সঙ্গে পরামর্শক্রমে এই বিষয়ে প্রবন্ধগুলি লিখিতে আরম্ভ করি। সুদূর মফঃস্বল সহরের বেসরকারী কলেজে বসিয়া পুস্তকাদি সংগ্রহ করা সহজ ছিল না। তাঁহার নিজের সংগৃহীত 'নোটস্' দিয়া, পুস্তকাদি দিয়া, আলোচনা করিয়া, প্রুফ্ দেখিয়া দিয়া ও আরও নানা বিষয়ে শ্রীমতী শান্তি আমাকে বহু

সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ তাহাতে ধন্যবাদ জ্ঞাপনটা সূক্ষ্ম পরিহাস বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, তাই নিরস্ত রহিলাম।

এ বিষয়ে যাঁহাদের কাছে আমি বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি তাহার মধ্যে আমার অগ্রজতুল্য বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের নাম প্রথমেই স্মরণ করি। তাঁহার স্নেহের ঋণ অপরিশোধ্য। কুমিল্লা ভিক্‌টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ জনাব আখতার হমীদ্ খান (পূর্বতন আই. সি. এস্) এর নিকটও আমি ঋণী। তিনি লাইব্রেরীতে বই আনাইয়া দিয়া ও সতত উৎসাহ দিয়া আমার কাজ সহজ করিয়াছেন। বন্ধুবর অধ্যাপক সুধীরকুমার সেন এম. এ. ও তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্মিনী শ্রীযুক্তা সুধা সেন এম. এ. আমার প্রতি প্রীতিবশাৎ অধিকাংশ প্রবন্ধ পড়িয়া ও আলোচনা করিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীমতী চিন্ময়ী বসু বি-এ বি-টিও পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া দিয়া, আলোচনা করিয়া, আমার কাজে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাকে আশীর্বাদ জানাই।

আমি তাঁহাদের নিকট অপরিচিত হইলেও এই প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া শ্রী কে. কে. মুখার্জি এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া, অধ্যক্ষ শ্রীযুক্তা নলিনী দাস মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়া এবং অধ্যক্ষ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায় তাঁহার মূল্যবান অভিমত দিয়া আমাকে চিরঋণী করিয়াছেন। ইহা তাঁহাদের মহৎ হৃদয়ের পরিচায়ক। এই উপলক্ষে আমি বেদনার সহিত আমার দেবচরিত্র শিক্ষক ৺অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য্য ও শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ্ ৺অধ্যক্ষ জিতেন্দ্রমোহন সেনের কথা স্মরণ করি। তাঁহারা এ পুস্তক লিখিতে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়াছেন।

আমি দেশী ও বিদেশী বহু লেখকের পুস্তক ও প্রবন্ধ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি, এ কারণ তাঁহাদের কাছে সর্বান্তঃকরণে ঋণস্বীকার করিতেছি। এই প্রবন্ধগুলির মতামত সম্পর্কে আমি মৌলিকতা দাবী করি না। যদি সহজ ভাষায় বিভিন্ন শিক্ষা-ব্রতীর শিক্ষাদর্শ সর্বসাধারণের নিকট, বিশেষ করিয়া শিক্ষক-শিক্ষণের ছাত্রছাত্রীদের নিকট উপস্থাপিত করিতে পারিয়া থাকি, তাহা হইলে নিজের শ্রম সার্থক মনে করিব। আমি জিজ্ঞাসু ছাত্রের মত অধ্যবসায়ের সঙ্গে মনীষীদের চিন্তা ও বক্তব্য বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং যতটা সহজে তাহা বুঝাইতে পারা যায় সে চেষ্টা করিয়াছি। সে চেষ্টায় কতটা সফল হইয়াছি জানি না।

ভগবানের অনুগ্রহে আমাদের 'শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েকপাতা' পুস্তকখানা শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ পাঠকদের নিকট যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। তাঁহারা এই পুস্তকখানাকেও অনুরূপ আনুকূল্য করিবেন এই আশা করিতেছি।

পুস্তকের কোন ভুল ত্রুটি থাকিলে তাহার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে, অথবা ইহার উৎকর্ষ বিধানের জন্য প্রস্তাব করিলে নিতান্ত বাধিত হইব।

এ প্রবন্ধগুলির অধিকাংশ 'শিক্ষক', 'মন্দিরা', 'দিগন্ত' ও 'অঙ্গনা'য় ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সব পত্রিকার কর্তৃপক্ষ এই লেখাগুলি এখন একত্র পুস্তকাকারে প্রকাশের অনুমতি দিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাই।

৭ জে, এস. আর. দাস রোড
কলিকাতা—২৬

নিবেদক
বিভুরঞ্জন গুহ

ঈশ্বরানুগ্রহে পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণের সব বই ফুরাইয়া যাওয়াতে অতি দ্রুত দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিতে হইল। সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও সামান্য দুই-একটি ভ্রমসংশোধন ভিন্ন, পরিবর্তন কিছু করা সম্ভব হইল না। যাঁহারা পুস্তকখানা পাঠে প্রীত হইয়াছেন এবং উপকৃত হইয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন তাঁহাদের আন্তরিক সাধুবাদ জানাই।

১৮ই আষাঢ়, ১৩৬৫
৭ জে, এস. আর. দাস রোড
কলিকাতা—২৬

বিনীত
বিভুরঞ্জন গুহ

ভূমিকা

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিভুরঞ্জন্ গুহ প্রণীত 'শিক্ষায় পথিকৃৎ' পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিবার সুযোগ পাওয়াটিকে আমি সত্যই সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিতেছি। মুদ্রিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বইখানি আমি আগাগোড়া পড়িয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি।

পুস্তকাকারে বাহির হইবার পূর্বে যখন অধ্যায়গুলি 'শিক্ষক', 'মন্দিরা' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধাকারে বাহির হয়, তখন হইতেই প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে আমি আগ্রহশীল ছিলাম। ঐ সময় হইতেই আমি শিক্ষায় পথিকৃৎগণের অবদান সম্বন্ধে যত্নসহকারে পড়িয়াছি এবং আমার বিভাগের ছাত্রছাত্রীগণের সহিত ও সহকর্মী অধ্যাপকগণের সহিত প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে সম্যক্ আলোচনা করিয়াছি।

পুস্তকের নামটি বড় ভাল লাগিয়াছে। আমার মনে হয়, অধ্যাপক গুহের এই নামকরণটির ইংরাজী 'Great Educators' বা 'Reformers of Education' এই নামকরণ অপেক্ষা অনেকাংশে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। সত্যই এই সকল শিক্ষাগুরু পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্যজগতের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রকৃত পথ-প্রদর্শন করিয়াছেন। 'Great' এই বিশেষণ দ্বারা কিম্বা 'Reformer' এই আখ্যা দ্বারা ঠিক 'পথ প্রদর্শনের' কথা নাও বুঝাইতে পারে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে ফরাসী শিক্ষাব্রতী জ্যঁা জ্যাকস রুশো হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতীয় দার্শনিক শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি পর্যন্ত যে আটজন পথিকৃৎ সম্পর্কে অধ্যাপক গুহ আলোচনা করিয়াছেন—তাঁহাদের মৌলিক চিন্তাধারাই আজ পৃথিবীর সমস্ত অগ্রগামী শিক্ষাবিদ্গণের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

শিক্ষার ইতিহাসের এই ধারাগুলি সম্পর্কে পরিচিত হইলে শিক্ষাবিজ্ঞান বা শিক্ষাতত্ত্ব বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান সঞ্চয় করা যায়। আমি মনে করি, শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকার পক্ষে এই পরিচয় অপরিহার্য। কেননা, Principles of Education (শিক্ষানীতি), Educational Psychology (শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান), Method of Teaching (শিক্ষা-প্রণালী) প্রভৃতি বিষয়গুলি আর কিছুই নয়,—উপরিউক্ত পথপ্রদর্শক মনীষীবৃন্দেরই শিক্ষানীতি, শিক্ষা-মনস্তত্ত্ব এবং শিক্ষাপ্রণালী সম্পর্কে মতবাদ।

গ্রন্থখানির কয়েকটি বিশেষত্ব আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছে। সেগুলি এই :—

(১) কোনও কবি বা লেখক সম্পর্কে সমালোচনা করিতে হইলে বা তাঁহাদের রচনা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে—তাঁহাদের জীবন সম্পর্কে কিছু জ্ঞান অত্যাবশ্যক। আলোচ্য পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার প্রত্যেক শিক্ষাব্রতীর শিক্ষানীতি বা শিক্ষায় অবদান বিষয়ে আলোচনা করিবার পূর্বে তাঁহাদের জীবন-কাহিনীগুলিকে প্রবন্ধের প্রারম্ভেই ভূমিকাস্বরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

(২) পথিকৃৎগণ রচিত মূল রচনা হইতে সারগর্ভ ও সময়োচিত উদ্ধৃতিগুলি (Quotations) পাঠক-পাঠিকাগণকে প্রভূত সাহায্য করিবে এবং তাঁহাদের নিকট ঐ সকল শিক্ষাগুরুর গ্রন্থাবলী পাঠ করিবার প্রেরণা যোগাইবে।

(৩) শিক্ষার ইতিহাস বিষয়ক এই অংশটি সম্পর্কে ইংরাজীতে লেখা পুস্তক প্রধানত হইল Monroe, Graves, Rusk, Quick, Boyd, Good প্রভৃতি। বর্তমান পুস্তকে গ্রন্থকার উপরিউক্ত পুস্তকগুলির এবং আরও বহু পুস্তকের সারবস্তুর একত্রে সুনিপুণ সমাবেশ করিয়াছেন। ফলে, এই একখানি পুস্তক পাঠেই ছাত্রছাত্রীগণ ঐ সকল গ্রন্থের সারমর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। পৃষ্ঠার নীচে নীচে Reference পুস্তকগুলির নাম, গ্রন্থকারের নাম, অধ্যায়, পৃষ্ঠা, নম্বর ইত্যাদি দেওয়া আছে।

(৪) প্রত্যেক প্রবন্ধের শেষভাগে পথিকৃৎগণের মধ্যে তুলনামূলক সমালোচনা (Comparative estimate)-গুলি গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য, সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচায়ক। ইহাতে ছাত্রছাত্রীগণের সমস্ত পথিকৃতের অবদানগুলি সুষ্ঠুভাবে বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য হইবে।

(৫) চলিত ভাষা ব্যবহার করায় এবং আগাগোড়া রচনাভঙ্গী সরল ও প্রাঞ্জল হওয়ায় পুস্তকখানি সুপাঠ্য ও সহজবোধ্য হইয়াছে।

এক কথায়, বাংলাভাষায় লেখা শিক্ষার ইতিহাসের এই বিশেষ অংশ সম্পর্কে ইহাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য পুস্তক। ইহা পাঠ করিয়া শুধু আমাদের বি-টি বা এম্.এড্ বিভাগের ছাত্রছাত্রী কেন, সাধারণ পাঠকবর্গ, অভিভাবক-অভিভাবিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অর্থাৎ যাঁহারাই 'শিক্ষা' সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও চিন্তা করেন—তাঁহারা সকলেই যথার্থ উপকৃত হইবেন এবং আনন্দ পাইবেন। বাংলা ভাষায় ঠিক এইরূপ একখানি পুস্তকের অভাব ছিল। অধ্যাপক গুহ সে অভাব মোচন করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। আমি নিঃসন্দেহে বলিতে

পারি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত ছাত্রছাত্রীগণও (Research students) এই পুস্তকপাঠে লাভবান্ হইবেন। আমি ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

আমি আশা করি, লেখক পরবর্তী সংস্করণে বর্তমান বি-টি সিলেবাসের বহির্ভূত হইলেও বিশেষ করিয়া শিক্ষাগুরু জন্ কমেনিয়াস্, শিক্ষাব্রতী জন্ লক্ এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষাবিৎ হার্বার্ট স্পেন্সার সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়া শিক্ষার ইতিহাসের এই ধারা, যাহাকে নদীর ধারা বা প্রবাহের সহিত তুলনা করা চলে, তাহাকে আরও একটু সুসংবদ্ধ করিবেন।

১৬১, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড,
কলিকাতা-২৬
২২শে অক্টোবর, ১৯৫৬

কে. কে. মুখার্জি
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাতত্ত্বের রীডার এবং টিচার্স ট্রেনিং বিভাগ ও পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ

মুখবন্ধ

"শিশুর ক্ষুদ্র চরণে জাতি অগ্রসর হয়"—যুগে যুগে পথপ্রদর্শক শিক্ষাবিদ্গণ এই কথাই স্মরণ করিয়ে দেন। ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম মন্ত্রগুরু জঁ্যা জ্যাক্স্ রুশো অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই শিশুর জন্মগত অধিকারের দাবী জানান—সে দাবী মধ্যযুগীয়-বিদ্যালয়-কারা হতে মুক্তিলাভের দাবী, সে দাবী সহজ, স্বাভাবিক সুশিক্ষার দাবী।

সুইজারল্যাণ্ডের দরদী শিক্ষক পেস্তালৎসী সেই সহজ স্বাভাবিক শিক্ষার পরীক্ষায় রত হলেন। শিশুশিক্ষার মূলমন্ত্র তিনি শিশুর কাছেই শিখতে চাইলেন।

য়ুরোপীয় শিশুশিক্ষাকে মনস্তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপন করতে চাইলেন হার্বার্ট।

শিশুচারাগুলিকে ফুলে-ফলে কিশলয়দলে পরিণত সুন্দর করে তুলবার জন্য মানুষ-মালী ফ্রোএবেল তাঁর শিশুকানন রচনা করলেন।

সক্রিয় শিশুকে স্বাধীনভাবে বিকশিত হবার সুযোগ দেবার জন্য স্ব-ক্রিয় শিক্ষা-পদ্ধতি গঠন করলেন মাদাম মন্তেসরী।

প্রথমে এই সকল শিক্ষাগুরুর গুটিকতক মন্ত্রশিষ্য মাত্র নূতন শিশুশিক্ষার দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। ক্রমে ক্রমে শিক্ষক সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী। পুরাতনপন্থী অচলায়তনগুলি ভেঙ্গে পাশ্চাত্যদেশের সর্বত্র সজীব সার্থক শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠল।

কিন্তু আমাদের দেশের শিশুশিক্ষা আজো ভয়াবহরূপে সঙ্কীর্ণ ও পুস্তক-কেন্দ্রিক।

শিশুকাল হতে এই শ্বাসরোধকারী নির্জীব শিক্ষার নিষ্পেষণে আমাদের ছেলেমেয়েরা কেবল পুঁথিগত বিদ্যাই আয়ত্ত করে—তাদের বোধশক্তি, বিচার-শক্তি বা কল্পনাশক্তির বিকাশ হয় না; চিত্তের প্রসার বা চরিত্রের বলিষ্ঠতা সাধন হয় না। আমাদের শিক্ষায় আনন্দ নাই, নবীনতা নাই, স্বাধীন প্রচেষ্টার সুযোগ নাই, সহজ প্রাণশক্তির স্বাভাবিক বিকাশ নাই।

দেশ স্বাধীন হয়েছে আজ দশ বৎসর হতে চলল। নব জাগ্রত প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় নূতন নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনায়। কিন্তু সকল আয়োজন ব্যর্থ হবে

যদি না স্বাধীন দেশের নাগরিক গড়ে তুলবার উপযুক্ত শিক্ষালয় গঠন করা সম্ভবপর হয়। মহাত্মাজী প্রদর্শিত বুনিয়াদী শিক্ষার পথ ভারতসরকার নির্বাচন করেছেন। এটি আশার কথা সন্দেহ নেই, কিন্তু শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে যাঁরা হাতে-কলমে কাজ করেন, তাঁদের প্রাণে আজো সাড়া জাগে নি। আমাদের শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীজীর বাণী যেমন শিক্ষক-সাধারণের মধ্যে ব্যাপক ভাবে প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন দেশবিদেশের সকল পথ-প্রদর্শকের নির্দেশ চয়ন করে এনে আমাদের নূতন শিক্ষার পথটিকে সুগম করে তোলা। এই গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনের জন্য বহুল মালমসলার প্রয়োজন ; এবং তারই একটি মূল্যবান অংশ সরবরাহ করেছে শ্রীবিভুরঞ্জন গুহের নব প্রকাশিত গ্রন্থ 'শিক্ষায় পথিকৃৎ'।

বিশেষরূপে যাঁদের প্রেরণায় সমগ্র পাশ্চাত্য দেশের শিশুশিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সম্ভবপর হয়েছিল, তাঁদের বাণী সহজ মাতৃভাষার মাধ্যমে পরিবেশন করবার জন্য বাঙালী শিক্ষক-পাঠক শ্রীগুহ মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ হবেন। প্রত্যেকটি মনীষীর শিক্ষানীতি ও পদ্ধতি তৎকালীন সমাজ ও ভাবধারার পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্টরূপে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাঁদের নিজেদের রচনা ও তাঁদের সম্বন্ধে বহু প্রামাণ্য পুস্তক হতে উদ্ধৃতি এবং সুচিন্তিত সমালোচনাগুলি পাঠকের বিচারবোধের সহায়তা করে।

শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে যাঁরা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে যুক্ত আছেন, অথবা শিক্ষণ-শিক্ষা মহাবিদ্যালয়ে যাঁরা প্রস্তুতি লাভ করছেন, তাঁরা সকলেই এই বইটি পড়ে উপকৃত হবেন বলে বিশ্বাস করি।

নলিনী দাস

৪।১০।৫৬

অধ্যক্ষ : উইমেন্‌স্ ট্রেনিং কলেজ,
হেষ্টিংস হাউস, কলিকাতা

অভিমত

শিক্ষণ-শিক্ষার্থী ও অধ্যাপকমণ্ডলীর নিকট সুপরিচিত অধ্যাপক বিভুরঞ্জন গুহের 'শিক্ষায় পথিকৃৎ' বইখানির কতক অংশ পড়িয়া খুবই আনন্দিত হইলাম। এই বইএ তিনি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ রুশো, পেস্তালৎসি, হার্বার্ট, ফ্রোএবেল, মন্তেসরী, ডিউই, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর শিক্ষানীতি ও পদ্ধতির আলোচনা অতি সুন্দরভাবে করিয়াছেন এবং প্রাঞ্জল ভাষার সাহায্যে বিষয়বস্তু সরল, সরস ও উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার এই বই কেবল পরীক্ষার্থী নয়, সকল শিক্ষানুরাগীর নিকট সমাদর লাভ করিবে।

ডেভিড্ হেয়ার ট্রেনিং কলেজ,
কলিকাতা
২৩।১০।৫৬

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায়
অধ্যক্ষ : ডেভিড্ হেয়ার ট্রেনিং কলেজ
কলিকাতা

বিদ্রোহী শিক্ষাব্রতী জঁ্যা জ্যাকস রুশো

জীবন ও তৎকালীন সমাজ

"It was the best of times, it was the worst of times. It was the age of wisdom, it was the age of foolishness; it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity; it was the season of light, it was the season of darkness; "it was the spring of hope, it was the winter of despair........."

চার্লস ডিকেন্স তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "এ টেল অব্ টু সিটিজ" স্বরু করেছেন এ চমৎকার আপাতবিরুদ্ধ কয়টি ছত্র দিয়ে।

এ বর্ণনা হচ্ছে ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে ফ্রান্সের অবস্থার। এক দিকে সম্রাট ও তাঁর সভাসদদের ঐশ্বর্য, প্রাচুর্য, বিলাস ও আড়ম্বর। প্রদীপের নীচেই অন্ধকার; তাই আর একদিকে দেশের কৃষক ও শ্রমজীবীদের অপরিসীম দারিদ্র্য, দুর্দশা, অজ্ঞতা ও কুশ্রীতা। চাকচিক্যময় ভোগ-ঐশ্বর্যে মগ্ন ফ্রান্সের ধনীসম্প্রদায়,—রাজানুগৃহীতের দল, ডিউক, ব্যারনদের দল, সেনাপতিদের দল আর চার্চের প্রধানদের দল—সমস্ত ইউরোপের ঈর্ষ্যা ও অনুকরণের স্থল ছিলেন। তাঁদের ক্ষমতা ছিল অবাধ, স্বযোগ ছিল প্রচুর, জীবনকে উপভোগ করবার সমস্ত সামগ্রীই ছিল তাঁদের করায়ত্ত। রাজ্য-পরিচালনার সমস্ত পদ তাঁদেরই প্রাপ্য ছিল। কিন্তু করভারের কোন অংশ তাঁদের বহন করতে হত না। এই উপরতলায় ছিল অবসরের প্রাচুর্য। তার একটা স্বফল হয়েছিল জ্ঞানের চর্চা, বিজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসা, দর্শনের জিজ্ঞাসা, শিল্প ও চারুকলার অনুশীলন। এইচ. জি. ওয়েলস্ সত্যই বলেছেন এই 'উপরতলার সমাজ' এটাই আশা করেছিল, এ অবস্থা চিরকালই চলবে—এ সামন্ততন্ত্রই সমাজ ও রাষ্ট্রের সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থা। মুষ্টিমেয়ের এই আপাতরম্য জীবন দিয়েই অল্পদৃষ্টি ঐতিহাসিক ফ্রান্স তথা ইউরোপের সভ্যতার জয়গানে মুখর ছিলেন। কত বঞ্চনা, কত উৎপীড়ন, কত দুঃসহ দুঃখের মূল্য দিয়ে এ কৃত্রিম হৃদয়হীন সভ্যতা রচিত, সে কথা বুঝবার মত বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি সেদিন না ছিল অন্ধ শাসক

সম্প্রদায়ের, না ছিল উৎপীড়িত, মূক, অশিক্ষিত জনসাধারণের। শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের উপরই ছিল যত করের ভার, শ্রমের ভার, সেবার ভার। ক্ষেতের ফসলের সামান্য অংশের উপরই ছিল তাদের অধিকার। উপরতলার মানুষদের বিলাস ও আরামের উপকরণ সংগৃহীত হত তাদেরই পরিশ্রমে। আইনতঃ ক্রীতদাস না হলেও পশুর মত মর্যাদাহীন জীবন ছিল তাদের বিধিলিপি। শিক্ষার আলোক, রুচির বিকাশ—এসব বিলাস তাদের জন্যে ছিল না। কিন্তু এ ছিল যেন সুপ্ত আগ্নেয়গিরির শিখরদেশে সাজানো ফুলের বাগান। অসন্তোষের বাষ্প পুঞ্জীভূত হচ্ছিল, বিদ্রোহের বহ্নি ধিকি ধিকি করে প্রজ্বলিত হচ্ছিল। মহাকাল অলক্ষ্যে রচনা করছিলেন মানব-ইতিহাসের একটি পরম উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। উৎপীড়িত মানুষের শৃঙ্খলমুক্তির প্রথম স্পষ্ট উদ্ধত ইঙ্গিত—ফরাসীবিপ্লব। ফরাসী দেশের চিত্তে এ বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ-সংযোগ হয়েছিল দুটি মানুষের চিন্তা, তাঁদের আন্তরিক সত্য-অনুভূতি দিয়ে। তাঁরা বুঝেছিলেন—কত বড় মিথ্যার উপর দাঁড়িয়ে আছে এই অসহ অত্যাচারের যন্ত্র,—এই সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। এঁদের একজনের নাম ভল্‌টেয়ার, আর একজনের নাম রুশো। এঁদের লেখার মধ্য দিয়ে ফরাসী দেশের নিপীড়িত আত্মা যেন আত্মপ্রকাশ করেছিল। অত্যাচারিত মানবের রুদ্ধ আক্রোশ ও ঘৃণা, কৃত্রিম সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ, এ দুটি মানুষের চিন্তা ও লেখার মধ্যে যেন ভাষা পেলো। চরিত্রের উৎকর্ষ দিয়ে বিচার করলে এঁদের একজনও সম্মানের যোগ্য নন। উইল্ ডুরাণ্ট ভল্‌টেয়ার সম্বন্ধে লিখেছেন, "Unprepossessing, ugly, vain, flippant, obscene, unscrupulous, even at times dishonest,—Voltaire was a man with the faults of his time and place, missing hardly any"......রুশোর সম্বন্ধে এ নিন্দা আরো বেশী সত্য। কুইক্ রুশোর সম্বন্ধে লিখেছেন, "A vagabond without family-ties or social position of any kind, with no literary training, with little knowledge and in conduct at least, with no morals." তা ছাড়া রুশোর চিন্তা ও লেখায় স্বতঃবিরোধিতার অন্ত নেই—তবুও এ দুটি ব্যক্তির অদ্ভুত সত্যনিষ্ঠা, নির্ভীকতা, মানবপ্রেম ও বাগ্মিতা ফরাসীবিপ্লবকে সম্ভব করে তুলেছিল, —নিপীড়িত মানুষকে সার্থকতর জীবনের আশায় উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল। তাই তাঁদের সহস্র ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁরা চিরকাল মানবসমাজের নমস্য হয়ে থাকবেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ফরাসী দেশে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার জন্যে যে আন্দোলন অঙ্কুরিত হচ্ছিল—সে আন্দোলনের চিন্তানায়ক ছিলেন ভল্‌টেয়ার। ভল্‌টেয়ারের বিশেষত্ব হল তাঁর শাণিত যুক্তিবাদ ও তীক্ষ্ণ পরিহাসকুশলতা। ধর্মযাজকদের, স্বৈরতন্ত্রের ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী অগ্নি-উদ্‌গিরণ করেছিল। প্রচলিত আচারের বিরুদ্ধে যুক্তি ও মননশীলতাকে তিনি স্থান দিলেন। কিন্তু যে যুক্তি ও চিন্তার স্বাধীনতার জন্য তিনি সংগ্রাম করেছিলেন তা শুধু অভিজাত সম্প্রদায়ের জন্যই ছিল। সে স্বাধীনতা ছিল জনগণের আয়ত্তের বাইরে। কিন্তু রুশোর মধ্যে যুক্তির চেয়ে আবেগ প্রধান, তাই তাঁর আবেদন ছিল ব্যাপকতর। তাঁর বৈপ্লবিক ভাবনা তাই দেশের অগণিত সাধারণ মানুষকেও প্রভাবান্বিত করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্সের চিন্তাজগতে বিদ্রোহ নূতন রূপে দেখা দিল। অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জনগণের দাবি, বুদ্ধিবাদের বিরুদ্ধে স্বভাববাদের জেহাদ ঘোষিত হল। এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন রুশো। (Monroe : A Brief History of Education)

সে হিসাবে ফরাসীবিপ্লবের ভূমিকা-রচনাকারী হিসাবে তাঁর স্থান ভল্‌টেয়ারের চেয়ে উচ্চে। রুশোর চিন্তাধারা তৎকালীন ধর্মসাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি সমস্ত ক্ষেত্রেই অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তার প্রধান কারণ সে যুগের প্রয়োজন, সে যুগের আশা ও আকাঙ্ক্ষা রুশোর চিন্তার মধ্যে যেন স্পষ্ট রূপ পেয়েছিল। রুশো এক হিসাবে ফরাসীবিপ্লব-যুগের স্রষ্টা একথা সত্য, কিন্তু তার চেয়েও বোধ হয় একথা সত্য যে, তিনি সে যুগের সৃষ্টি। তাঁর চিন্তার বহু অংশ ভবিষ্যৎ পৃথিবী অসম্পূর্ণ, একদেশদর্শী এবং সামঞ্জস্যহীন বলে প্রমাণ করেছে। কিন্তু তথাপি শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর যে অবদান, তার মূল্য চিরদিন স্বীকৃত হবে। এ সম্বন্ধে কুইক্ লিখেছেন, "The writings of Rousseau and the results produced by them are among the strangest things in history; and especially in matters of education it is more than doubtful if the wise man of the world Montaigne, the Christian philanthropist Comenius or that 'slave of truth and reason' the philosopher Locke, had half as much influence as this depraved serving man."

আমরা সেই অদ্ভুত সফল শিক্ষাবিদ্ রুশো সম্পর্কেই আলোচনা করব।

একথা সত্য যে রুশোর চিন্তা ও আদর্শ মূলতঃ নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক কিন্তু

মধ্যযুগীয় সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অচলায়তনকে ধ্বংস না করে স্বাধীন চিন্তা ও কর্মের নবযুগ প্রবর্তন সম্ভব ছিল না। তাই দার্শনিক হিসাবে রুশো খুব উল্লেখ-যোগ্য না হলেও তাঁর চিন্তার সামাজিক ও ঐতিহাসিক মূল্য সামান্য নয়। বারট্রাণ্ড রাসেল তাঁর "ওয়েষ্টার্ণ ফিলোজফিক্যাল থট্" গ্রন্থে লিখেছেন, "Whatever may be our opinion of his merits as a thinker, we must recognise his immense importance as a social force." আর কুইক্ তাঁর "এসেজ্ অন্ এডুকেশনাল রিফরমার্স" বইতে মন্তব্য করেছেন, "Europe had outgrown the ideas of the Middle Age and the framework of society which the Middle Age had bequeathed, had waxed old and was ready to vanish as soon as any strong force could be found to push it out of the way...Here then was the need of some destructive power that should remove and burn up much that had become mere obstacle and encumbrance. This power was found in the writings of Rousseau which appeared in France about the middle of the century."

রুশোর আবেগময় এবং সামঞ্জস্যহীন শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে তাঁর জীবনও কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। সে জীবনকাহিনীর মধ্যে এমন অনেক জিনিস আছে যা কুশ্রী ও রুচিবিরুদ্ধ, কিন্তু তাঁর চিন্তাধারা পরিবেশ দ্বারা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রভাবান্বিত, তাই তাঁর জীবনকাহিনী কিছুটা জানা দরকার। সমস্ত শাসন ও সংযমের বিরুদ্ধে বিরূপতা, সমাজের নিষ্ঠুরতা ও অবিচারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, প্রকৃতির উন্মুক্ত সৌন্দর্যের প্রতি গভীর আকর্ষণ, দরিদ্র সাধারণ মানুষের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি তাঁর শিক্ষানীতির বৈশিষ্ট্য এবং এর মূল তাঁর জীবনেতিহাসেই খুঁজে পাওয়া যাবে। তাঁর আত্মজীবনী (Confessions) ইতিহাসের উপাদান হিসাবে মূল্যবান।

জ্যাঁ জ্যাকস রুশো (১৭১২-১৭৭৮) উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারে জেনীভার অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা তাঁর জন্মকালেই মারা যান। তাঁর মাতার মৃত্যুর পর শিশু রুশোকে এক নিকট আত্মীয়া লালন-পালন করেন। তিনি অত্যন্ত আদর দিয়ে তাঁকে নষ্ট করেন। ফলে বাল্যকাল থেকেই রুশো একগুঁয়ে, স্বার্থপর ও অভিমানী হন। কিছু লেখাপড়া তিনি শেখেন, কিন্তু তা সামান্য ও অনিয়মিত। অল্পবয়সেই কিন্তু পাঠস্পৃহা তাঁর যথেষ্ট ছিল। এর জন্যে তাঁর পিতা কতক পরিমাণে দায়ী। তিনি ছিলেন ঘড়ির কারিকর। তাঁর শখ ছিল

রোমাঞ্চকর গল্পের বইএর। তিনি কিশোর রুশোর সঙ্গে রাত জেগে জেগে এ সব বাজে বই পড়তেন। কল্পনাপ্রবণ রুশোর মনে এই উত্তেজনাপূর্ণ কাহিনী খুব সুফলপ্রদ হয় নি। অল্প বয়সেই তিনি পেকে উঠেছিলেন। তবে এতে তাঁর পাঠস্পৃহা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। আর একটু বড় হয়ে তিনি তাঁর ধর্মযাজক পিতামহের পুস্তকাগারে রক্ষিত ইতিহাস-গ্রন্থাদির প্রতি আকৃষ্ট হন। বিশেষ করে প্লুটার্কের "প্যারালাল লাইভস্" তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। সেসব বীরত্বের কাহিনী, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কাহিনী তাঁকে বৈপ্লবিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন করেছিল। তিনি আত্মজীবনীতে লিখেছেন এসব বীরত্বকাহিনী পড়ে তাঁর মনে জেগেছিল "that republican spirit and love of history, that haughty and invincible turn of mind which rendered me impatient of restraint."

আর একটু বড় হয়ে তিনি Bossy নামক গ্রামের বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। গ্রাম্য জীবনের সরলতা ও প্রকৃতির নির্মল সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করে। কিন্তু সেখানে তুচ্ছ অপরাধে তাঁকে গুরুতর শাস্তি পেতে হয়। তাঁর অভিমানী মন এ অবিচার সহ্য করতে পারে নি এবং তখন থেকেই তাঁর মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে শাসন ও শাস্তির ফলে মানুষের মনের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও শুভবুদ্ধি বিকৃত হয়। এটি তাঁর শিক্ষাদর্শের একটি মূলকথা।

তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যান। নানা জায়গায় ঘুরে নানা কাজ তিনি শিখেছিলেন, কিন্তু রীতিমত লেখাপড়া তাঁর হল না। এতে কিন্তু তিনি নানাদেশ ভ্রমণের আনন্দ ও মনুষ্যচরিত্র জানবার প্রচুর সুযোগ পেয়েছিলেন। একদিকে সাধারণ দরিদ্র মানুষদের সরলতা ও হৃদয়বত্তা এবং অন্যদিকে তথাকথিত ভদ্র ও অভিজাতদের কৃত্রিমতা, হৃদয়হীনতা, অন্তঃসারশূন্যতা তিনি খুব ভাল করেই বুঝতে পারেন। কিন্তু নানা কুসঙ্গে পড়ে নৈতিক অধঃপতনও তাঁর ঘটে। চুরি, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, ব্যভিচার ইত্যাদি কোন অপরাধ থেকেই তিনি মুক্ত ছিলেন না। বহু নারীর সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন। নারীজাতির প্রতি তিনি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন না। উনিশ বৎসর বয়সে তিনি স্যাভয় প্রদেশে মাদাম ডি ওয়ারেনস্ নাম্নী সম্ভ্রান্ত মহিলার বাড়ীতে কাজ করতে যান। এঁর সঙ্গে রুশোর অবৈধ সংসর্গ স্থাপিত হয় এবং তাঁর কাছে রুশো কিছু লেখাপড়া শেখেন। কয়েক বৎসর পরেই রুশো এই মহিলাকে পরিত্যাগ করে প্যারিসে চলে যান। সেখানে

নিজ জীবিকা উপার্জনের জন্যে তখন তাঁকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছিল। এ সময় তিনি একটি স্থূলরুচি পরিচারিকা-শ্রেণীর যুবতীর সঙ্গে বসবাস করতে থাকেন এবং এই স্ত্রীলোকটির গর্ভে তাঁর কয়েকটি সন্তান জন্মে। একনিষ্ঠতা তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ হলেও তিনি মৃত্যু পর্যন্ত এই স্ত্রীলোকটিকে ত্যাগ করেন নি, যদিও অবশ্য কখনই তাঁকে স্ত্রীর মর্যাদা দেন নি এবং সন্তানদের শিক্ষারও কোন সুব্যবস্থা করেন নি।

আগেই বলেছি রীতিমত শিক্ষা তাঁর হয় নি, তবুও নিজ চেষ্টায় তিনি বিদ্যা অর্জন করেছিলেন এবং মধ্যবয়সে তিনি সাহিত্য ও রাজনীতি চর্চায় রত হন। তাঁর চিন্তার মৌলিকতা এবং ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি লেখক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। এ বিষয়ে তাঁর জীবনে প্রথম সাফল্য আসে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে, যখন Academy of Dijon-এর একটি রচনা-প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হন। প্রবন্ধটির বিষয় ছিল, "Has the progress of sciences and arts contributed to corrupt or to purify morals?" রুশোর প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যে সমাজের বর্তমান অবনতি ও শোষণমূলক ব্যবস্থার জন্য দায়ী বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও সভ্যতা। আদিম যুগের অসভ্য বর্বর মানুষ ছিল সরল, সাধু, সৎসাহস ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন (the noble savage)। হিংসা, ঈর্ষ্যা বিদ্বেষের পাপে তাদের জীবন জর্জরিত ছিল না। বিজ্ঞান এনেছে জীবনে অনাবশ্যক জটিলতা ও অভাববোধ। সভ্যতা মানুষকে করেছে লোভী ও আত্ম-সর্বস্ব, কুটিল ও অসত্যপরায়ণ; সমাজব্যবস্থা এনেছে মালিকানা ও স্বার্থের সংঘাত। রাষ্ট্রের মূল হচ্ছে অসাম্য ও দুর্বলের প্রতি অবিচার; শিল্প ও সাহিত্য মিথ্যাকে মনোহর করে প্রকাশের উপায়। সমস্ত বিজ্ঞানের মূল মানুষের লোভ, ভয়, নীচতা। এ প্রবন্ধ প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল এবং অল্পদিনেই রুশো লেখক হিসাবে যশস্বী হন। দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও লেখকদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এঁদের মধ্যে ভল্টেয়ার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

পরের বছর এই প্রবন্ধের চিন্তাকে আরো বিস্তারিত করে তিনি দ্বিতীয় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সে প্রবন্ধের বিষয় ছিল, "Discourse on equality"। এ প্রবন্ধে তিনি এই মত প্রকাশ করেছেন যে মানুষের সমাজব্যবস্থা কৃত্রিম। এই সমাজের গড়া আইনকানুন, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকার, পরিবার ও রাষ্ট্র ইত্যাদি সংগঠন (institutions) মানুষে মানুষে ভেদ সৃষ্টি করেছে—সেখানেই

সমস্ত অবিচার ও অত্যাচারের মূল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্বীকাররূপ সর্বনাশা ভুল মানুষ যদি না করত, তবে পৃথিবীতে এত যুদ্ধবিগ্রহ ও অশান্তি আসতো না। মার্কস্‌এর বহু পূর্বে তিনি এই বৈপ্লবিক আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "The first man who having enclosed a piece of ground could think of saying, 'This is mine' and found people simple enough to belive him, was the real founder of civil society. How many crimes, wars, murders, miseries and horrors would not have been spared to the human race by any one who, pulling up the stakes, or filling the trench, could have called out to his fellows : 'Beware of listening to the impostor ! You are undone if you forget that the earth belongs to no one, and that its fruits are for all." এ প্রবন্ধ তিনি ভল্‌টেয়ারকে পাঠিয়েছিলেন। ভল্‌টেয়ার তাঁর প্রবন্ধ পড়ে লিখলেন, "মানুষকে বোকা বানাবার কাজে মানুষের বুদ্ধির এমন কৌশলপূর্ণ ব্যবহার ইতিপূর্বে কখনো হয় নি। আপনার প্রবন্ধ পড়ে সাধ হয় চার পায়ে চলতে সুরু করি। কিন্তু ষাট বছরের বেশী হল সে অভ্যাসটা ছেড়ে দিয়েছি, ওটা এ বয়সে আর নতুন করে শেখা হল না।" রুশোর সঙ্গে ভল্‌টেয়ারের ঝগড়া তখন থেকে শুরু। পরবর্তীকালে তাঁদের ব্যক্তিগত বিরোধ ও তিক্ততা সত্বেও রাজনৈতিক নির্যাতন থেকে তিনি রুশোকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছেন। রুশো কিন্তু ভল্‌টেয়ারকে অপদস্থ করবার কোনো সুযোগই ছাড়েন নি।

১৭৫৪ সালেই তিনি যথেষ্ট যশ অর্জন করেছিলেন। কিন্তু ধর্মযাজক সম্প্রদায় ও রাষ্ট্রকর্ণধারগণ রুশোর প্রতি ক্রমেই বিরূপ হয়ে উঠলেন এবং প্যারিসের ভদ্রতার মুখোসপরা কপট নির্মম আবহাওয়া রুশোর কাছে অসহ্য মনে হতে লাগলো। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মণ্টমোরেন্সি গ্রামের শান্ত সৌন্দর্য ও অনুরাগী কয়েকটি বন্ধুর সাহচর্যের পরিবেশের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে কিছুদিন তিনি আলস্যে কাটান এবং আবার এক দুঃখকর অবৈধ প্রেমে লিপ্ত হন। ১৭৬১ সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "The New Heloise" আর ১৭৬২ সালে ততোধিক প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক গ্রন্থ "The Social Contract", এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ "Emile" প্রকাশ করেন। রুশোর অন্য সমস্ত চিন্তা ও সিদ্ধান্ত যদি ভবিষ্যতে মূল্যহীন বলেও প্রমাণিত হয় তবুও তাঁর "Emile" শিক্ষার ক্ষেত্রে অমর হয়ে থাকবে। "New Heloise" উপন্যাস হলেও তার মধ্যে তাঁর শিক্ষার

আদর্শের আভাস তিনি দিয়েছেন। অপ্রত্যাশিত হলেও তিনি এ বইয়ে বিশুদ্ধ গার্হস্থ্য জীবনের জয়গান করেছেন। শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি মাতাকে প্রধান স্থান দিয়েছেন। তবে "Emile"এ তিনি যে শিক্ষানীতি প্রচার করেছেন, এখানেও তার ইঙ্গিত স্পষ্ট। শিশুর শিক্ষা অর্থ বই পড়ানো আর উপদেশ নয়—তাকে স্বভাব অনুযায়ী সহজভাবে গড়ে উঠবার পথে বাধা না দেওয়া। New Heloise এর মাতা জুলী বলেছেন, "La fonction dont je susis charge nést pas d'élever mes fits, mais de les préparer pour être éleveś"—অর্থাৎ আমার কাজ আমার পুত্রদের শিক্ষাদান নয়। তাদের শিক্ষার জন্যে প্রস্তুত করা।

তাঁর "Social Contract" গ্রন্থ ফ্রান্সে প্রবল আলোড়ন স্থষ্টি করেছিল। এ বইয়ে রুশো এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কল্পনা করেছেন। তৎকালে প্রচলিত রাজাদের শাসন করবার দৈব অধিকার (Divine right of kings) তিনি অসমসাহসিকতার সঙ্গে অস্বীকার করলেন। রাষ্ট্রের প্রধান হবেন জনগণের নির্বাচিত। তিনি জনগণের কল্যাণে রাজ্য পরিচালনা করবেন এবং নিজ কাজের জন্য জনগণের কাছে দায়ী থাকবেন। যখনই তিনি সাধারণের আস্থা ও সহযোগিতা হারাবেন তখনই তাঁকে জনসাধারণ অপসারিত করবে। বর্বর ও অসভ্য জীবনে নানা অস্থবিধা এবং নিরাপত্তার অভাবের জন্যেই বুদ্ধিমান মানুষেরা পরস্পর চুক্তি করে রাষ্ট্র গড়বে, যার ভিত্তি হবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং যার মূল উদ্দেশ্য হবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী আত্ম-বিকাশের স্থযোগ দান। এখানে কিন্তু তাঁর পূর্ববর্তী স্বাভাবিক সমাজ (Natural state)এর কল্পনার পরিবর্তন ঘটেছে। এবং সরল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন স্বাভাবিক বর্বরকে (the noble savage) আদর্শ হিসাবে কল্পনা করা হয় নি। এখানে সভ্য মানুষেরাই রাষ্ট্র গড়বে। তবে এ রাষ্ট্রে শোষণকারী অভিজাত সম্প্রদায়ের স্থান নেই, এবং কৃত্রিমভাবে এখানে অভাব স্থষ্টির অবকাশ নেই, "Russeau......finds the ideal state, not in that of nature but in a society managed by (civilized) people, where simplicity and natural wants control, and aristocracy and artificiality do not exist" তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র হচ্ছে প্রাচীন গ্রীসের ছোট ছোট নগর-রাষ্ট্র (city states), এবং এসব রাষ্ট্রের মধ্যে এথেন্সের চেয়ে স্পার্টাকেই তিনি বেশী পছন্দ করেছেন।

এ পুস্তকের আরম্ভের কয়েকটি ছত্র চিরকাল অমর হয়ে থাকবে এবং

এতে তাঁর দর্শনের মূলসূত্র সরল ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে—"Man is born free, and everywhere he is in chains. One man thinks himself the master of others, but remains more of a slave than they are." তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা অনেক ক্ষেত্রে অবাস্তব, তাঁর natural man নিতান্তই মনগড়া আর গণতন্ত্র সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা বাস্তবিক পক্ষে সহৃদয় একনায়কত্বের সমর্থক।

তাঁর মৌলিক চিন্তার শ্রেষ্ঠ দান "Emile"। এতে তাঁর শিক্ষাদর্শ তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ও নির্ভীকভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর এ গ্রন্থে বর্ণিত শিক্ষানীতি আমরা আর একটি নিবন্ধে আলোচনা করব।

তাঁর এই দুটি গ্রন্থ প্রকাশের ফলে সমস্ত ইউরোপে তাঁর যশ বিস্তারিত হল, কিন্তু ফ্রান্সের কর্তৃপক্ষের তিনি বিরাগভাজন হলেন। উৎপীড়নের ফলে তিনি ফ্রান্স থেকে জেনীভাতে পলায়ন করতে বাধ্য হলেন। জেনীভাও তাঁকে আশ্রয় দিল না। অবশেষে জার্মানীর সম্রাট Frederick the Great দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে Motiers গ্রামে স্থান দিলেন। কিন্তু সেখানেও তিনি নিস্তার পেলেন না। ধর্মযাজক সম্প্রদায় তাঁকে উত্ত্যক্ত করে তুললো এবং গ্রামবাসীরা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হল। তিনি পালিয়ে গেলেন ইংল্যাণ্ডে। সেখানে তিনি Hume ও Burkeএর বন্ধুত্ব অর্জন করলেন। কিন্তু তাঁর দম্ভ ও রুচিহীনতা তাঁর বন্ধুদেরও বিরূপ করে তুললো। তা ছাড়া তখন থেকেই তাঁর মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিল এবং তিনি মিথ্যা কল্পনা করতে লাগলেন—হিউম্ তাঁকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করছেন। তাই ইংল্যাণ্ড থেকে আবার তিনি প্যারিসে পালিয়ে যান এবং বহু দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৭৭৮)। সন্দেহ করা হয়, তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন।

সমস্ত সামাজিক ও নৈতিক বিধিনিষেধ তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল; ভাবপ্রবণতা, অসংযত কল্পনাপরায়ণতা, অতিরিক্ত আত্মাভিমান তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। তবে অবিচার ও অত্যাচারের প্রতি ঘৃণা এবং দরিদ্র ও দুঃখী জনসাধারণের প্রতি গভীর সহানুভূতি এবং প্রকৃতির কোলে শান্ত সরল গ্রাম্যজীবনের প্রতি তাঁর গভীর অনুরক্তি—তাঁর চরিত্রকে সমস্ত গ্লানি সত্ত্বেও মহিমান্বিত করেছে। ফরাসী-বিপ্লবের তিনি স্রষ্টা, কিন্তু এ বিপ্লব (১৭৮৯-১৭৯৫) তিনি দেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু ফরাসীবিপ্লবের তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক। এমন বৈপরীত্য ও

স্ববিরোধিতা খুব অল্প চরিত্রেই দেখা যায়। ফরাসীবিপ্লবে যেমন, তেমনি তাঁর জীবনেও দেখি উচ্চ আদর্শানুরক্তি ও হিংস্র কলুষ, মানবপ্রীতি ও মানুষের প্রতি ঘৃণা, সৌন্দর্যবোধ ও কুশ্রীতা, ভণ্ডামী ও অবিচারের বিরুদ্ধে আক্রোশ, অসহিষ্ণুতা ও নিয়ম-শৃঙ্খলা সম্বন্ধে নেতিবাচক ধ্বংসাত্মক মনোবৃত্তি। এ বিপ্লব হচ্ছে যুক্তির বিরুদ্ধে আবেগের,—পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে দরিদ্র জনসাধারণের,—কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে স্বভাবের—সভ্য নগরজীবনের বিরুদ্ধে সরল গ্রাম্য জীবনের। এ বিপ্লব সার্থক হয় নি। কিন্তু মানুষের চিন্তা ও মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে বিপ্লবের এ বন্যা উর্বর পলিমাটি ফেলে গেছে। রুশো ইউরোপের চিন্তাধারার গতানুগতিকতাকে মস্ত নাড়া দিয়ে গিয়েছেন।

রুশোর শিক্ষানীতি (১৭১২-১৭৭৮)

রুশো তাঁর "এমিল্" (Emile) গ্রন্থে নিজ শিক্ষাদর্শ ও পদ্ধতি সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। এমিল্ ধনিগৃহের পিতৃমাতৃহীন সাধারণ বুদ্ধিমান্ এক ছেলে। এ গ্রন্থে এই কাল্পনিক শিশুর শৈশব থেকে স্বরু করে গার্হস্থ্য জীবনের পূর্ব পর্যন্ত সহৃদয় ও চক্ষুষ্মান্ আদর্শ গৃহশিক্ষকের শিক্ষার ফলে কি করে দেহ, মন, বুদ্ধি ও সামাজিক চেতনা বিকশিত হোল তা বর্ণিত হয়েছে। এমিলের বয়োবৃদ্ধি ও বুদ্ধিবিকাশের স্তর অনুযায়ী এ গ্রন্থ চারটি খণ্ডে বিভক্ত। পঞ্চম খণ্ডে এমিলের ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গিনী 'সোফি'র (Sophie) শিক্ষাপদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। কাজেই এ গ্রন্থ হতে রুশোর সমগ্র শিক্ষাদর্শ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে আমরা সম্যক্ ধারণা করতে পারি।

রুশোর শিক্ষাদর্শের মূলসূত্রটি এমিলের প্রথম ছত্রেই স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে —"Everything is good as it comes from the hands of the Author of Nature ; but everything degenerates in the hands of man,"[১] অর্থাৎ প্রকৃতির সৃষ্টি শুভ ও সুন্দর ; মানুষের কৃত্রিম স্পর্শই ঘটায় যত কিছু বিকার। এমিলের শিক্ষা তাই স্বভাবানুসারী ও কৃত্রিমতা বিরোধী।

রুশোর চিন্তাধারা মূলতঃ নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তার

[১] Payne ; Rousseau's 'Emile,' p. 60

ব্যতিক্রম হয় নি। তিনি প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে উপহাস-বিদ্ধ করেছেন, তাকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেছেন। তাঁর শিক্ষাদর্শে বহু স্বতঃবিরোধিতা ও অসম্ভাব্যতা আছে, কিন্তু তার পেছনে আছে সবল শুভবুদ্ধিসঞ্জাত এই দৃঢ়বিশ্বাস যে, মানুষ মূলতঃ সৎ ও সাধুপ্রকৃতি। জীবনের সমস্ত দুঃখের কারণ কৃত্রিম সমাজব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা। তাই যা গতানুগতিক, যা প্রচলিত তাকে তিনি সর্বত্র অস্বীকার করেছেন—আঘাত করেছেন। তাই শিক্ষার নীতি হিসাবে তাঁর উপদেশ হচ্ছে "যা প্রচলিত, ঠিক তার বিপরীতটিই করবে এবং এতে করেই সবচেয়ে ভাল পথটি পাবে।"

বাইবেল বলেছে মানুষ স্বভাবতঃ দুষ্ট। প্রথম মানব মানবী আদম-ইভের পাপের বোঝা চেপে আছে মানুষের ঘাড়ে। রুশো ঠিক তার উল্টোকথা বললেন, "মানুষ স্বভাবতঃ সৎ, সমাজের কৃত্রিম প্রথা তাকে নষ্ট করে।" তাই রুশোর উপদেশ হচ্ছে স্বভাবে প্রত্যাবর্তন—**Back to nature**। নূতন শিক্ষার প্রথম কাজ হবে সমস্ত কৃত্রিমতা ও গতানুগতিকতা পরিহার। তাঁর শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে রুশো গোড়াতেই বলছেন, "হয়তো আপনারা বলতে পারেন যে এমিলের মত আদর্শ ছাত্র তৈরী করা অসম্ভব। কিন্তু বিশ্বাস করুন, সেই অসম্ভব সাধনই আমার উদ্দেশ্য এবং "এমিল্" নামে গ্রন্থটি সেই শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধেই। এই পুস্তকে শিক্ষার এই দার্শনিক মূলনীতি লেখক প্রচার করেছেন যে মানুষ স্বভাবতঃ সৎ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই তথ্যটিও সমান ভাবে সত্য যে মানুষ বাস্তবিক ভাবে দুষ্ট, কাজেই মানব-হৃদয়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করে সমস্ত বিকৃতির মূল কোথায় তা দেখানো দরকার। এই পুস্তকে এই কাজটিই নির্ভুলভাবে এবং সুবিবেচনার সঙ্গে সম্পন্ন করেছি।"[২]

সে কালের প্রচলিত শিক্ষাকে তিনি তীব্র নিন্দা করেছেন, তীব্র উপহাসে বিদ্ধ করেছেন। সে শিক্ষা ছিল নিতান্ত কৃত্রিম ও অন্তঃসারশূন্য। তার উদ্দেশ্য ছিল 'বাবু' বা 'বিবি' তৈরী করা। সে শিক্ষা ছিল শিক্ষক-তাড়িত, পুস্তকভার-জর্জরিত ও আনন্দহীন। সে শিক্ষায় জোর দেওয়া হত শুধু ল্যাটিন ব্যাকরণ মুখস্থ করার উপর, আর কায়দা-কানুন শেখার উপর। কৌতূহলের উন্মেষ বা ব্যক্তিত্ব বিকাশের কোন চেষ্টাই ছিল না তাতে। মেয়েদের শিক্ষা ছিল আরো নিকৃষ্ট, তাতে বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের বালাই ছিল না; সে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল "চুলটানা বিবিয়ানা শেখানো"। টেইন্ সে কালের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সম্পর্কে লিখেছেন—

---

২ Payne : Rousseau's 'Emile', p. 60

"পুরোনো আমলে ছোট ছেলেরা পড়তে যেত মাথার চুলে পাউডার মেখে, কোমরে ঝুলতো তলোয়ার, বগলের নীচে থাকতো টুপি, গায়ে থাকতো কোট, তাতে ফ্রিল্ লাগানো, আর হাতায় সোনালী কফ্ দেওয়া; মেয়েদের পোষাকও ছিল তেমনি অদ্ভুত, ফ্যাসানেবল্ মহিলাদের পোষাকের হাস্যকর অনুকরণ। তাদের শিক্ষা ছিল প্রধানতঃ চলন, ধরণ আর নাচের মাষ্টারের কাছে নাচ শেখা—কারণ এইটাই ছিল বড় কথা যে বড় হয়ে যেন তারা 'বনেদি ঘরের' চালটা ঠিক রাখতে পারে। কাজেই শিশুকালে সে শিক্ষাই ছিল প্রধান কাজ।"[৩]

শিশুকে কেন্দ্র করেই শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, এ কথাটি তিনিই প্রথম না বললেও, এ কথাটিকে পূর্বাপর অনুসরণ করে, সাহসের সঙ্গে নূতন শিক্ষার পথ তিনি দেখিয়েছেন। শিশুকে শিক্ষা দিতে গেলে শিশুর মনটিকে জানা চাই এবং তার মনের বিকাশের স্বাভাবিক ধারাকেই সুশিক্ষা অনুসরণ করবে—এই কথাটি স্পষ্ট করে তিনি বললেন এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের তিনি সূচনা করলেন, এই জন্যও অন্ততঃ তাঁর নাম শিক্ষাসংস্কারক হিসাবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এতদিন এই কথাটিই চলছিল—শিক্ষক শিক্ষা দান করবেন। অনিচ্ছুক শিশুকে তাড়ন পীড়ন করেই শিক্ষার 'অমূল্যধন' শিক্ষক তাকে পাইয়ে দেবেন। শিক্ষকের পেটে যদি বিদ্যা থাকে, আর হাতে যদি বেত থাকে, তা হলেই ভাল ছাত্র তৈরী হয়। তিনি শিক্ষাকে এই প্রাচীন সংস্কারের নিগড় থেকে মুক্তি দিলেন। কঠিন নিপীড়নের হাত থেকে শিশুদের উদ্ধার করলেন। নূতন শিক্ষা-সংস্কারের পথ দেখালেন। তাঁর এ হৃদয়বত্তা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যে ভবিষ্যৎ মানবশিশু তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। ফ্রেডেরিকা ম্যাক্‌ডোনাল্ড রুশোর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন, "রুশোর অপ্রতিহত বাঙ্ময় কণ্ঠস্বর অমিত তেজে সমগ্র ইউরোপের মানুষের অধিকারের দাবি প্রচার করেছিল, কিন্তু তার চেয়েও তেজে প্রচার করেছিল শিশুর অধিকারের কথা। মানুষের আদিম পাপ ও মজ্জাগত দুষ্প্রবৃত্তি, মধ্যযুগীয় এই বিশ্বাসের উপর স্থাপিত নির্মম শিক্ষাব্যবস্থার অবসান ঘটলো। পেস্তালৎসী (Pestalozzi)-র পূর্বে, ফ্রোএবেল্ (Froebel)-এর পূর্বে এমিলের লেখক এক নূতন শিক্ষাপদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করলেন এবং তিনি আধুনিক সভ্য জগৎকে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে অকারণ নিষ্ঠুরতা এবং তাদের আনন্দ-কোলাহলকে স্তব্ধ করে দেওয়ার পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে শেখালেন। দীর্ঘ

---

৩ Taine : Ancien Regime, p. 137

যুগ ধরে শিশুর জীবনের আনন্দময় প্রভাতকে এ প্রাচীন পদ্ধতি অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখেছিল।"[৪]

শিশু এমিল্-এর শিক্ষা সুরু হল প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনে, স্বভাব অনুযায়ী। তাই 'সহর থেকে দূরে', সমাজের সমস্ত আবিলতা থেকে তাকে সরিয়ে গ্রামের সহজ স্বাভাবিক পরিবেশে লালন-পালনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাকে বিকশিত করে তুলবার কাজে সহায়তা করবার জন্যে আছেন স্নেহশীল, যত্নবান্, মনস্তত্ত্বে অভিজ্ঞ, প্রকৃতির শুভ অভিপ্রায়ে বিশ্বাসী গৃহশিক্ষক। তাঁর সদাজাগ্রত দৃষ্টি রয়েছে এই শিশুটির উপর। এ শিশু অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন নয়, কিন্তু স্বভাব অনুযায়ী শিক্ষার ফলে এমিল্ সুন্দর সুসম্পূর্ণ মানুষে পরিণত হবে। রুশো বলেছেন, "আমি এটা ধরে নিয়েছি যে আমার ছাত্রটি অসামান্য প্রতিভা নিয়ে জন্মেনি, কিন্তু সে জড়বুদ্ধিও নয়। আমি ইচ্ছা করেই তাকে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন বলে কল্পনা করেছি; কারণ সুশিক্ষা দিয়ে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন একটি মনকেও কেমন করে গড়ে তোলা যায় তাই আমি দেখাতে চেয়েছি।"[৫] রুশো সর্বসাধারণের জন্য যে নূতন শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলন করতে চান তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার জন্যই অনাথ ও সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন এমিল্‌কে নির্বাচন করেছেন। এমিল্ কিন্তু দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে নয়, সে অভিজাত সম্প্রদায়ের সন্তান। তার কারণ, রুশোর মতে শ্রমিক শ্রেণীর শিশুরা স্বাভাবিক ভাবে গড়ে উঠবার সুযোগ বরং পায়। তারা জীবন-যুদ্ধের জন্যে স্বাভাবিক ভাবে তৈরী হয়ে ওঠে। কিন্তু ধনীর দুলালের পক্ষে জীবনধারণের জন্যে সংগ্রাম নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। বিলাসিতা ও কৃত্রিমতার মধ্যে শিশুকাল থেকেই তার চরিত্র বিকৃত হয়ে ওঠে। তাই এমন শিশুকে মানুষ করতে হলে, সরল সহজ স্বাভাবিক পরিবেশ এবং সচেষ্ট প্রয়াস ও সুপরিচালনা প্রয়োজন।

রুশোর মতে প্রকৃতির সমস্ত দ্রব্যের মত মানুষের মনেরও ক্রমবিকাশ আছে। সেই ক্রমবিকাশের স্তর অনুযায়ী শিক্ষারও বিভিন্ন স্তর আছে। সকল শিক্ষারই বিশেষ বিশেষ সময় আছে। এ কথাটিও মনে রাখতে হবে যে সব শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ একপ্রকার নয়, তার গতিও সমান নয়। তাই গৎ-বাঁধা একই ধরণের শিক্ষা হানিকর। প্রাণচঞ্চল শিশুর কাছে খেলাই স্বাভাবিক অবস্থা, তাই শৈশবে তাকে ঘরের মধ্যে বন্দী করে পুঁথিপত্রের বোঝা চাপিয়ে দিলে সে বিদ্রোহ

৪ F. Macdonald : Rousseau
৫ Payne : Rousseau's Emile, Vol. 1

করবেই। তার স্বাভাবিক আগ্রহ ও প্রয়োজন স্বভাবের নিয়ম অনুযায়ীই যথা-সময়ে আত্মপ্রকাশ করবে এবং তার জীবনের স্বাভাবিক বিকাশের ছন্দ অনুযায়ীই তার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। মানুষের প্রবৃত্তি যেমন ক্রমবিকাশধর্মী ও গতিশীল, শিক্ষাও তাই হবে। তা না হলে শিক্ষা নিষ্ফল ও শক্তিক্ষয়কারক হয়। রুশো তাই বললেন, "কখন কোন্ জাতীয় শিক্ষা শিশু সর্বোত্তম ভাবে গ্রহণ করতে পারবে তার নির্দিষ্ট সময় আছে—আর সে সময়টি হচ্ছে শিশুর নিজের মধ্যে সেই প্রয়োজনটি যখন দেখা দেবে।"

শিশুর স্বাভাবিক পরিণতিকে তিনি চারটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন—শৈশব (জন্ম থেকে পাঁচ বৎসর), বাল্য (পাঁচ থেকে বার বৎসর), কৈশোর (বার থেকে পনরো বৎসর) ও যৌবনাগম (পনরো থেকে কুড়ি)। প্রত্যেক স্বাভাবিক পর্যায় অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থাও বিভিন্ন। শিক্ষার এ বিভিন্ন পর্যায় পরে আমরা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করব।

স্বাভাবিক শিক্ষার উৎস তিনটি,—বহিঃপ্রকৃতি, মনঃপ্রকৃতি ও জড়প্রকৃতি। এই তিন সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞানের সুষম সমন্বয়ের নামই প্রকৃত শিক্ষা। বাহিরের বিভিন্ন বস্তুর উপর আমাদের অধিকার আছে, আমাদের অন্তঃপ্রকৃতিকেও আমরা সংযত ও শাসন করতে পারি। কিন্তু বহিঃপ্রকৃতি (সূর্য, চন্দ্র, বায়ু ইত্যাদি) আমাদের শাসন-বহির্ভূত। জড়প্রকৃতি ও অন্তঃপ্রবৃত্তিকে বহিঃপ্রকৃতির অনুশাসন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

শিক্ষা প্রকৃতির উদ্দেশ্য অনুযায়ী না হলে তা মানুষকে বিকৃত করে। সে শিক্ষা নিষ্ফল। শিক্ষার উদ্দেশ্য কোন বিশেষ সমাজ বা শাসননীতি, মতবাদ বা জীবিকার প্রয়োজনে শিশুকে তৈরী করা নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য জীবনের স্বাভাবিক, সুস্থ ও সম্পূর্ণ বিকাশের সুযোগ-সৃষ্টি। শিক্ষা হচ্ছে উদার মানবজীবন গঠনের প্রস্তুতি। রুশো বলেছেন, শিক্ষার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণরূপে বাঁচবার কৌশল বা ব্যবসা শেখাতে চাই—"to live is the trade I wish to teach him" [৬] এ সূত্র থেকে অগ্রসর হয়েই কি বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাবিদ্ ডিউই বলেছিলেন, শিক্ষাই জীবন, ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে প্রস্তুতি নয় ?—"Education is a process of living, not a preparation for future living".[৭]

---

[৬] Graves : Great Educators of Three Centuries, p. 87

[৭] Dewey : Education Today, p. 6

রুশোর শিক্ষা, প্রকৃতি বা স্বভাব অনুসারী ; কিন্তু এ প্রকৃতি বা 'nature' কথাটি তিনটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রুশো এই তিন অর্থেই কথাটি ব্যবহার করেছেন।

প্রথমতঃ, প্রকৃতি বলতে মানুষের স্বভাবকে বোঝায়, যা হচ্ছে কোন ব্যক্তির স্বকীয়তা বা বৈশিষ্ট্যের মূল। আরিষ্টটল্ প্রকৃতির সংজ্ঞা দিচ্ছেন : কোন বস্তু যা, তা হতে গেলে, যে মৌলিক বা নিজস্ব গুণ থাকা দরকার, তাই হচ্ছে সে বস্তুর প্রকৃতি—"Nature means the essence or the inherent quality that makes the thing, what it is." শিক্ষাক্ষেত্রে এই অর্থে প্রকৃতি বলতে বোঝায় শিক্ষার্থী বা ছাত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা জন্মগত সংস্কার বা স্বভাব। মানুষের সহজাত সংস্কার (Instinct), বুদ্ধি, ক্ষমতা, আবেগ ও অনুভূতি সব মিলিয়ে রচিত হয় তার স্বভাব বা প্রকৃতি। কাজেই শিক্ষাদানের প্রথম স্তর হচ্ছে শিশুর প্রকৃতিকে জানা। তার উপরই গড়তে হবে শিক্ষার সৌধ। শিশুর আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ ও প্রয়োজনকে ভিত্তি করেই শিক্ষাদান প্রণালী ও শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে। রুশো বলেছেন, "শিক্ষার প্রণালী ও শিক্ষার উদ্দেশ্য এই দুই-ই নির্ভর করবে ছাত্রের প্রকৃতি ভাল করে জানার উপরে।" অ্যাডামস্ শিক্ষার এই দৃষ্টিভঙ্গীকেই বলেছেন, "শিশুকেন্দ্রিক দৃষ্টি"—Paido-centric attitude। রুশোর এই মত অব্যবহিত কাল পরে পেস্তালৎসীকে বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। শিশুর শিক্ষা শিশু-মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতেই গড়তে হবে—এই ধারণাকে পেস্তালৎসী সর্বজনগ্রাহ্য করে তুলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "I wish to psychologise education".

দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতি বলতে বোঝায় কৃত্রিমতা-বিরোধী স্বাভাবিক অবস্থা। রুশোর মতে সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার, নাগরিক জীবন এ সবই প্রকৃতি-বিরোধী। এ সবই মানুষের কৃত্রিম সৃষ্টি। শিশুর শিক্ষা সফল করতে হলে শিশুকে এই কৃত্রিম সমাজ-জীবনের রীতিনীতি, বন্ধন ও নিষেধ থেকে দূরে রাখতে হবে। তাকে নিয়ে যেতে হবে ফিরিয়ে প্রকৃতি-মায়ের কোলে, সভ্যতার পাপ-পঙ্কিল স্পর্শের বাইরে। রুশো তাঁর সময়ের ফ্রান্সের 'সভ্য' জীবনের অন্তঃসারশূন্য, কৃত্রিম রূপ দেখে শিউরে উঠেছিলেন। নিজের জীবনে এই কৃত্রিম সভ্যতার বীভৎসতা প্রত্যক্ষ করে তিনি সমস্ত সভ্যতার প্রতিই বীতরাগ হয়েছিলেন। তাই তিনি বলেছেন, "শিক্ষা মানে সহজ হওয়া, অ-সভ্য হওয়া। সভ্যতা মানেই

কৃত্রিমতার দাসত্ব।" মানুষ নিজহাতে এ কৃত্রিম শৃঙ্খল নিজের গলায় প'রে নিজের শ্বাসরোধ করছে। রুশো বলেছেন, "সভ্য মানুষ দাসত্বের মধ্যেই জন্মে, দাসত্বের মধ্যেই বাস করে, দাসত্বের মধ্যেই মৃত্যু বরণ করে; জন্মকালে আঁতুড়ঘরেই সেলাই-করা কাঁথা দিয়ে তাকে জড়ানো হয়, মৃত্যুকালে কাঠের বাক্সে বন্দী করে পেরেক মেরে দেওয়া হয়; যতক্ষণ মনুষ্যদেহে সে বর্তমান থাকে বিভিন্ন রীতি-নীতি অনুষ্ঠানের নিগড়ে সে আবদ্ধ।"

শিক্ষা যে নগর-জীবনের আবিলতা থেকে দূরে হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এ কথাটি আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথও খুব জোরের সঙ্গেই বলেছেন। শান্তিনিকেতনে শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপনের পিছনে ছিল তাঁর এই দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি বলেছেন, "জীবনের আরম্ভকালে বিকৃতির সমগ্র কৃত্রিম কারণ হইতে স্বভাবকে প্রকৃতিস্থ রাখা নিতান্তই আবশ্যক। প্রবৃত্তির অকালবোধন ও বিলাসিতার উগ্র উত্তেজনা হইতে মনুষ্যত্বের নবোদ্গমের অবস্থাকে স্নিগ্ধ করিয়া রক্ষা করাই ব্রহ্মচর্যপালনের উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ, এই স্বভাবের নিয়মের মধ্যে থাকা বালকদের পক্ষে সুখকর অবস্থা। ইহা তাহাদের পূর্ণ বিকাশের সহায়তা করে, ইহাতেই তাহারা যথার্থ-ভাবে স্বাধীনতার আনন্দলাভ করিতে পারে। ইহাতে তাহাদের নবাঙ্কুরিত সতেজ মন সমস্ত শরীরের মধ্যে দীপ্তির সঞ্চার করে।" আবার বলেছেন, "সংসারে কৃত্রিম জীবনযাত্রার হাজার রকমের অসত্য ও বকৃতি যেখানে প্রতিমুহূর্তে রুচি নষ্ট করিয়া দিতেছে, সেখানে ইস্কুলের দশটা-চারটের মধ্যে গোটাকতক পুঁথির বচনে সমস্ত সংশোধন করিয়া দিবে ইহা আশা করাই যায় না। ইহাতে কেবল ভূরি ভূরি ভানের সৃষ্টি হয় এবং নৈতিক জ্যাঠামি, যাহা সকল জ্যাঠামির অধম, তাহা সুবুদ্ধির স্বাভাবিকতা ও সৌকুমার্য নষ্ট করিয়া দেয়।"[৮]

তৃতীয়তঃ, প্রকৃতি বলতে অনেক সময় বহিঃপ্রকৃতি বা বিশ্বপ্রকৃতিকে (Laws of Nature) বোঝায়। রুশো বলেছেন, এই বহিঃপ্রকৃতিই শিশুর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সার্থক শিক্ষক। এমিলের শিক্ষার তাই ব্যবস্থা করা হয়েছে সরল গ্রাম্য পরিবেশে,—যেখানে আকাশ অবারিত, তরুলতা স্নিগ্ধ শ্যামল, যেখানে পশুপক্ষী মানুষের সঙ্গে সখ্যতায় সম্বন্ধযুক্ত। মনের বিকাশের এই তো উপযুক্ত ক্ষেত্র। প্রাচীন ভারতের শিক্ষার স্থান তাই ছিল তপোবন, ছিল গুরুগৃহের পবিত্র ও স্নেহ-সিঞ্চিত পরিবেশ। রবীন্দ্রনাথ আন্তরিকভাবে এই প্রকৃতির কোলে শিক্ষার

৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : "শিক্ষাসমস্যা", শিক্ষা—পৃঃ ৫০-৫৬

পক্ষপাতী। তাঁর অপূর্ব সুন্দর ভাষায় বলেছেন, "অগ্নি, বায়ু, জল, স্থল, বিশ্বকে বিশ্বাত্মা দ্বারা সহজে পরিপূর্ণ করিয়া দেখিতে শেখাই যথার্থ শিক্ষা। এই শিক্ষা সহরে ইস্কুলে ঠিকমতো সম্ভবে না। সেখানে বিদ্যাশিক্ষার কারখানা ঘরে জগৎকে আমরা একটা যন্ত্র বলিয়াই শিখিতে পারি।······চিরদিন উদার বিশ্বপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্রবে থাকিয়াই ভারতবর্ষের মন গড়িয়া উঠিয়াছে। জগতের জড়, উদ্ভিদ্, চেতনের সঙ্গে নিজেকে একান্তভাবে ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া ভারতবর্ষের স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে।······বালকদের হৃদয় যখন সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি যখন সতেজ, তখনই তাহাদিগকে মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলে খেলা করিতে দাও, তাহাদিগকে ভূমার আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিও না। স্নিগ্ধ নির্মল প্রাতঃকালে সূর্যোদয় তাহাদের দিনটিকে জ্যোতির্ময় অঙ্গুলির দ্বারা উদ্‌ঘাটিত করুক এবং রৌদ্রদীপ্ত সৌম্যগম্ভীর সায়াহ্ন তাহাদের দিবাবসানকে নক্ষত্র-খচিত অন্ধকারের মধ্যে নিমীলিত করিয়া দিক। তরুলতার শাখাপল্লবিত নাট্য-শালার ছয় অঙ্কে ছয় ঋতুর নানা রসবিচিত্র গীতিনাট্যাভিনয় তাহাদের সম্মুখে ঘটিতে দাও। তাহারা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া দেখুক নববর্ষা প্রথম যৌব রাজ্যে অভিষিক্ত রাজপুত্রের মতো তাহার পুঞ্জ পুঞ্জ সজল নিবিড় মেঘ লইয়া আনন্দ-গর্জনে চিরপ্রত্যাশী বনভূমির উপর আসন্ন বর্ষণের ছায়া ঘনাইয়া তুলিতেছে, এবং শরতে অন্নপূর্ণা ধরিত্রীর বক্ষে শিশিরে সঞ্চিত, বাতাসে চঞ্চল নানা বর্ণে বিচিত্র দিগন্তব্যাপ্ত শ্যামল সফলতার অপর্যাপ্ত বিস্তার দেখিয়া তাহাদিগকে ধন্য হইতে দাও।"[৯]

রবীন্দ্রনাথের চোখে বিশ্বপ্রকৃতি যে রুশোর চেয়ে অনেক বেশী প্রাণপূর্ণ গভীর সত্য তাতে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের এ দৃষ্টি সম্পূর্ণ ভারতীয় দৃষ্টি। রুশোর দৃষ্টি ইউরোপের বস্তু-সভ্যতা-অভ্যস্ত দৃষ্টিতে অত্যন্ত নূতন বলে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু আমাদের কাছে রুশোর কথা খুব নূতন নয়।

রুশোর মতে 'স্বভাব-অনুযায়ী-শিক্ষা' মানে সহজ অকৃত্রিম পরিবেশে শিশুর স্বভাবজ সংস্কার, রুচি ও শক্তির সম্পূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ। শিক্ষার মূল কথাই হচ্ছে সমাজের বিকৃতি ও কৃত্রিমতা থেকে শিশুর স্বাভাবিক সংস্কার ও শক্তিকে মুক্ত করে তার স্বাভাবিক ধর্ম অনুযায়ী তাকে বিকশিত হতে দেওয়া।[১০] তাই

৯ রবীন্দ্রনাথ: "শিক্ষাসমস্যা", শিক্ষা—পৃঃ ৫৬

১০ Adams : Evolution of Educational Theories

তাঁর শিক্ষা নেতিবাচক। ইতিবাচক শিক্ষা—যা শিশুকে নানা বিদ্যা ও কৌশল ও কর্তব্য বাইরে থেকে শেখাবার প্রয়াস করে, তা সর্বথা বর্জনীয়। তিনি বলছেন, "নেতিবাচক শিক্ষা আমি তাকেই বলি, যা প্রত্যক্ষভাবে কোন শিক্ষা দেওয়ার আগে শিক্ষাগ্রহণের ইন্দ্রিয় ও মনকে সম্পূর্ণ ও সজাগ করে তুলতে চেষ্টা করে।··· এ শিক্ষা 'এটা করো', 'ওটা করো না' ব'লে ধর্ম বা নীতি শিক্ষা দেয় না ; এ শিক্ষা এমন ভাবে মনকে তৈরী করে যাতে শিশু অন্যায় থেকে স্বতঃই রক্ষিত হয় ; এ শিক্ষা 'এটা সত্য', 'এটা মিথ্যা'—এ বলে' শিক্ষা দেয় না। এ শিক্ষা শিশুকে ভ্রান্তি থেকে দূরে রাখে।···ইতিবাচক শিক্ষা আমি তাকেই বলি, যা শাসন-তাড়নার দ্বারা মনকে অকালপক্ক করে এবং শিশুকে এমন'সব কর্তব্য সম্পাদন করতে শেখায় যেটা শৈশব অবস্থার পক্ষে নিরর্থক এবং যা বয়স্ক ব্যক্তিদের উপযুক্ত।"

রুশোর মতে প্রকৃত শিক্ষা নেতিবাচক এবং এর উদ্দেশ্য তিনটি ; যথা—(১) শিশুর স্বাভাবিক ক্ষমতার সম্যক বিকাশ, (২) সামাজিক রীতিনীতি ও প্রচলিত মতামতের শৃঙ্খলমুক্ত স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ এবং (৩) নিজ কর্মের ফলাফল থেকেই সত্য ও স্থায়ী নৈতিক শিক্ষা। তাঁর ছাত্র এমিলের শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে এ উদ্দেশ্য কি করে সিদ্ধ হবে, তাই তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ সব স্তরের মধ্য দিয়ে এমিলের শিক্ষা ধীরে ধীরে কি করে অগ্রসর হবে তাই দেখা যাক্।

শিক্ষার প্রথম স্তর—শৈশবকাল (পাঁচবৎসর বয়স পর্যন্ত)

আগেই বলেছি গ্রাম্য জীবনের সরল পরিবেশের মধ্যে প্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্যের মধ্যে শিশু বেড়ে উঠবে। তাকে পরিচ্ছদ-আবরণের বোঝা দিয়ে যেন বিড়ম্বিত না করা হয়, অলংকার দিয়ে অহংকৃত এবং অতিরিক্ত স্নেহ ও আদর দিয়ে তাকে যেন পঙ্গু না করা হয়। শক্ত হয়েই সে গড়ে উঠুক, প্রকৃতি থেকে রস আহরণ ক'রে বিরূপ শক্তির সঙ্গে লড়াই ক'রে। খাক কিছু আঘাত, পাক কিছু ব্যথা—প্রকৃতির কাছ থেকেই হোক তার যা কিছু শিক্ষা। সে নিজের চেষ্টায়, নিজের কৌতূহলের বশে শিখুক। রুশো শিশুর জন্যে নরম-গরম পোষাকের বিরোধী, কারণ এতে শিশুর দেহের স্বাভাবিক গতি ব্যাঘাত-প্রাপ্ত হয়। শিশুকে কঠিন করেই গড়ে তুলতে হবে ; সে খালিপায়ে চলবে এবং অন্ধকারে চলতে তাকে বাতি দেওয়া উচিত হবে না। সে নিজের চেষ্টায় যা আবিষ্কার করতে পারবে,

আয়ত্ত করতে পারবে, সেটাই হবে তার প্রকৃত শিক্ষা।" [১১] শিক্ষক শুধু লক্ষ্য করবেন, ভ্রান্তি ও বিপদ থেকে শিশুকে রক্ষা করবেন, শিশুর পরিণতির ধারাটি সযত্নে অনুসরণ করবেন। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশকে তিনি বাধা দেবেন না, তাকে ছাঁচে ফেলে গড়তে চেষ্টা করবেন না। পরবর্তী কালে মন্তেসরী তাই শিক্ষিকা না বলে, তার নাম দিলেন 'সঞ্চালিকা'—'ডিরেক্ট্রেস্,'—তিনি পথের ইঙ্গিত দেবেন, তাড়না করবেন না। [১২]

রুশো শিশুর চিকিৎসার জন্যেও চিকিৎসক বা ঔষধ ব্যবহারের পক্ষপাতী নন। নিতান্তই যদি জীবন বিপন্ন হয় তবেই চিকিৎসক ডাকা যেতে পারে, কারণ তাঁর কৃত্রিম চিকিৎসা দিয়ে মেরে ফেলবার বেশি তো তিনি আর কিছু করতে পারবেন না। [১৩] ডাক্তারদের বিরুদ্ধে বার্ণার্ড শ'র কটূক্তি রুশোর মতেরই প্রতিধ্বনি।

বাল্যকাল থেকেই শিশু কতকগুলি বাঁধাধরা অভ্যাসের দাস হবে, এটা তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। অভ্যাস মানেই হচ্ছে স্বভাবকে শৃঙ্খল দিয়ে বাঁধা। একটি মাত্র অভ্যাসই শিশু আয়ত্ত করবে, সে হচ্ছে কোন অভ্যাসের দাস না হওয়া: "The only habit, which the child should be allowed to form is to contract no habit whatsoever." [১৪]

ভয়ংকর জিনিস, ভীতিকর শব্দ, অন্ধকার ঘর—এসব জিনিস বা অপ্রিয় অবস্থার সঙ্গে শিশুর পরিচয় হওয়া প্রয়োজন। প্রকৃতির সুন্দর ও ভয়ংকর—এ দুই রূপই সে চিনুক, নইলে ভবিষ্যতে জীবন-সংগ্রামে সে জয়ী হবে কি করে? শিশু কাঁদলেই তাকে আদর করতে হবে, তা কেন? অবশ্য যদি শারীরিক কোন গুরুতর অবস্থার জন্যে সে কাঁদে তবে তার প্রতিবিধান করতে হবে। কিন্তু মর্জি করে যদি কাঁদে, বায়না ধরে যদি কাঁদে তবে সে কান্নাকে প্রশ্রয় না দেওয়াই উচিত হবে। শিশুর খেলার জিনিস হবে স্বভাবজ দ্রব্যাদি, যেমন গাছের ডাল, পাতা, ফুল ইত্যাদি। দামী চকচকে খেলনা দেওয়া মানে তাকে ছোট বয়স থেকেই বিলাসী ও বিকৃতরুচি করে তোলা। "তার খেলার জিনিস সোনা-রূপার ঘণ্টা বা প্রবাল স্ফটিক বা কারুকার্যখচিত নানা ধরণের ও নানা দামের খেলনা হওয়া উচিত নয়; সেগুলি

---

[১১] Barnard: Short History of English Education, p. 41-42

[১২] Graves: Great Educators of Three Centuries

[১৩-১৪] Payne: Rousseau's Emile, Bk. I

হওয়া উচিত প্রকৃতির নিতান্ত সহজ সাদাসিদে জিনিস, যেমন ফুল-ফল-শোভিত গাছের ডাল অথবা ভিতরে ঝুমঝুম করে বা বীজগুলো নাড়ালে বাজে এমন কাঠের খেলনা।”

শিশুর সঙ্গে সহজ সরল ভাষায় কথা বলতে হবে এবং তাকে শেখাবার জন্য অস্থির হলে চলবে না। সে তার নিজস্ব স্বাভাবিক গতিতে বিকশিত হয়ে উঠুক, এই হবে শিক্ষকের লক্ষ্য।

অর্থাৎ শিশুর প্রথম স্তরের শিক্ষা হবে দৈহিক, মানসিক নয়। তার দেহটি সুস্থ, সবল, কষ্টসহিষ্ণু হয়ে গড়ে উঠুক। যেটুকু শিক্ষা তা সম্পূর্ণ নেতিবাচক, তার শক্তি, বুদ্ধি, সংস্কারকে অবারিত ও অবিকৃত রাখা।

দ্বিতীয় স্তর—বাল্য (পাঁচ থেকে বার বৎসর)

এই দ্বিতীয় স্তরেও নেতিবাচক শিক্ষা চলতে থাকবে। বই পুস্তক পড়িয়ে, শিক্ষা বা উপদেশ দিয়ে নীতিশিক্ষার সময় এখনও আসে নি, শিশুর বিচার-বুদ্ধি এখনও বিকশিত হয় নি। তাই সামাজিক রীতি ও নৈতিক শিক্ষা তাকে দেওয়া এখন নিষ্ফল। এই বয়সে প্রয়োজন, তার সতেজ ইন্দ্রিয়গুলিকে সজাগ ও কৌতূহলী করে তোলা। প্রকৃতির নানা দ্রব্য ও পরিবর্তন শিশু স্বভাবতঃই লক্ষ্য করে। এটাই হল বাস্তবিক শিক্ষা। এবং এ শিক্ষার স্বাধীনতা তাকে দিতে হবে। শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে অসীম সাহসের সঙ্গে রুশো সর্বোচ্চ মূল্য দিলেন স্বাধীনতার। রুশো বললেন, “সর্বোচ্চ কল্যাণ শক্তি নয়,—স্বাধীনতা। সেই মানুষই সত্যিকারের স্বাধীন, যে তাই আকাঙ্ক্ষা করে, যা সে করতে সমর্থ এবং যে তাই করে, যা সে সত্যই আকাঙ্ক্ষা করে। এটি আমার দর্শনের মূলভিত্তি। এ সূত্র শিশুর ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে, তার থেকেই শিক্ষার সমস্ত বিধি পাওয়া যাবে।”[১৫] কিন্তু স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচার নয়। প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রবলতম বাধা। প্রকৃতির রাজ্য নিয়মের রাজ্য, সেখানে উচ্ছৃঙ্খলতার স্থান নেই। তাই প্রকৃতিই শিক্ষা দেবে শিশুকে প্রাকৃতিক ও নৈতিক নিয়মের অমোঘতা। শিশু ঠেকেই নিজ থেকে শিখবে দুঃখ ও লজ্জাই হল নিয়মভঙ্গের স্বাভাবিক পরিণতি। বাইরের শাসন দিয়ে নয়, স্বীয় কৃতকর্মের ফলভোগ করে

---

[১৫] Payne : Rousseau's 'Emile'. Bk. II

যে শিক্ষা, তাই সত্য শিক্ষা। শিশু যদি জানালার কাঁচ ভাঙে, শীতের হিম বাতাসে সে নিজেই কষ্ট পাবে ; ঘরের আসবাবপত্র ভাঙলে নিজেরই বসবার অসুবিধে হবে। তবে তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে দিতে হবে—তা হলেই সে শিখবে। বারে বারে মিথ্যার ফল সে দেখবে। এর পর সত্যকথা বললেও লোকে তাকে বিশ্বাস করবে না। তাই ভবিষ্যতে সে সাবধান হবে। প্রকৃতির এই স্বাভাবিক শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। শিক্ষক শিশুর ইন্দ্রিয়গ্রামকে উন্মুখ করে তুলবেন যেন সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির নিয়ম জানতে পারে।

শিশুকে খুব শীগ্‌গির 'বিদ্যাদিগ্‌গজ' করে তুলতে হবে, তার বুদ্ধিকে কষে তাড়া লাগিয়ে তাকে দ্রুত 'চালাক' করে তুলতে হবে, প্রচলিত এই শিক্ষানীতি নিতান্ত মূর্খতা। শিশুর মনের জমি পতিত থাকুক, এখনই আবাদ করে সোনা ফলাবার তাড়া দিলে তাতে সোনা ফলবে না। সুফলের জন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। রুশো বলছেন, "এ বয়সে শিক্ষার সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, সবচেয়ে কার্যকরী নিয়মটি কি ? সে হচ্ছে সময় বাঁচানো নয়—সময় বইয়ে দেওয়া"—"**It is not to gain time, but lose it.**"

এ বয়সে বইয়ের বোঝা চাপিয়ে দিলে, শিশুর মনের স্বাভাবিক গতিকে পিষ্ট করা হয় মাত্র। বারো বছর বয়স পর্যন্ত কোনো 'কেতাবী শিক্ষা' বালকের পক্ষে নিপীড়ন মাত্র। এ দুঃখ থেকে বুদ্ধিমান্ শিক্ষক তাকে মুক্তি দেবেন। পড়তে শিখতে হবে, সে কথা সত্য ; কিন্তু শিশুর মনের উপযুক্ত পরিণতি হোক, তবেই তো বইয়ের পড়া সে সত্যি গ্রহণ করতে পারবে। রুশো বলছেন, "এ বয়সে স্কুলের কাজ থেকে বই বাদ দিয়ে, তাদের পীড়নের শ্রেষ্ঠ যন্ত্র, মানে পুস্তকের যন্ত্রণা থেকে তাদের মুক্তি দিচ্ছি। বারো বছর বয়সে এমিল্ বই কাকে বলে তা সামান্যই জানবে। হয়তো আমাকে বলা হবে, লেখাপড়া শেখাটা যে খুবই দরকারী। এ কথা আমিও মানি। কিন্তু পড়াটার থেকে যখন সে ফললাভ করতে পারবে তখনই তাকে পড়া শেখানো দরকার। তার আগে পুস্তক তার কাছে যন্ত্রণা মাত্র।"[১৬] তাঁর এ শিক্ষা-নীতি কিছুটা অতিভাষণদুষ্ট হলেও পরবর্তী কাল এর প্রকৃত মূল্য স্বীকার করেছে।

এ বয়সের শিক্ষাও মুখ্যতঃ নেতিবাচক হলেও ইতিবাচক শিক্ষাও কিছুটা শুরু হবে এ বয়সে। শিক্ষক বালক-ছাত্রের কৌতূহল জাগ্রত করবেন। তার চারদিকের জিনিসগুলির বর্ণ, আকার, দৈর্ঘ্য, স্পর্শ, দূরত্ব, গুরুত্ব ইত্যাদি লক্ষ্য করতে

[১৬] Payne : Rousseau's 'Emile', Bk. II

শেখাতে হবে। শিশুকে আগ্রহশীল করে তুলতে হবে বিভিন্ন দ্রব্যের মিল, অমিল, সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে। জাগ্রত কৌতূহলবশে ছাত্র কেবল প্রশ্ন করবে, শিক্ষক সে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাকে আরো প্রশ্ন করতে উৎসাহী করে তুলবেন। হয়তো অনেক প্রশ্ন হবে হাস্যকর, অবান্তর, আপাতগর্হিত—তবুও শিক্ষককে ধৈর্য হারালে চলবে না। প্রশ্ন করা, কৌতূহল প্রকাশ করা, কেন হয়, এ জানতে চাওয়া কিশোরের স্বাভাবিক ধর্ম। তার এ ধর্মকে মর্যাদা দিতে হবে। এই স্বাভাবিক ধর্মের প্রেরণার মধ্য দিয়ে শিশু আবিষ্কার ও গঠনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ লাভ করবে ও শক্তি অর্জন করবে। কিশোর গাছে দোলনা ঝোলাবে, ছিপ তৈরী করবে, মাটি দিয়ে, জল দিয়ে, গাছপাতা দিয়ে বাড়ী, ঘর, নদী, দুর্গ এসব তৈরী করবে, তার চারপাশের জিনিসগুলি মন দিয়ে দেখবে, তাদের ছিঁড়বে, ভাঙবে, বিশ্লেষণ করবে —তাদের ছবি আঁকবে। তার এই স্বভাবকে শিক্ষক শিক্ষার কাজে লাগাবেন।

এই ইতিবাচক শিক্ষার আর একটা দিক্ হচ্ছে বালকের দেহকে সবল, ক্রিয়া-চঞ্চল করে তোলা। তাকে সাঁতার শেখাতে হবে, দৌড়ঝাঁপ, লাফ, গাছে চড়া, দেয়াল ডিঙানো ইত্যাদি কাজে উৎসাহ দিতে হবে। যাতে হাতের ও আঙুলের দক্ষতা বাড়ে, এমন সব খেলা ও কাজে তাকে রত করতে হবে। তার জামাকাপড় হবে শক্ত ও সাদাসিধে। খালি মাথা, স্বল্প জামায় সে রোদ, বৃষ্টি, শীত, গ্রীষ্মে অভ্যস্ত হবে। তার দেহ যাতে সুস্থ থাকে সেজন্যে পুষ্টিকর যথেষ্ট খাদ্য ও উপযুক্ত বিশ্রামও তাকে দিতে হবে। কিন্তু আরামপ্রিয়তা বা বিলাসিতার প্রশ্রয় কিছুতেই দেওয়া হবে না। লক্ (Locke) একেই বলেছেন শক্ত করে গড়বার পদ্ধতি—'the hardening process.' এ পদ্ধতি প্রাচীন গ্রীসে স্পার্টায় (Sparta) প্রচলিত ছিল। স্পার্টা তাই রুশোর প্রিয়।

ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রনীতি—এ সব শিখবার সময় এখনও আসেনি। এ সব বিষয়ে ধারণা করবার মত মনের পরিণতি কিশোর এখনও লাভ করেনি। ভাষা শেখার জন্যও ব্যস্ততা এখনো অনাবশ্যক। বালক যা কিছু শিখবে, তা শিখবে তার মাতৃভাষার মাধ্যমে।

তৃতীয় স্তর—কৈশোর (বারো থেকে পনেরো বৎসর)

এবার শিক্ষার তৃতীয় স্তর শুরু। প্রাকৃতিক নিয়মেই এ হচ্ছে পরিশ্রমের সময়, বিদ্যার্জনের বয়স। এ সময় শিশুর মানসিক ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং সে বৃদ্ধি

তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত। তাই বিদ্যা আহরণের এই হচ্ছে উপযুক্ত কাল। রুশো তাই এ কালকে বলেছেন "পরিশ্রম, শিক্ষাগ্রহণ ও অধ্যয়নের কাল।" সমস্ত শৈশব ও বাল্যকাল ধরে চলেছিল এর প্রস্তুতি। কিশোরের দেহমন প্রাণপ্রাচুর্যে ভরে উঠেছে, স্বাধীন চিন্তাশক্তির উন্মেষ হয়েছে, এবার বিদ্যা আহরণ ও বুদ্ধিকে কাজে লাগাবার পালা। 'কাজে লাগানো'—এটাই বড় কথা; কিশোর-বিদ্যার্থীকে মেলাই বিদ্যার ভাবে সমাধিস্থ করা নয়। তাকে শেখাতে হবে এমন বিদ্যা যা কাজে লাগবে—'merely that which is useful'। যা শিক্ষার্থী বুঝতেই পারবে না, যা অত্যন্ত দুরূহ, যা নিতান্তই অলংকার এমন বিদ্যা নাইবা সে শিখলো। জীবন-চলার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী হচ্ছে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। এগুলি তাকে শেখাতে হবে। শিক্ষক বলবেন, আর সে শিখবে, তা নয়। নিজ কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে সে প্রশ্ন করবে, পরীক্ষা করবে, সমস্যার মীমাংসা করবে, এই হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা। তার নিজস্ব ক্ষমতার উদ্বোধনই হচ্ছে শিক্ষকের কর্তব্য। রুশো বলছেন, "তাকে এমন প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করবেন যেটা তার বোধগম্য, তারপর তার উপরই ছেড়ে দিন সে প্রশ্ন মীমাংসার ভার। আপনি তাকে বলে দিয়েছেন তাই সে শিখেছে, এমন যেন না হয়, বরং সে শিখবে যেহেতু এটা তার নিজ বুদ্ধি দিয়ে সে আয়ত্ত করেছে। বিজ্ঞানের তথ্যগুলি সে মুখস্থ করে শিখবে না, সে নিজে সেগুলি আবিষ্কার করবে। যদি তার মনে বিচারের পরিবর্তে শিক্ষকের বাক্য-গ্রহণের অভ্যাস তিনি গঠন করে দেন, তবে সে আর কোনদিন বিচার করবে না।" —"If ever you substitute in his mind authority for reason, he will no longer reason."

কেবলমাত্র বিদ্যা জাহির করবার জন্যে শিক্ষা নয়, কাজে লাগাবার জন্যেই শিক্ষা। জ্যোতির্বিদ্যায় সে গ্রহনক্ষত্র চিনবে, কারণ এদের সঙ্গে বিভিন্ন ঋতুর সম্পর্ক আছে। ধ্রুবতারা সে চিনবে, কারণ তা তাকে দিঙ্‌নির্ণয়ে সাহায্য করবে। ঠিক তেমনি বই পড়ে, ম্যাপ্ গ্লোব দিয়ে কাল্পনিক দেশের কথা জেনে কি লাভ? সে দেখুক তার নিজের ও আশেপাশের গ্রাম ও শহর, নদী, পাহাড়, হ্রদ, বন্দর ইত্যাদি। এভাবে ভূগোল শিক্ষা জীবন্ত ও সার্থক। বইপত্র অবশ্যই কিছুটা চাই এ স্তরে, তবে যতটা কম হয় ততই ভালো। বইএর উপর রুশোর বড় বিতৃষ্ণা। তিনি বলছেন, "বইগুলো শেখায় এমন সব বিষয়ে বক্তৃতা করতে, যে সম্পর্কে আমাদের কোন বাস্তব জ্ঞান নেই"—"I hate books, they merely teach us

to talk of what we do not know !" একটি বই শুধু এমিলের অবশ্যপাঠ্য বলে রুশো নির্ধারণ করেছেন, সে হচ্ছে 'রবিনসন ক্রুসো'। কারণ এতে শিশুর বোধগম্য ও কৌতূহলোদ্দীপক ভাষায় কি করে দৈবদুর্বিপাকে সমাজ-বিচ্ছিন্ন একজন মানুষ সম্পূর্ণ জনমানবহীন এক দ্বীপে নিজ চেষ্টায় ও বুদ্ধিতে কেমন করে বাড়ী-ঘর তৈরী করেছিল, চাষবাস ক'রে, পশুর চর্ম দিয়ে নিজ আচ্ছাদন তৈরী ক'রে, নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই ক'রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, এবং হিংস্র নরখাদকদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে, নিজের ও অপর কয়েকটি আগন্তুক অসভ্য লোকের প্রাণ রক্ষা করেছিল এবং অবশেষে কি ক'রে, আত্মীয়স্বজনপূর্ণ মনুষ্যসমাজে ফিরে এসেছিল।

এমিল্ এ বয়সে নানা হাতের কাজ তার শিক্ষকের সঙ্গে সঙ্গে শিখবে, যেন প্রতিকূল অবস্থায়ও সে নিজের জীবিকা অর্জন করতে পারে। তা ছাড়া এতে ক'রে সে দৈহিক শ্রমকে অবজ্ঞা করতে শিখবে না। কাঠের কাজকে তিনি সবচেয়ে উঁচু স্থান দিয়েছেন, যেমন গান্ধীজি দিয়েছেন চরকাকে।

এই বৃত্তিশিক্ষার মধ্য দিয়ে এমিলের সামাজিক শিক্ষাও শুরু হবে। সে শিখবে সহযোগিতা, শ্রমবণ্টন নীতি ও অর্থনীতির প্রধান সূত্রগুলি।

নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে শুধু একটি কথাই তাকে শেখাতে হবে—কারো ক্ষতি করো না, অন্যায় আঘাত দিও না—Never hurt anybody.

চতুর্থ স্তর—যৌবনাগম (পনরো থেকে কুড়ি বৎসর)

এবার এমিল্ পনরো বৎসরে উপনীত। এ সময়টা জীবনের বিশেষ সংকট-পূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ কাল। এবার অনুভূতি, সমাজবোধ ও নীতিজ্ঞান বিকাশের কাল। শৈশবে, বাল্যে, কৈশোরে সে প্রকৃতির অমোঘ ও অপরিবর্তনীয় নীতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। এখন সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে সে নিজেকে নতুন করে জানবে তাই রুশো এ অবস্থাকে বলেছেন—নবজন্মলাভ। এ বয়সে তার প্রবল হৃদয়াবেগ বিকশিত হয়েছে এবং অন্য দশজনের সঙ্গ তার প্রয়োজন আছে। তাদের সাহচর্য ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে অনুভূতি ও আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে সে শিখবে। এতদিন চলেছে তার দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি বিকশিত করবার শিক্ষা; এবার শিখতে হবে হৃদয়াবেগ নিয়ন্ত্রণের কথা, নীতি ও ধর্মের কথা। রুশো বলছেন, "We have formed his body, his senses and his intelligence, it remains

to give him a heart." চরিত্রগঠনের এই গ্রহণধর্মী কালে এমিলের অনুভূতিগুলিকে ঔদার্য ও কল্যাণাভিমুখী করে তুলতে হবে। সেটা উপদেশ ও বক্তৃতা দিয়ে হবে না। সেটা সে শিখবে মানুষের দুঃখ-বেদনা ও মহত্ত্বের সংস্পর্শে এসে। সে এই প্রত্যক্ষ মানবিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই মানুষকে সম্মান করতে, তাকে ভালবাসতে শিখবে। সে তখনি নিশ্চিতভাবে এই সত্যশিক্ষা লাভ করবে যে মানুষ মূলতঃ সৎ, কিন্তু সমাজের কৃত্রিম ব্যবস্থাই তাকে নষ্ট করে।

মানুষকে জানবার যত শাস্ত্র ও বিজ্ঞান, তার শিক্ষা এখন শুরু হবে। ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়ে জাগবে সামাজিক চেতনা। বীরদের কাহিনী, মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী এ বয়সে এমিল্ পড়বে। ইতিহাস তাহলে তার কাছে নীরস তথ্যের তালিকা বলে মনে হবে না; দর্শনের মধ্য দিয়ে তার জিজ্ঞাসু মন জানবে জগৎ, জীবন ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও সম্বন্ধ। ধর্মশিক্ষা এখনই আরম্ভ। এ ধর্ম কতকগুলি আচার, নীতি, বিধিনিষেধ মাত্র নয়; প্রকৃত ধর্মশিক্ষা হচ্ছে মানুষের মহত্ত্বের প্রতি আস্থা, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা। এমিলের মার্জিত বুদ্ধি প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে বিশ্বপিতাকে অনুসন্ধান করবে। এ অনুভূতি তার জাগবে যে ঈশ্বর সর্বদেশে, সর্বকালে, সর্বজীবে, সর্বচরাচরে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। বহু প্রাচীনকালে ভারতের উপনিষদ্ এ তত্ত্ব গভীরতর ভাবে অনুভব করেছিলেন এবং পরবর্তী কালে ইউরোপে ফ্রোএবেল্ এই তত্ত্বটিই তাঁর শিক্ষার মূলসূত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এমিলের ধর্ম ও ভগবান্ বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের ছাপ-মারা নয়, তা সর্বমানবীয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে রুশো তাঁর নিজ ধারণা 'Savoyard Vicar's Profession of Faith' প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন, "আমি ঈশ্বরকে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সর্বত্র প্রত্যক্ষ করি, আমি নিজের মধ্যে তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করি, আমি তাঁকে আমার চতুর্দিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত দেখতে পাই। কিন্তু যখন আমি তাঁকে খুঁজতে যাই, যখন বুঝতে চেষ্টা করি তিনি কি বস্তু, কি পদার্থ দিয়ে তিনি তৈরী—তখনই তিনি আমার কাছ থেকে পালিয়ে যান এবং আমার অশান্ত আত্মা তখন আর কিছুই দেখতে পায় না। আমি তখন অবনম্র হয়ে তাঁকে বলি—হে সর্বমূলাধার সর্বজীবজীবন, তোমার অস্তিত্বেই আমার স্থিতি; দিবানিশি অবিরাম তোমার ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকলে যেন সেই সমস্ত সত্তার মূল উৎসে নিজেকে উন্নীত করি।"

এমিলের সৌন্দর্যবোধ বিকাশের উদ্দেশ্যে শিক্ষক তাঁকে সৌন্দর্যতত্ত্ব আলোচনা

করতে উৎসাহ দিবেন। যৌবনোচিত দেহচর্চার মধ্য দিয়ে সে নিজেকে অবশ্যই সুস্থ ও সবল রাখবে।

যৌনজীবন সম্বন্ধে শিক্ষাও এখন এমিল্‌কে দিতে হবে। এ বিষয়ে রুশোর মত আশ্চর্যজনকভাবে আধুনিক। বয়ঃসন্ধিকালে মানুষের দেহের যে স্বাভাবিক পরিবর্তন হয়, সে সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে যৌনশিক্ষার প্রথম সোপান। এর পর এমিল্ অনুধাবন করবে—যৌনসম্পর্ক, বিবাহ ও যৌনসম্পর্কের শুচিতার সামাজিক মূল্য। বৈজ্ঞানিক ও পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি দিয়ে এসব বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করলে এমিল্ বুঝতে শিখবে যে স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ একটি পবিত্র ও স্বাভাবিক সামাজিক বন্ধন। যারা এই সম্বন্ধকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না, তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। তার পরিণাম ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে কি ভয়াবহ, প্রকৃত দৃষ্টান্ত দিয়ে এমিল্‌কে তা বুঝতে শিক্ষক সাহায্য করবেন। রুশো বলছেন, "যদি আমরা তার কাছে বিবাহকে শুধু মধুরতম সামাজিক সম্বন্ধ নয়, পবিত্রতম এবং অচ্ছেদ্য প্রতিশ্রুতিমূলক সম্পর্ক বলে অঙ্কিত করি, এবং যদি তার কাছে ব্যভিচারের পাশবিক বীভৎসতা ও তার সাংঘাতিক পরিণামের বাস্তবচিত্র উদ্ঘাটন করে দিতে পারি, যদি তাকে নিশ্চিত প্রমাণ দিতে পারি যে শুচিতার আকাঙ্ক্ষার উপর শুধু স্বাস্থ্য, শক্তি, সাহস ও ধর্ম নয়, সত্যিকারের প্রেম-ভালবাসাও নির্ভর করে, তাহলে আমার বিশ্বাস, যৌনশুচিতা তার কাছে এমন কাম্য ও মূল্যবান্ বলে প্রতিভাত হবে যে, শুচিতা রক্ষার উপায় সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা সে মনে-প্রাণে গ্রহণ করবে। কারণ যতদিন আমরা নিজেরা শুচিতা রক্ষা করি ততদিনই শুচিতাকে আমরা শ্রদ্ধা করি, আর যখনই এই মহামূল্য সম্পদটি হারাই তখনই তা নিয়ে আমরা উপহাস করি।" রুশোর এই গভীর সত্য কথার পিছনে রয়েছে নিজ গ্লানিকর ব্যভিচারী জীবনের বিষময় অভিজ্ঞতা।

যৌন-আকাঙ্ক্ষা নিতান্তই স্বাভাবিক। তাকে গলা টিপে মারা যায় না; গেলেও তার ফল শুভ হয় না। এমিল্ এখন যৌবনের দ্বারে উপনীত হয়েছে, তার যৌনাকাঙ্ক্ষা নিজের অজ্ঞাতসারেই উন্মেষিত হয়েছে। তার আকাঙ্ক্ষা নির্দোষ ও স্বাভাবিক তৃপ্তির জন্যে এবার তাকে তার ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গিনী সোফী (Sophie) নাম্নী আদর্শশিক্ষাপ্রাপ্তা তরুণীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। সে সোফীকে ভালবাসতে, শ্রদ্ধা করতে শিখুক। তার প্রতি এমিলের মমত্ববোধ প্রীতিপূর্ণ পরিচয়ের মধ্য দিয়ে স্থাপিত হোক। তার উন্মেষিত যৌন-আকাঙ্ক্ষা—এ সংযত ও প্রীতিময় সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে তৃপ্তিলাভ করবে। এতে অবদমিত কামনার অবাঞ্ছিত

ও উদগ্র প্রকাশের সম্ভাবনা ঘুচে যাবে। তাদের আদর্শ দাম্পত্যজীবনের ভূমিকা রচিত হল।

সোফীর সঙ্গে বিবাহ স্থির হয়ে যাবার পরও এমিলের শিক্ষার সমাপ্তি ঘটেনি। এবার সে দেশভ্রমণে বের হবে; নানা দেশ দেখবে, নানা জাতির মানুষের সংস্পর্শে আসবে। এতে তার সামাজিক জীবনের রীতিনীতি-শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে। এতেই ঘটবে তার বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিকাশ। মানবসমাজের কৃত্রিমতার কলুষ তাকে স্পর্শ করবে না, কারণ আদর্শ শিক্ষালাভের ফলে তার দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়েছে, তার মূল্যবোধ স্থির হয়েছে। তার স্বচ্ছ ও পূর্ণবিকশিত বুদ্ধি ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের বলে সে আদর্শ নাগরিক হবে, এবং নূতন করে সমাজকে গড়ে তুলতে পারবে।

এমিল্ তার শিক্ষা সম্পূর্ণ করে, পূর্ণযৌবনে উপনীত হয়ে, সোফীকে বিবাহ করবে এবং গার্হস্থ্যজীবনে প্রবেশ করবে।

'এমিলের' পঞ্চম খণ্ডে রুশো আলোচনা করেছেন সোফীর শিক্ষাপদ্ধতি। এখানে রুশোর স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে ধারণা আমরা জানতে পারি। সোফী কিন্তু সমাজ-সংসার-বিচ্যুত হয়ে সুদূর গ্রাম্যপরিবেশে গৃহশিক্ষকের অধীনে শিক্ষালাভ করবে না। সোফীর মাতাই হবেন তার শিক্ষিকা; সংসার ও গৃহপরিবেশই হবে তার শিক্ষার ক্ষেত্র। এর কারণ নারীর পক্ষে গৃহধর্মই স্বাভাবিক। নারীদের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের বিশেষ প্রয়োজন নেই। তার শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হবে স্বামীর আদর্শ-গৃহিণী হওয়া। নারীর নিজস্ব সত্তা বা প্রয়োজন নেই। তার স্বাভাবিক পরিণতি হচ্ছে সে সুগৃহিণী হবে, স্বামীর তৃপ্তিদায়িনী ধর্মসঙ্গিনী হবে। রুশো বলছেন, "নারীর সমস্ত শিক্ষাই পুরুষের প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। নারীর কাজ হচ্ছে পুরুষের মনোরঞ্জন করা, তার সেবা করা, তার প্রীতি সম্পাদন করা, তাকে সরস রাখা; বাল্যকালে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া, বড় হলে তাদের যত্ন করা, সুপরামর্শ দেওয়া, সান্ত্বনা দেওয়া, তাদের জীবন স্বচ্ছন্দ ও মধুময় করে তোলা। সর্বকালে এই হচ্ছে নারীর কর্তব্য এবং শৈশব থেকেই তাদের এ শিক্ষা দেওয়া উচিত।" নারীর বুদ্ধির প্রতি রুশো খুব শ্রদ্ধান্বিত নন এবং তার উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন তিনি স্বীকার করেন নি। নারীর বুদ্ধি বরং কিছু কম থাকা ভাল।

অবশ্য বিবাহের পূর্বে সোফীর শারীরিক ও সামাজিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সে ঘরেই আবদ্ধ হয়ে থাকবে না। সে মানুষের সঙ্গে মিশবে; থিয়েটার, পার্টি ইত্যাদিতেও কিছু কিছু যাবে। তাকে এ বিষয়ে কিছুটা স্বাধীনতা দেওয়ার

তিনি পক্ষপাতী। বরং বিবাহিতা নারীদের স্বাধীনতা কিছু খর্ব করলে ভাল হয়। তিনি সেকালের ফ্রান্সে, বিবাহিতা অভিজাত বংশের নারীদের অতি-স্বাধীনতাকে উপহাস করেছেন ; বলেছেন, "এ বড় অদ্ভুত অবস্থা—ফ্রান্সে অবিবাহিতা মেয়েরা আবদ্ধ হয়ে থাকে কনভেণ্টে, আর বিবাহিতারা যথেচ্ছ বিচরণ করে বেড়ায়।"

নারীর শিক্ষাসম্পর্কে রুশোর মত প্রাচীনপন্থী। নূতন শিক্ষাদর্শের স্রষ্টা হিসাবে রুশোর সুনাম 'এমিলের' পঞ্চম খণ্ডে বরং খণ্ডিত হয়েছে।

'এমিল্'-বর্ণিত রুশোর শিক্ষাদর্শের মূল্য নিরূপণ সহজ নয়। কবি বলেছেন—"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ"। রুশোর ক্ষেত্রে অন্ততঃ কথাটা ঠিক বিপরীত। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন কুৎসিত, গ্লানিকর ; কিন্তু তাঁর চিন্তা ও অনুভূতির মধ্যে একটা আশ্চর্য শুচিতা ও মহাপ্রাণতা আছে। রুশো বেঁচে থাকবেন তাঁর বইএর মধ্য দিয়েই, যদিও বইএর তিনি বিষম বিরোধী। কুইক বলছেন, "রুশো বলতেন, 'আমরা লেখা কথার উপর অনাবশ্যক জোর দেই', কিন্তু তাঁর লিখিত বইএর কথার মধ্য দিয়েই রুশো এখনও আমাদের কাছে জীবিত, আর তাঁর লেখার জন্যেই তাঁর জীবনের কুকর্মকে আমরা ভুলে যাই।" [১৭]

রুশোর শিক্ষাদর্শ বহুক্ষেত্রে অবাস্তব ও স্ববিরোধী। রুশো স্বভাবানুসারী শিক্ষানীতি প্রচার করেছেন কিন্তু সে শিক্ষার জন্যে এমিল্‌কে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে তার স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে, তার গৃহ ও আত্মীয়-পরিজন থেকে। তার শিক্ষার শেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ ও আদর্শ সামাজিক মানুষ সৃষ্টি, কিন্তু এমিল্ পনরো বছরের পূর্ব পর্যন্ত সম্পূর্ণ সমাজ-বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করেছে কেবলমাত্র তার গৃহ-শিক্ষকের সাহচর্যে। সমবয়স্ক শিশুদের সঙ্গ যে স্বাভাবিক ভাবেই শিশুর বিকাশের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, সে কথাটি স্বাভাবিক শিক্ষার প্রচারক রুশো ভুললেন কি করে, তা আশ্চর্য বোধ হয়। সোফীর শিক্ষার বেলায় কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। সোফী গৃহ-পরিবেশে মায়ের কাছেই শিক্ষা পাবে। তার বেলায় সমাজের কৃত্রিমতা যে কেন তার স্বভাবে বিকার ঘটাবে না, তা বোঝা যায় না। এমিলের বেলায় রুশোর আদর্শ হচ্ছে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ আর সোফীর বেলায় হচ্ছে ঠিক বিপরীত— ব্যক্তিত্ব-বিনাশ![১৮] স্বভাব বা প্রকৃতিকে রুশো এক রঙীন চশমার মধ্য দিয়ে দেখেছেন,

[১৭] Quick : Essays on Educational Reformers, p. 271

[১৮] Graves : Great Educators of Three Centuries

—পরবর্তী কালে ডারুইন্ এই মিথ্যা মোহের জাল বৈজ্ঞানিক তথ্যের শাণিত অসি দিয়ে ছিন্ন করে দেখিয়েছিলেন প্রকৃতির রক্ত-কলঙ্কিত দশন-নখর-কণ্টকিত রূপ, তার কদর্য বর্বরতা। তাই কখনো কখনো সঙ্গতভাবেই এ প্রশ্ন করা হয়, রুশো কি স্বভাববাদী (Naturalist), না স্বপ্নাচ্ছন্ন আদর্শবাদী (idealist)? সত্যই প্রকৃতিকে তিনি আদর্শের মোহ দিয়ে মণ্ডিত করেছেন—**He has idealised nature!** *

রুশো বলেছেন তাঁর প্রিয় এমিল্ নিজ-স্বভাবের গতিতেই, নিজ সহজাত সংস্কার অনুসারেই গড়ে উঠেছে। কিন্তু এটা ভুলে যাওয়া হচ্ছে—এমিলের সমস্ত অনুভূতি, ইচ্ছা ও কর্মের গতি তার শিক্ষকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাঁর ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রভাবান্বিত। বাস্তবিকপক্ষে বর্বর আদিম অসভ্য মানব তার প্রবৃত্তির অনিয়ন্ত্রিত আবেগ দ্বারা কখনও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে না। শিক্ষা মানেই হচ্ছে বর্বর অমার্জিত আদিম প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ ও সংস্কার। রুশোর এ ভুলটি পরবর্তী শিক্ষা-সংস্কারকেরা সংশোধন করেছিলেন। রুশো তাঁর শিক্ষা-ব্যবস্থায় পুস্তকের প্রায় কোন মূল্যই দেননি। কিন্তু একেবারে শৈশবের কথা বাদ বিলে, পুস্তক ব্যতীত সম্পূর্ণ সুশিক্ষা সম্ভব নয়। পুস্তকের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি অতীতের চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হয়। মানবজাতির সঞ্চিত অভিজ্ঞতা পুস্তকের মধ্যেই সংগৃহীত হয়ে আছে। বাস্তবিক পক্ষে রুশোর শিক্ষানীতির এটা একটা দুর্বলতা যে, তাতে ইতিহাসবোধ অপরিস্ফুট। অতীতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তিনি নূতন ভবিষ্যৎ গড়তে চান। সেটা একেবারেই অসম্ভব।

সামাজিক শাসন ও সভ্যতার মূল্যকে তিনি প্রায় অস্বীকার করেছেন। এতে এমিলের শিক্ষার ভিত্তি দুর্বল হয়েছে। কেবল মাত্র 'ঠেকে শেখা' অভিজ্ঞতার দ্বারা শিক্ষাকে তিনি মূল্য দিয়েছেন। কিন্তু মানুষের গভীরতম আদর্শ ও বিশ্বাস মানুষ আয়ত্ত করে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নয়—প্রীতি, শ্রদ্ধার মধ্য দিয়ে অন্তরের প্রেরণায়। 'নৈতিক আদর্শ অবশ্য-পালনীয়, কারণ তার লঙ্ঘনের শাস্তি ভয়াবহ।'

---

* প্রসিদ্ধ ফরাসী গল্প-লেখক মোপাঁসা রুশোর ঠিক বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর 'Useless Beauty' গল্পে তিনি লিখেছেন, "...Nature is our enemy...we must always fight against Nature, for she is continually bringing us back to an animal state. You may be sure that God has not put anything on this earth that is clean, pretty, elegant or accessory to our ideal, but the human brain has done it. It is we, who have introduced a little grace, beauty, unknown charm and mystery into creation..."

এটা শ্রেষ্ঠ নীতিশিক্ষা নয়। শ্রেষ্ঠ শিক্ষা এই যে, আদর্শ অনুসরণেই মানুষের শ্রেষ্ঠ গৌরব, তা ফললাভাকাঙ্ক্ষী নয়।

রুশো একদিকে বিষম নিরাশাবাদী (pessimist), আবার আর একদিকে তিনি উচ্চ আশাবাদী (optimist)। মানুষের স্বাভাবিক সততায় তাঁর আস্থা গভীর, কিন্তু সে মানুষই সংঘবদ্ধ হয়ে যখন সমাজ, সংসার, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গড়ে, তার প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা ও অবিশ্বাস। একদিকে শিশুর প্রতি তাঁর অপরিসীম করুণা ও কোমলতা আর একদিকে তাঁর কঠিনতা ও নির্দয়তা।

কিন্তু এপ্রকার বহু স্ববিরোধিতা ও দুর্বলতা সত্বেও তাঁর বলিষ্ঠ ও নূতন শিক্ষাদর্শ অশেষ মূল্যবান্। প্রাচীন প্রাণহীন রীতিকে এমন প্রবল অকুণ্ঠিত ও বৈপ্লবিক অস্বীকারের প্রয়োজন ছিল। গ্রেভস্ বলেছেন, "সে কালের পক্ষে এবং এমন একটি নূতন আদর্শ স্থাপনের জন্য, এমন চরম মতবাদের প্রয়োজন ছিল। অনেক সময় তাঁর মতবাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে সমাজ-সংস্কারককে এমন 'কালাপাহাড়' হ'তে হয়।" [১৯]

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশু-শিক্ষার্থীর অধিকার তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রাচীন পদ্ধতি শিশুর প্রয়োজন ও শক্তির প্রতি উদাসীন। শিক্ষায় আনন্দও শিশুর পক্ষে একটি স্বাভাবিক ও ন্যায্য অধিকার, এ কথা প্রাচীনেরা জানতেন না। পুস্তকের ভারে, ব্যাকরণের কণ্টকে এবং শারীরিক শাস্তির লাঞ্ছনায় শিশুকে জর্জরিত করা তাঁরা শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করতেন। রুশো শিশুর এ শৃঙ্খল মোচন করে ভবিষ্যৎ শিশু-সমাজকে চিরঋণী করেছেন। আধুনিক শিক্ষানীতির স্পষ্ট ইঙ্গিত রুশোর শিক্ষাদর্শে নিহিত রয়েছে। এ হিসাবে তিনি পথপ্রদর্শক। শিশুর স্বভাব, রুচি, শক্তি ও আগ্রহই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম, বর্তমান কালের শিক্ষা-প্রণালীর এ মূলমন্ত্র প্রথম রুশোতেই আমরা এমন পরিষ্কার ভাবে পাই। প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিতে কেবলই বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের উপর ছিল জোর। রুশো অনুভূতির বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণের কথাও বললেন। ইন্দ্রিয়-পরিচালনার মধ্য দিয়ে শিশুর দ্রব্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটিয়ে তার ঔৎসুক্যকে তীব্রতর করে তুলতে হবে। রুশোর এ পদ্ধতিও আধুনিক শিক্ষাসম্মত। কাজের মধ্য দিয়ে শেখা—learning through doing—এটিও রুশোর শিক্ষানীতিতে একটি মূল্যবান্ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ ইঙ্গিত। শিশুর শিক্ষার স্তরবিভাগ তার দেহ ও মনের পরিণতির

[১৯] Graves : Great Educators of Three Centuries, p. 99

উপর নির্ভর করেই স্থির করতে হবে, রুশোর এ কথা বর্তমান মনোবিজ্ঞান-সম্মত। তবে তিনি এমিলের পরিণতির স্তরগুলি যেমন পরিচ্ছন্ন ও বিচ্ছিন্ন ভাবে ভাগ করেছেন সেটা ঠিক নয়। তার শিক্ষার একটি মহৎ গুণ যে, তা কৃত্রিমতাকে যথাসম্ভব বর্জনের পক্ষপাতী। প্রকৃতির উন্মুক্ত অঙ্গনই শিশুশিক্ষার উপযুক্ত ক্ষেত্র। ইংল্যাণ্ডে প্রথমে রবার্ট ওয়েন্ ও পরে ম্যাক্‌মিলান ভগ্নীদ্বয় এ আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ইংল্যাণ্ডের নার্সারী স্কুলের গোড়াপত্তন করেন। এটাও তাঁর শিক্ষাদর্শের প্রশংসনীয় দিক্ যে, ধর্ম ও নীতিশিক্ষার ক্ষেত্রে হৃদয়ের ঔদার্য ও মানব-প্রেমকে তিনি শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ আচারের চেয়ে উঁচু স্থান দিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি প্রাণহীন নিরানন্দ গতানুগতিক শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্তে দিয়েছেন আনন্দময়, উৎসাহপূর্ণ ও প্রাণবন্ত শিক্ষার রূপ। তিনি পুরাতনকে ভেঙে নূতনের জন্যে পথ তৈরী করেছেন। তাঁর চিন্তাধারায় চমকপ্রদ মৌলিকতার মূল্য সামান্য নয়, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তিনি তাঁর পরবর্তী সমস্ত শিক্ষাব্রতীর চিন্তাকে প্রভাবান্বিত করেছেন। পেস্তালৎসী, বেস্‌ডাও, হার্বার্ট, ফ্রোএবেল, মন্তেসরী অর্থাৎ আধুনিক কালের সমস্ত নূতন শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্তকেরা সকলেই তাঁর মানস-সন্তান। মোর্‌লে রুশোর এমিল্ গ্রন্থ সম্বন্ধে সত্যই লিখেছেন, "এ হচ্ছে সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বীজ-গ্রন্থ। যে সমস্ত বদ্ধ আবর্জনা-সদৃশ কুসংস্কার, মূঢ় অন্ধকার ও নিষ্প্রাণ সামাজিক আচার, প্রাচীন কালের শিক্ষাকে নির্বোধ, যান্ত্রিক, নিরানন্দ পদ্ধতিতে পরিণত করেছিল, এ গ্রন্থ এক প্রবল ধাক্কায় সে জঞ্জাল দূর করে দিয়েছিল। এবং তাঁর এ গ্রন্থ আলোবাতাসহীন নার্সারী ও বিদ্যালয়ের শ্বাসরোধকারী অবরুদ্ধ কক্ষে এনে দিয়েছে প্রভাতসূর্যের আলোর বন্যা আর নবপ্রভাতের সতেজ বায়ু-প্রবাহ।"[২০] তার শিক্ষাদর্শের দুর্বলতা ও স্ববিরোধের চেয়ে তার প্রাণবত্তা ও সত্যতা অনেক বেশী, তাই আজও এমিল্ তার প্রভাব হারায়নি। গ্রেভস্-ও এই মতই প্রকাশ করেছেন, "শিক্ষাবিষয়ে তাঁর এ গ্রন্থ, জগতে যত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তাদের সকলের চেয়ে অদ্ভুত। এমন শক্তি ও দুর্বলতা, মনোহারিত্ব ও বিতৃষ্ণা, উচ্চ আদর্শ ও অসম্ভাব্যতার সংমিশ্রণ দেখা যায় না। কিন্তু এর সমস্ত ত্রুটি ও মিথ্যা মোহকে অতিক্রম করে আছে অবিচল সত্য ও মহৎ অনুভূতির মহত্ত্ব, এবং এ পুস্তকের মূল্য নিরূপণ কালে এর বহু ভ্রান্তির চেয়ে স্মরণ রাখব এর অনেক বেশী সত্য ও মহৎগুণ।"[২১]

---

[২০] Graves : Great Educators of Three Centuries, p. 99
[২১] Graves : Great Educators of Three Centuries, p. 97-98

রবিনসন ক্রুশো, রুশো ও রবীন্দ্রনাথ

রবিনসন ক্রুশো একটি পরম মনোহর শিশুপাঠ্য গল্পগ্রন্থ। শিশুসাহিত্য-রস ও জনপ্রিয়তার দিক্ হতে এই বইয়ের সমকক্ষ খুব বেশী বই নেই। এই পুস্তকের লেখক ড্যানিয়েল ডেফো ১৬৫৯ সালের কাছাকাছি লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন একজন কসাই। ইংল্যাণ্ডের তৎকালীন অশান্ত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। মনমাউথের বিদ্রোহী দলে তিনি ছিলেন, এবং ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় উইলিয়মের সৈন্যদলে যোগদান করেছিলেন। সে সময় থেকেই তিনি ছোট ছোট রাজনৈতিক পুস্তিকায় বিদ্রূপাত্মক গল্প ইত্যাদি লিখতে থাকেন। ১৭০২ সালে ধর্মসমস্যা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখে কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হন এবং তাঁকে কিছুদিনের জন্যে কারারুদ্ধ করা হয়। কারাবাস কালে তিনি বিখ্যাত 'রিভিউ' পত্রিকা স্থাপন করেন। প্রথমতঃ পত্রিকাটি সাপ্তাহিক ছিল, কিন্তু জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে এটি সপ্তাহে তিনবার প্রকাশিত হতে শুরু করে। এ পত্রিকার লেখার মধ্য দিয়ে ডেফো বেশ যশ অর্জন করেছিলেন। এ পত্রিকাটি কিন্তু বেশীদিন চলেনি। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে ডেফো মুক্তি পান এবং এর পর দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর তিনি নানা প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি রচনা করেন। তিনি সরকারের গুপ্তচর হিসাবে ইউরোপ এবং স্কটল্যাণ্ডে অনেক জায়গায় ভ্রমণ করেছেন এবং সম্ভবতঃ এই ভ্রমণস্পৃহাই ভবিষ্যতে রবিনসন ক্রুশোর কাহিনী-রচনায় তাঁকে প্রবুদ্ধ করেছিল। ১৭১৯ সালে রবিনসন ক্রুশোর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় এবং অল্পকাল মধ্যেই পুস্তকখানি অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বাস্তবিক পক্ষে রবিনসন ক্রুশোর লেখক হিসাবেই ডেফোর নাম সাহিত্যক্ষেত্রে অমর হয়ে আছে।

এ পুস্তকের আখ্যানবস্তু যেমন কৌতূহলোদ্দীপক, তেমনি হৃদয়গ্রাহী। শিশু-কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করবার এবং তাদের চিত্ত জয় করবার উপযোগী দুঃসাহসিক রোমাঞ্চকর কাহিনীতে পুস্তকখানি প্রথম থেকে শেষ পৃষ্ঠা অবধি পূর্ণ, এবং একবার এ বই পড়তে আরম্ভ করলে, শেষ না করে ওঠা অসম্ভব। অথচ এমনি সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে লেখা যে, এ কাহিনী অলীক ও কাল্পনিক বলে মনেই হয় না।

রবিনসন ক্রুশো মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। বাল্যকাল থেকেই তার মনে সাধ

সমুদ্র ভ্রমণের এবং নানা দেশ দর্শনের। কিন্তু তার পিতামাতা এর বিরোধী ছিলেন। বালক ক্রুশোকে তার পিতা নানা উপায়ে প্রতিনিবৃত্ত করবার চেষ্টা করলেন। বালক ক্রুশোর কাছে অসীম সমুদ্রের আহ্বান এত প্রবল হয়ে উঠল যে, এক বন্ধুর আহ্বানে প্রলুব্ধ হয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে হাল্ বন্দর থেকে সমুদ্রপথে সে লণ্ডন যাত্রা করল। এই প্রথম সমুদ্রযাত্রা কিন্তু মোটেই আনন্দের হোল না। যাত্রার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জাহাজটি ঝড়ের মুখে পড়ল এবং নানা বিপদ ও দুর্দশার পরে জাহাজটি স্কটল্যাণ্ডের উত্তরে উইটারটননেস-এর কাছাকাছি বাত্যাতাড়িত হয়ে অবশেষে ডুবে গেল। বহু কষ্টে ক্রুশো, জাহাজের নাবিক ও আরোহীদের প্রাণরক্ষা হোল। এই ঝড় ও ঝড়ের মুখে বিপন্ন জাহাজের অবস্থার যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা প্রত্যেক শিশুর মনে দোলা দিয়ে যায়। এ প্রকার বহু কাহিনী, বিভিন্ন সমুদ্রযাত্রার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা সহজেই শিশু-মনকে বইয়ের প্রথম থেকেই আকর্ষণ করে। প্রথম সমুদ্রযাত্রার বিরূপ অভিজ্ঞতা কিন্তু ক্রুশোর পক্ষে যথেষ্ট হোল না। বরং লণ্ডনে এসে একজন জাহাজের কর্তার সঙ্গে তার পরিচয় হোল। ইনি গিনি উপকূলে বাণিজ্য করে বহু লাভবান হয়েছেন এবং আবার সেখানে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এ যাত্রা কিন্তু ক্রুশোর সৌভাগ্যবশতঃ খুব লাভজনক হয়েছিল, এবং লণ্ডনে যখন ক্রুশো ফিরে এল তখন তার হাতে নগদ ৩০০ পাউণ্ড। এতে তার লোভ বেড়ে গেল, এবং আবার গিনি উপকূলে যাত্রার জন্যে ক্রুশো তৈরী হোল। এ যাত্রায় তাদের দুর্দশার অবধি রইল না। তাদের জাহাজ তুর্কী জলদস্যুরা লুঠ করল এবং ক্রুশো ও তার সঙ্গীদের মূর অধিকৃত স্যালী বন্দরে ক্রীতদাস হিসাবে নিয়ে গেল। ক্রুশোর চেহারা দেখে এবং তার বুদ্ধিমত্তা ও কুশলতার জন্যে জলদস্যুর সর্দার ক্রুশোকে নিজের সহচর ও ভৃত্য হিসাবে রেখে দিলেন। কয়েক বৎসর এই দাস-জীবন যাপন করার পর, কি করে দুঃসাহসিক কৌশলের বলে ক্রুশো এক ছোট জাহাজ নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এল এবং একটি ব্রাজিলগামী জাহাজের ক্যাপ্টেন তাকে দয়া করে উদ্ধার করল সে কাহিনীও কম চিত্তাকর্ষক নয়। তারপর সে সুদূর ব্রাজিল দেশে আর এক বন্ধুর সহায়তায় জমি কিনে চিনির কার-খানা খুলল। বেশ লাভও তাতে হতে লাগল। তার কারখানার উন্নতি হতে লাগল—আরো জমি কিনে কারখানা সে বাড়াল। কিন্তু ক্রীতদাসের অভাবে চাষবাস ও কারখানার কাজে অসুবিধা হতে লাগল। সেকালে গিনি উপকূল

থেকে নিগ্রো ধরে এনে ক্রীতদাস হিসাবে ব্রাজিল ও অন্যান্য দেশে বিক্রি করা খুব লাভজনক ব্যবসায় ছিল। লাভের আশায় এবং নিজের কারখানার জন্যেও লোকসংগ্রহের আগ্রহে ক্রুশো এক জাহাজ নিয়ে গিনি উপকূলে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল। এ যাত্রায়ও জাহাজ ঝড়ের মুখে পড়ল। ক্রমাগত ঝড়ের বেগে জাহাজ দিক হারিয়ে ফেলল, এবং আফ্রিকার উপকূলে না পৌঁছে উত্তর-পশ্চিম ক্যারিবীয়ান উপসাগরে গিয়ে পৌঁছল। এ সব দেশ তখন সভ্য-জগতের কাছে অজ্ঞাত, ভীষণ হিংস্র জন্তু ও নৃশংস অসভ্য বর্বর জাতিদের বাসস্থান ছিল। ঝড়ের মুখে জাহাজ উড়ে চলল এবং প্রচণ্ডবেগে এক ডুবো পাহাড়ে এসে আঘাত করল। জাহাজ যে কোন মুহূর্তে ডুবে যাবার ভয় ছিল। তাই প্রবল ঝড় সত্ত্বেও জাহাজের ক্যাপ্টেনসহ ১১ জন প্রাণী জাহাজ থেকে ছোট নৌকো নাবিয়ে সমুদ্রে নিরুদ্দেশযাত্রা করল।

অন্যান্য যাত্রীরা তীরে পৌঁছতে পারল না। একা ক্রুশোকে প্রকাণ্ড এক ঢেউ তীরে এনে ফেলল। ক্রুশো প্রাণে বাঁচল বটে, কিন্তু সঙ্গীহীন নির্জন অনুর্বর সম্পূর্ণ অপরিচিত দ্বীপে ক্রুশোর অবস্থা সহজেই অনুমেয়। ক্রুশোর এ মুহূর্তের বিবরণ দিচ্ছি...I had a dreadful deliverance ; for I was wet, had no clothes to shift me, nor anything either to eat or drink to comfort me, neither did I see any prospect before me but that of perishing with hunger or being devoured by wild beasts. And that which was particularly afflicting to me was that I had no weapon either to hunt and kill any creature for my sustenance, to defend myself against any other creature that might desire to kill me for theirs—in a word, I had nothing about me but a knife, a tobacco-pipe, and a little tobacco in a box. This was all my provision, and this threw me into terrible agonies of mind, that for a while I ran about like a madman. Night coming upon me, I began, with a heavy heart, to consider what would be my lot if there were any ravenous beasts in that country, seeing, at night they always come abroad for their prey.

পৃথিবীতে এমন কোন্ কিশোর আছে যার কল্পনা, অনুভূতি, কৌতূহল ক্রুশোর এই কাহিনীতে জাগ্রত হবে না? এমন কোন্ বালক আছে যার চোখ থেকে ঘুম পালিয়ে যাবে না, আর বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে উঠে বসে সে প্রশ্ন করবে না? এর

পর হতে রবিন্‌সন ক্রুশোর নির্জন দ্বীপে বাসের কাহিনী সর্বাপেক্ষা বেশী কৌতূহলোদ্দীপক, রোমাঞ্চকর ও শিক্ষাপ্রদ। ভাগ্যক্রমে ক্রুশো যে দ্বীপে এসে পৌঁছেছিল, তাতে হিংস্রজন্তু ছিল না, এবং তাদের জাহাজ যে ডুবোপাহাড়ে আটকেছিল তা সমুদ্রের মধ্যে হলেও খুব বেশী দূরে ছিল না। ক্রুশো সাঁতরে সে ভাঙা জাহাজে পৌঁছে জাহাজের তক্তা ইত্যাদি দিয়ে ভেলা তৈরী করে জাহাজের মধ্যে যে সব বন্দুক, গুলি, বারুদ, অস্ত্রশস্ত্র, কুড়ুল, করাত, হাতুড়ী, লোহা-পেরেক ইত্যাদি যন্ত্রপাতি, কাপড়-জামা, জাহাজের পাল, দড়িদড়া ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস আর নানা খাদ্যশস্য, মদ, ঔষধ ইত্যাদি যা ছিল সব বারে বারে বহু কষ্টে এবং বহু কৌশলে সেই দ্বীপে এনে হাজির করল। তখন থেকে শুরু হোল এই দ্বীপে দীর্ঘ আটাশ বৎসর নির্জনবাসের পালা। কি করে সে নিজের জন্যে গৃহ ও বাসস্থান নির্মাণ করল, কি করে তাকে সুরক্ষিত করল, কি করে ক্রমে ক্রমে কঠিন পরিশ্রমে শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করল, পশুপালনের ব্যবস্থা করল, প্রকৃতির সহযোগ ও প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে সে কি করে এই নির্জনবাসকে সহনীয় করে তুলল এবং সমস্ত দুঃখ, বিপদের মধ্যেও আত্মপ্রত্যয় ও সাহস না হারিয়ে নিজের উদ্ভাবনী ক্ষমতার উপযুক্ত ব্যবহারের দ্বারা সমস্ত বাধা অতিক্রম করল এবং প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সংযোগে জগৎস্রষ্টার মঙ্গল ইচ্ছায় বিশ্বাস করল, সে মনোমুগ্ধকর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু যখন একটি কর্মব্যস্ত অথচ শান্ত ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনে ক্রুশো অভ্যস্ত হয়ে এসেছে, তখন হঠাৎ আবার কঠিন বিপদের আতঙ্ক-ইঙ্গিত ক্রুশোকে বিচলিত করে তুলল। একদিন সে দেখল সমুদ্রের ধারে বালির উপর অপরিচিত পায়ের বড় বড় দাগ। ক্রুশো বুঝল দূরের দ্বীপ থেকে অসভ্য মানুষেরা এ দ্বীপে এসেছিল। সে শঙ্কিত ও সতর্ক হোল এবং তার বাসস্থান আরো দুর্ভেদ্য করল। এর পর থেকে একাধিকবার এ দ্বীপে অসভ্যদের আগমন হতে লাগল এবং এই নরখাদক রাক্ষসেরা আগুন জেলে মানুষ পুড়িয়ে খেয়েছে এ বীভৎস চিহ্ন দেখে ক্রুশো ঘৃণা ও ভয়ে শিউরে উঠল। এর পর আর একবার এই অসভ্য রাক্ষসরা পৈশাচিক কাণ্ড শেষ করে নৌকাতে নিজেদের দেশে ফিরে যাচ্ছে তাও সে দেখতে পেলে। তখন সে প্রতিজ্ঞা করল এর পর সে ওদের হত্যা করবে এবং সম্ভব হলে ওদের হতভাগ্য বন্দীকে উদ্ধার করবে। সেই ভয়ঙ্কর সুযোগ কয়েক বৎসর পর এল। ক্রুশো তার বাসস্থানের কাছে পাহাড়ের উপর থেকে দূরবীন দিয়ে লক্ষ্য করল দ্বীপের যে অংশে তার দুর্গ সে অংশে সমুদ্রতীরে

পাঁচটি নৌকো। তার পর দেখল অন্ততঃ কুড়িজন অসভ্য রাক্ষস আগুন জেলে দু'জন বন্দীকে চারদিক থেকে ঘিরে হত্যা করছে। তার পরের বিবরণ হচ্ছে—While I was thus looking on them, I perceived by my perspective glass two miserable wretches dragged from the boats, where it seems they were laid by, and were now brought out for the slaughter. I perceived one of them immediately fall, being knocked down, I suppose, with a club or wooden sword—for that was their way-and two or three others were at work immediately cutting him open for their cookery, while the other victim was left standing by himself till they should be ready for him. In that very moment this poor wretch seeing himself a little at liberty, nature inspired him with hopes of life, and he started away from them, and ran with incredible swiftness along the sands directly towards me...
এমন কাহিনী পাঠে নিতান্ত যে স্থবির বৃদ্ধ, তারও রক্ত বুঝি চঞ্চল হয়ে উঠবে। বালকদের তো কথাই নেই। এর পরের কাহিনী হচ্ছে এ অসভ্যদের অধিকাংশকে হত্যা ক'রে ক্রুশো তাদের বন্দীটিকে উদ্ধার করলে, এবং শুক্রবার দিন তাকে উদ্ধার করা হয়েছিল, তাই তার নাম দেওয়া হোল ফ্রাইডে। এত বৎসর পরে ক্রুশো একজন মানুষ সঙ্গী পেল। ইতিপূর্বে অবশ্য একটি তোতাপাখী 'পলি'কে সে পুষেছিল এবং তাকে 'ক্রুশো' বুলিটি শিখিয়েছিল। একটি কুকুর এবং কয়েকটি ছাগল ইতিপূর্বে তার সঙ্গী হয়েছিল। ফ্রাইডে ক্রুশোর বিশ্বস্ত ভৃত্য হোল; তাকে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে কথা বলতে এবং নানা কাজ করতে ক্রুশো শেখালে। এর পরে আবারও অসভ্যদের আক্রমণ হোল এবং ক্রুশো ও ফ্রাইডে মিলে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে আবার দু'জন বন্দীকে উদ্ধার করল—তার মধ্যে একজন শ্বেতাঙ্গ ও আর একজন ফ্রাইডের বৃদ্ধ পিতা। আরও কয়েক বৎসর কাটলে সেই দ্বীপের নানা উন্নতি তারা করল। অবশেষে এক ইংরেজ ক্যাপ্টেনের জাহাজ সে দ্বীপে এসে ভিড়ল। তার বদমায়েস নাবিকেরা ক্যাপ্টেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে এ নির্জন দ্বীপে ফেলে যাবার উপক্রম করেছিল। ক্রুশো কি করে সেই ক্যাপ্টেনের সহযোগী হোল, কি করে বিদ্রোহী নাবিকদের শায়েস্তা করল, এবং জাহাজটা দখল করল—সে এক রোমাঞ্চকর চিত্তাকর্ষক কাহিনী। দীর্ঘ আটাশ বৎসর পর সে দ্বীপ ক্রুশো ত্যাগ করল ফ্রাইডে ও তার অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে করে। কৃতজ্ঞ ক্যাপ্টেন তাদের ইংল্যাণ্ডে পৌঁছে দিল। ক্রুশো পঁয়ত্রিশ বৎসর পর যখন দেশে ফিরে এল তখন

পিতামাতা আত্মীয়স্বজন আর কেউ জীবিত নেই। যাক, ক্রুশো এর পর বিবাহ করে সংসারধর্মে মন দিল। কিন্তু ভ্রমণের নেশা তাকে এমনই পেয়ে বসেছিল যে স্ত্রীর মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে ফের বেরিয়ে পড়ল পথে।

আমার কথাটি ফুরোল—

ক্রুশোর এই মনোরম কাহিনী বহু বৎসর ধরে নানা দেশের শিশুদের চিত্ত জয় করেছে। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক সভ্য ভাষায় বইখানার অনুবাদ হয়েছে এবং শুধু মাত্র এর ইংরেজী নানা সংস্করণই এক কোটির বেশী বিক্রি হয়েছে। রাশিয়ার নতুন আমলে শিশু-সাহিত্যের উপর কড়া নজর রাখা হয়। নিতান্ত অলস কল্পনামূলক বই, যেমন আমাদের 'ঠাকুরমার ঝুলি' বা বিলাতের 'এলিস ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' বা 'পিটার প্যান' জাতীয় বই সেখানে নিষিদ্ধ। গল্পের মধ্যে মানুষের জয়গান, সামাজিক শুভের ইঙ্গিত ইত্যাদি উদ্দেশ্য থাকা চাই। এ জন্যে রবিন্‌সন ক্রুশোর সেখানে যথেষ্ট আদর আছে।

রবিন্‌সন ক্রুশোর প্রথম সংস্করণে ডেফো ভূমিকায় লিখেছিলেন ঃ "If ever the story of any private man's adventures in the world were worth making public and were acceptable when published, the Editor of this account thinks this will be so.

The wonders of this man's life exceed all that (he thinks) so to be found extant ; the life of one man being scarce capable of a greater variety.

The story is told with modesty, with seriousness, and with a religious application of events to the news to which wise men always apply them, viz., to the instruction of others by this example, and to justify and honour the wisdom of Providence in all variety of our circumstances, happen how they will."

ডেফোর আশা সফল হয়েছে। কেবল যে চিত্তাকর্ষক গল্প হিসাবেই বইখানা বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তা নয়, বিভিন্ন শিক্ষাব্রতীর কাছেও তাঁর শিক্ষাদর্শ যথেষ্ট আদর পেয়েছে। এ সম্বন্ধে রুশোর কথা বলা চলে। তিনি য়ুরোপে শিক্ষা-বিষয়ে বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন। প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষক অনিচ্ছুক ছাত্রমণ্ডলীকে তাড়নার দ্বারা দুর্বোধ্য পুস্তক ইত্যাদির সাহায্যে বিদ্যাদান করতেন। রুশো এই গতানুগতিক নির্মম পদ্ধতিকে তীক্ষ্ণ উপহাসদ্বারা বিদ্ধ করেন। তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি বলেছিলেন, "মানুষ

স্বভাবতঃ সাধু ও স্বাধীন কিন্তু মানুষ তার কৃত্রিম সভ্যতা ও সমাজ-ব্যবস্থা বিষয়ে নিজেকে বিকৃত ও শৃঙ্খলিত করেছে"—"Man was born free but everywhere he is in chains." প্রকৃতিই মানুষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক এবং প্রত্যেক শিশুকে তার স্বভাব, রুচি, শক্তি ও প্রয়োজন অনুযায়ী গড়ে উঠতে সাহায্য করাই শিক্ষকের একমাত্র কর্তব্য। শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্র হবে নগর-সভ্যতা থেকে দূরে—প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনে। প্রকৃতির স্বাস্থ্যকর সাহচর্যে গড়ে উঠবে তার দেহ, মন, বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব। প্রকৃতির নানা দ্রব্য ও ঘটনা তার কৌতূহল উদ্রেক করবে, তার ইন্দ্রিয়াদিকে সক্রিয় ও সতেজ করবে। প্রকৃতির নানা প্রতিকূলতা ও বাধা তার পৌরুষকে জাগ্রত করবে, তার উদ্ভাবনী-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করবে। এই কঠিন বাস্তবসম্পর্কযুক্ত শিক্ষাই সার্থক শিক্ষা। তাই রুশোর মতে বারো বৎসর পর্যন্ত শিশুকে বইপত্র, ম্যাপ, গ্লোব ইত্যাদি দিয়ে শিক্ষাদানের চেষ্টা থেকে বিরত থাকতে হবে। বই পড়ে যে শেখে সে নিজ চেষ্টা দিয়ে জানতে শেখে না। সে হয় দাস, প্রভু হয় না। রুশো বলছেন: "There must be no other books than the world, no other instruction than facts. The child who reads does not think, he does nothing but read, he gets no instruction, he learns words." শক্তি ও শাসনের জোরে শিশুকে শিক্ষাদান, এ তো বর্বরতা। শিশু শিখবে তার স্বতঃস্ফূর্ত অনুসন্ধিৎসার আনন্দে।

এ রকম পুস্তকবিরোধী রুশোও কিন্তু একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করেছেন এবং সে ব্যতিক্রমটি হচ্ছে রবিন্‌সন ক্রুশো। তিনি এটি শিশুদের অবশ্যপাঠ্য বলে নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে তাঁর স্বাভাবিক শিক্ষানীতির বাস্তব প্রয়োগ রয়েছে এই বইখানায়। জনমানবহীন অকর্ষিত দ্বীপে এই নিঃসঙ্গ মানুষ ক্রুশো প্রকৃতির সাহচর্যে জীবনযাপন করছে, আত্মরক্ষা ও জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনই তাকে আত্ম-নির্ভরশীল ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী করেছে। প্রকৃতির নানা বাধা ও বিপদ সে জয় করেছে নিজের একক চেষ্টায়। এই কঠিন পরিবেশ তার উদ্ভাবনী-শক্তি ও কর্মকুশলতাকে জাগ্রত করেছে। এবং এই বিপদ ও দুঃখের মধ্যেই জগৎ-কারণ ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছার সন্ধান সে পেয়েছে। মানুষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা সে লাভ করেছে, —নিজ ব্যক্তিত্বের বিকাশ সে করেছে প্রকৃতির কাছে থেকে। রবিন্‌সন ক্রুশো সম্বন্ধে রুশো লিখছেন—"where all the natural needs of man are exhibited in a manner obvious to the mind of a child, and where the means of providing for these needs are successively developed

with the same facility." রুশোর মতে রবিন্‌সন ক্রুশোই হচ্ছে স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের প্রকৃত রূপ, সভ্যতার কলুষ যাকে বিকৃত করে নি।

রুশোর পরবর্তী কালে তাঁর শিক্ষানীতিকে বাস্তবক্ষেত্রে অনুসরণ করবার জন্যে বেসডাও, ক্যাম্প, সালজ্‌মান-প্রমুখ শিক্ষাবিদেরা রুশোর নীতি অনুযায়ী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁরা সেখানে পাঠ্য হিসাবে রবিন্‌সন ক্রুশোর অনুকরণে শিশু-সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। এ বইগুলির মধ্যে ক্যাম্প-এর রচিত Robinson der Jingere (ইংরেজী অনুবাদ—Swiss Family Robinson) প্রসিদ্ধি লাভ করে।

আমাদের দেশেও শিক্ষাবিদ্ রবীন্দ্রনাথকে রবিনসন ক্রুশো মুগ্ধ করেছে। শিশুকালেই তিনি রবিন্‌সন ক্রুশোর বাঙলা অনুবাদ পাঠ করে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বাল্যকালে তিনিও অনেকটা নিঃসঙ্গ ছিলেন। বিদ্যালয়ের রুদ্ধ পরিবেশ ও গতানুগতিকতা তাঁর সৃজনশীল কল্পনাসমৃদ্ধ মনকে আঘাত করত। তাই তিনি ছিলেন "ইস্কুল পালানো ছেলে।" বাস্তবিক পক্ষে বিদ্যালয়ের রুটিনমাফিক শিক্ষা তিনি খুব কমই লাভ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীলাভ তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। তাই এটা খুবই স্বাভাবিক যে রবিন্‌সন ক্রুশোর আবিষ্কার ও নিত্যনূতন কর্মোদ্যম তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। বাস্তব জগতের বৈচিত্রহীন নিস্তরঙ্গ জীবন থেকে তিনি মুক্তি খুঁজেছিলেন ক্রুশোর কাল্পনিক রোমাঞ্চকর কাহিনীতে। রুশোর মতো তিনিও নাগরিক সভ্যতার কৃত্রিমতায় ও রুচিবিকারে বীতরাগ। তিনিও মানুষের প্রাণের মুক্তি খুঁজেছেন প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনে। তিনি তাঁর 'A Poets School' প্রবন্ধে লিখেছেন..."When I was young I had the great good fortune of coming upon a Bengali translation of *Robinson Crusoe*. I still believe that it is one of the best books for boys that has ever been written...In *Robinson Crusoe*, the delight of the union with nature finds its expression in a story of adventure in which the solitary man is face to face with solitary nature, coaxing her, co-operating with her, explaining her secrets, using all his faculties to win her help."

রুশো ও রবীন্দ্রনাথ দু'জনই শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে প্রধান স্থান দেবার পক্ষপাতী, কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য আছে। একজনের দৃষ্টিভঙ্গী পাশ্চাত্ত্যের জড়বাদীর, আর একজনের দৃষ্টি ভারতীয় অধ্যাত্মবাদীর। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় দৃষ্টিতে প্রকৃতির আকাশ-বাতাস, গাছ-পাতা, ফুল-ফল সকলের মধ্যেই

মানুষের সঙ্গে গভীর একাত্মতা অনুভব করেছেন। প্রকৃতির পরিপূর্ণতা ও আনন্দের মধ্যে মানুষের গভীরতম শান্তি। প্রকৃতি মানুষের সখী—তার মাতা, তার ধাত্রী। তার কাছ থেকে মানুষ প্রাণরস আহরণ করে—তার দাক্ষিণ্যের মধ্যেই সে অনুভব করে বিশ্বস্রষ্টার প্রেম। প্রকৃতি নিত্যই নূতন—মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই তার নতুন প্রাণের সূচনা। প্রকৃতির মধ্যে তাই আছে চলার আনন্দ, গতির আনন্দ, আবিষ্কারের আনন্দ। প্রকৃতির ধ্যানের মধ্যে মানবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে নিবিড় আত্মীয় বন্ধনে মিলিত হয়। ভারতের সভ্যতার কেন্দ্র তাই কোলাহল-মুখরিত নগর নয়, শান্তরসাস্পদ তপোবন। তপোবন মানুষের লালসা ও লোভকে উদগ্র করে তোলে না—তার অতৃপ্ত কামনার বহ্নিতে শান্তিজল নিক্ষেপ করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'তপোবন' প্রবন্ধে লিখেছেন, "ভারতবর্ষে এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেছে, এখানকার সভ্যতার মূল প্রস্রবণ শহরে নয়, বনে। ভারতবর্ষের প্রথমতম আশ্চর্য বিকাশ যেখানে দেখতে পাই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি করে একেবারে পিণ্ড পাকিয়ে ওঠেনি। সেখানে গাছপালা নদী সরোবর মানুষের সঙ্গে মিলে থাকবার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিল। সেখানে মানুষও ছিল, ফাঁকও ছিল—ঠেলাঠেলি ছিল না। অথচ এই ফাঁকায় ভারতবর্ষের চিত্তকে জড়প্রায় করে দেয়নি, বরঞ্চ তার চেতনাকে আরো উজ্জ্বল করে দিয়েছিল।" আর এক জায়গায় লিখেছেন, "এই রকমে আরণ্যকদের সাধনা থেকে ভারতবর্ষ সভ্যতার যে প্রৈতি (energy) লাভ করেছিল সেটা নাকি বাইরের সংঘাত থেকে ঘটেনি, নানা প্রয়োজনের প্রতিযোগিতা থেকে জাগেনি, এই জন্যে সেই শক্তিটা প্রধানতঃ বহির্মুখী হয়নি। সে ধ্যানের দ্বারা বিশ্বের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করেছে, নিখিলের সঙ্গে আত্মার যোগ স্থাপন করেছে। সেই জন্যে ঐশ্বর্যের উপকরণেই প্রধানভাবে ভারতবর্ষ আপনার সভ্যতার পরিচয় দেয়নি। এই সভ্যতার যাঁরা কাণ্ডারী তাঁরা নির্জনবাসী, তাঁরা বিরলবসন তপস্বী।"

পশ্চিম কিন্তু প্রকৃতিকে দেখেছে তার বৈরীরূপে। প্রকৃতিকে সে চেয়েছে জয় করতে—তাকে ভোগ করতে। প্রকৃতির বাধা তার বুদ্ধি ও কর্মশক্তি—তার পৌরুষকে জাগ্রত করেছে। ডারউইন্ প্রকৃতিকে দেখেছেন রুধিরাক্ত দশন-নখর নির্মম রাক্ষসীরূপে…Nature red in tooth and claw. প্রকৃতিতে আছে প্রাণীর আত্মরক্ষা ও আত্মবিস্তৃতির বিরামহীন সংগ্রাম। প্রকৃতির জয়েই মানুষের পৌরুষ, —তার প্রকৃত মনুষ্যত্ব। পশ্চিমের রাজসিক মন প্রকৃতিকে দেখেছে অনিচ্ছুক

ভীষণাসুন্দরী নারী হিসাবে,—লুব্ধ মানুষের সবল পৌরুষের কাছে সে আত্মসমর্পণ করবে।—বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। সে মাতা নয়,—চতুরা বারাঙ্গনা।

রবিন্‌সন ক্রুশো রুশোকে আকৃষ্ট করেছে, কারণ এখানে তিনি দেখেছেন মানুষ কি করে প্রকৃতিকে জয় করল তার গৌরবময় কাহিনী। কিন্তু ক্রুশোর কাহিনী রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছে, কারণ তিনি এতে দেখেছেন মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় প্রেমকাহিনী। তিনি লিখেছেন, "The joy I felt in reading this book was not in sharing the pride of a human success against the closed fist of a parsimonious nature, but in active realisation of harmony with her through intelligently determined dealings, the natural conclusion of which was success. And this is the heroic love adventure of the west, the active wooing of the earth."

পাশ্চাত্ত্যের এই বীর্যবান মনুষ্যত্বের প্রতি রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধাশীল। তাই তপোবনের আদর্শে যখন তিনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন তখন তিনি একথা ভুলে যাননি যে, বর্তমান জগতে প্রাচীন তপোবন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসু মন অমাদেরও প্রয়োজন। আমাদের দেশের ছাত্ররা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক মনোভাবে ভাবিত হোক, এটা তিনি চেয়েছিলেন। কিন্তু পশ্চিমের ঐশ্বর্য ও আহরণের মোহ যেন আমাদের ভারতীয় দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন না করে এই ছিল তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টা। শান্তিনিকেতনকে তাই পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের ক্ষেত্ররূপেই তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছেন। তাই শহর থেকে দূরে, শান্তপ্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি স্থাপন করেছিলেন তাঁর বিদ্যালয়, কিন্তু তাতে পশ্চিমের জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্বার ছিল উন্মুক্ত। তিনি একে একটি সার্থকরূপ দিয়েছেন। ক্রুশোর মত অন্তরের সমস্ত প্রীতি ও শক্তি দিয়ে চেয়েছেন এ প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলতে এবং এও চেয়েছেন ছাত্রদের সৃজনীশক্তি ও প্রতিভা এ শিক্ষার মধ্যে দিয়েই বিকশিত করে তুলতে। তিনি নিজে লিখেছেন—"Robinson Crusoe's island comes to my mind when I think an institution where the first great lesson in the perfect union of man and nature, not only through love but through active communication, can be unobstructed...The primary object of an institution of this kind should not merely be to educate one's limbs and mind to be in efficient readiness for all emergencies, but to be in perfect tune in the symphony of response between life and world, to find the balance of their

harmony which is wisdom. The first important lesson for children in such a place could be that of improvisation, the constant imposition of the readymade having been banished therefrom, in order to give constant occasions to experiment one's capacity through supervision of achievement. I must make it plain that this means a lesson not in simple life, but in creative life. For life may grow complex yet; if there is a living personality in its centre, it will still have the unity of creation. It will carry its own weight in perfect grace." শান্তিনিকেতনে তিনি এই বৈশিষ্ট্যই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

যোহন হেনরিক্ পেস্তালৎসী (১৭৪৬-১৮২৭)

শিক্ষায় মনস্তত্ত্বের নূতন ধারা

বাইবেলে একটি তাৎপর্যপূর্ণ উপকথা আছে—'দি প্যারেবল্ অব্ দি সোয়ার'। শস্যবপনকারী কৃষক ছড়িয়ে দিলে শস্যের বীজ চতুর্দিকে। কিছু বীজ পড়ল উষর প্রস্তরাকীর্ণ ভূমিতে,—তাতে অঙ্কুরের উদ্ভব হোল না। কিছু বীজ পড়ল পথের ধারে—পাখীরা তা খেয়ে গেল; কিছু বীজ পড়ল আগাছা-গুল্মলতায় ঢাকা জমিতে,—বীজ অঙ্কুরিত হলেও প্রতিকূল পরিবেশে শস্য জন্মাল না। কিন্তু কিছু বীজ পড়ল আগ্রহান্বিত উর্বর ভূমিতে—সেখানে জন্মাল সতেজ সুপুষ্ট শস্য, ভবিষ্যতের আনন্দময় সম্ভাবনা নিয়ে।

বাইবেলের উপকথা ধর্মজগতের সত্য সম্বন্ধে। ধর্মজগতে যে কথা সত্য, চিন্তা-জগতের সর্বত্র সে কথা সত্য। রুশো তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারা দিয়ে মধ্যযুগের পরবর্তী য়ুরোপে বিত্তমানের উৎপীড়ন, সমাজের হৃদয়হীনতা ও কৃত্রিমতা, শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাচীন পন্থার অপরিমেয় মূঢ়তাকে কঠিন আঘাত হানলেন। সে আঘাত এতই অসংযত ও ধ্বংসাত্মক যে তরুণগণ বিষম আলোড়ন তুললেও, 'শিকলদেবীর ওই যে পূজাবেদী' তা খাড়াই রইল, অচলায়তনের অটল গাম্ভীর্য অটুট থাকল। রুশোর ভাগ্যে জুটল নিন্দা, উপহাস, শাসন ও তিরস্কার।

কিন্তু কিছুই কি ফল হোল না? কিছুই কি বদলাল না? রুশোর চিন্তার

মধ্যে যে জীবন্ত সত্য ছিল তা সংস্কারকামী আদর্শবাদী চিন্তাশীল যুবকমণ্ডলীকে উদ্‌বুদ্ধ করে তুলল। যা ছিল নেতিবাচক, তা গঠনাত্মক চিন্তা ও কর্মে রূপ নিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে রুশোর সফলতম উত্তরসাধক হলেন পেস্‌তালৎসী (১৭৪৬-১৮২৭)। য়ুরোপে গত দুই শতাব্দীতে শিক্ষার ক্ষেত্রে যত নতুন পরীক্ষা হয়েছে তার সূত্রপাত করেছিলেন পেস্‌তালৎসী,—আর তাঁর সমস্ত পরীক্ষা ও পদ্ধতির মূলে ছিল রুশোর 'সোস্যাল্ কনট্রাক্ট্' ও 'এমিল্'।

ব্যক্তিগত চরিত্রের দিক থেকে এ দু'জনের পার্থক্য যথেষ্ট। প্রচলিত নীতি-জ্ঞানের মাপকাঠিতে রুশো চরিত্রহীন, মিথ্যাচারী, অসংযত, অনির্ভরশীল। পেস্‌তালৎসী শুচিস্বভাব, ধর্মবিশ্বাসী, সত্যনিষ্ঠ। কিন্তু এক জায়গায় দু'জনেরই মিল আছে। দু'জনেই মানবপ্রেমিক, দুঃখীর দুঃখে বিগলিতহৃদয়, বিত্তবান্ ও হৃদয়হীনের উৎপীড়নের মূলোচ্ছেদে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দু'জনেই বুঝেছিলেন—নতুন সমাজ গড়তে গেলে পুরনো শিক্ষাপদ্ধতিকে বদলাতে হবে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে নতুন শিক্ষায় নতুন মানুষ গড়তে হবে। দু'জনেই বিশ্বাস করেছিলেন মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বে। দু'জনেই বিশ্বাস করেছিলেন—প্রকৃত শিক্ষা বাইরে থেকে চাপানো নয়, তা স্বভাব থেকে উদ্ভূত,—শিশুর শক্তি, আগ্রহ, রুচি ও উদ্যমই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন। দু'জনেই চেয়েছিলেন শিক্ষকের তাড়না ও শাসন এবং বুদ্ধিহীন মুখস্থকরণ রূপ প্রাচীন পদ্ধতির বর্জন। দু'জনেরই অভিমত ছিল শিক্ষা ছাত্রের মনের স্বাভাবিক বিকাশকে অনুসরণ করবে, কারণ শিক্ষা হচ্ছে শিশুর স্বাভাবিক ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ।

তবে পেস্‌তালৎসী রুশোর মূলতঃ নেতিবাচক, ভাববাষ্পাচ্ছন্ন, পরস্পরবিরোধী, কতকটা অস্পষ্ট শিক্ষানীতিকে সফলতর পরিণতিতে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। শিক্ষার প্রকৃতি কি, তার উদ্দেশ্য কি, এবং তার পদ্ধতি কি—এ তিনটি বিষয়েই তিনি রুশোর ধ্বংসাত্মক চিন্তাকে গঠনাত্মক রূপ দিতে সমর্থ হয়েছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন নতুন পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা উন্নততর পদ্ধতি নির্ধারণের সাহসিক পন্থা তিনিই প্রথম নির্দেশ করে যান।[১] "পেস্‌তালৎসীই 'এমিল্'এর নেতিবাচক স্বভাববাদকে প্রকৃত শিক্ষাদ্বারা দুর্নীতিপূর্ণ সমাজের সংস্কারের গঠনাত্মক কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছিলেন।"[২] তবে রুশো যে আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা কল্পনা

১ · Monroe, *A Brief Course in the History of Education.*

২ Graves, *Great Educators of Three Centuries*, p. 122.

করেছিলেন তাঁর সমাজবিচ্ছিন্ন মানসসন্তান 'এমিল্'এর জন্যে, পেস্তালৎসী সেই আদর্শ শিক্ষাই দুঃস্থ সমাজের বাস্তব পরিবেশে ব্যবহারে লাগাতে চাইলেন সর্বসাধারণের জন্যে।[৩]

পেস্তালৎসী দেখতে সুন্দর ছিলেন না। তাঁর উচ্চারণ ছিল অস্পষ্ট, শিক্ষক হিসাবে তেমন সাফল্য তিনি অর্জন করেননি; মনোবিদ্যা ও অন্যান্য বিজ্ঞান-বিষয়ে তাঁর জ্ঞান খুব গভীর ছিল না, তাঁর চিন্তা খুব সুশৃঙ্খল নয়—বাহুল্য ও পুনরুক্তি দোষদুষ্ট। তবুও এই সাধুচরিত্র, মানবপ্রেমিক, শিশুদরদী মানুষটির অসাধারণ ব্যক্তিত্ব শুধু তাঁর ছাত্র ও সহকর্মীদের উপর নয়, পৃথিবীর সমস্ত অগ্রগামী শিক্ষাবিদ্দের উপরেই স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছে। চার্লস মোনার্ড পেস্তালৎসীর সম্বন্ধে লিখেছেন, "সুশিক্ষক হওয়ার বিরুদ্ধ সব কিছু দোষই তাঁর ছিল। তাঁর জিভ ছিল ভারী, উচ্চারণ অস্পষ্ট, হাতের লেখা কুৎসিত, অঙ্কন সম্বন্ধে কোন জ্ঞান তাঁর ছিল না, ব্যাকরণের নিয়মকানুনকে তো তিনি ঘৃণাই করতেন। তিনি প্রকৃতি বিজ্ঞানের নানা শাখাই অধ্যয়ন করেছিলেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ ও পরিভাষার দিকে তাঁর কোন মনোযোগ ছিল না। সাধারণ অঙ্কের নিয়ম তিনি জানতেন, কিন্তু লম্বা গুণ বা ভাগ করতে গেলে তিনি বিপদে পড়তেন। এবং সম্ভবতঃ জ্যামিতির কোন সমস্যার সমাধানের চেষ্টাও তিনি কোনদিন করেন নি।" কিন্তু তাঁর গভীর সহানুভূতি শিশু-চরিত্র সম্বন্ধে যে অন্তর্দৃষ্টি এনে দিয়েছিল তা বহু অধ্যয়নেও সম্ভব হত না। আর তাঁর অদম্য উৎসাহ ও নতুন পরীক্ষার স্পৃহা—শিক্ষাপদ্ধতিতে নতুন নতুন পরিবর্তন প্রবর্তনে তাঁকে আগ্রহান্বিত করেছিল। তাঁর সব পরীক্ষা সফল হয়নি, তাঁর প্রবর্তিত সব পদ্ধতিও নির্ভুল নয়, তথাপি তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষার যে সাহসিক পন্থা নির্দেশ করেছেন তা অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছে।[৪]

রুশোর ধ্বংসাত্মক চিন্তার মধ্যে যেমন তাঁর অসংযত জীবনের ছাপ সুস্পষ্ট, তেমনি পেস্তালৎসীর মানবিকগুণসম্পন্ন চিন্তার মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর উদ্যমশীল মরমী জীবন। সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখ শহরে ১৭৪৬ সালে পেস্তালৎসী জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁর মা-ই তাঁকে সযত্নে লালন-পালন করে মানুষ করেন। আর ছিল পুরাতন ভৃত্য

৩ Quick, *Essays on Educational Reformers.*

৪ Rusk, *The Doctrines of Great Educators.*

ব্যাবেলি। অসামান্যা মহিলা ছিলেন পেস্তালৎসীর মা। ধর্মভীরু, সদাচারিণী, নিঃস্বার্থপর ও নিরলস এই মা পেস্তালৎসীর বাল্যকালের শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন। আর ছিল প্রভুপুত্রবৎসল বৃদ্ধ ভৃত্য ব্যাবেলির স্নেহ ও শাসন। তাঁর বাল্যজীবনের এ শুভ প্রভাব পেস্তালৎসীর জীবনে গভীরতম ছায়াপাত করেছিল। তাই ভবিষ্যতে দেখতে পাই তাঁর চিন্তায় এই স্পষ্ট স্বীকৃতি যে, স্নেহপূর্ণ সংযত গৃহই শিক্ষার উপযুক্ত স্থান; গৃহের স্নেহ ও সহযোগিতার আদর্শই শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের আদর্শ, বিদ্যালয় শুধু মস্তিষ্ক-চালনার ক্ষেত্র নয়, হৃদয় ও হস্তও সেখানে শুভ উদ্দেশ্যে সুপরিচালিত হবে।[৫] পেস্তালৎসীর বাল্যজীবনে আর একজন ব্যক্তির প্রভাবও সামান্য নয়—তিনি তাঁর পিতামহ। ইনি পার্শ্ববর্তী এক গ্রামের ধর্মযাজক ছিলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পেস্তালৎসীও রুগ্ন ও দরিদ্রদের পরিদর্শনে যেতেন এবং এই সাধারণ মানুষদের দুঃখ, বেদনা, সমস্যার সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। ফলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর গভীর একাত্মবোধ স্থাপিত হয়।[৬] তাঁর মনে তখন থেকেই সংকল্প জাগে,

> "এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
> দিতে হবে ভাষা,
> এই সব ভগ্ন শুষ্ক বুকে
> ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।"

পিতামহের মহৎ দৃষ্টান্তই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল ধর্মযাজক হতে। কিন্তু উপদেশ ও প্রার্থনার প্রথম পরীক্ষার দিন তাঁর মুখ দিয়ে একটি কথাও উচ্চারিত হোল না,—এমনি ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। ধর্মযাজক যখন হওয়া গেল না, তখন তাঁর মনে হোল আইন শিখতে হবে, যাতে দরিদ্র ও উৎপীড়িত যারা তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায়। তিনি আর তাঁর সমবয়সী কয়টি যুবক তখন জুরিখ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি উৎসাহী ছাত্রসমিতি গঠন করেন ও একটি প্রগতিশীল পত্রিকাও প্রকাশ করলেন। কিন্তু প্রাচীনপন্থী কর্তৃপক্ষ এঁদের এই 'গরম' আন্দোলন সুনজরে দেখলেন না। পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হোল,—পেস্তালৎসী কিছুদিন জেলও খাটলেন।

এবার রুশোর 'এমিল্' গ্রন্থটি পেস্তালৎসীর মাথায় সমাজ-সংস্কারের নতুন

৫ Graves, *Great Educators of Three Centuries*, p. 123.

৬ Quick, *Essays on Educational Reformers*, p. 356.

আদর্শ ঢুকিয়ে দিল। আইন ব্যবসা ছেড়ে তিনি হলেন নতুন পদ্ধতির কৃষক। "স্বভাব-সম্মত" জীবনের মধ্যে দিয়েই নতুন সুখী সমাজ গড়বার আশায় তিনি লেগে পড়লেন। কিছুদিন শিক্ষা নিলেন বৈজ্ঞানিক কৃষিবিদ্যা সম্বন্ধে। ১৭৬৯ সালে বির্ গ্রামে একখণ্ড পতিত জমি ক্রয় করে তিনি নতুন কৃষি-পরীক্ষা শুরু করলেন। এই খামারের নাম দিলেন 'নিউহফ্'—মানে 'নয়া খামার'। সরল কৃষকের জীবন যাপনে তাঁর দুঃখ ছিল না। 'নতুন কিছু করা'র নেশায় তিনি মশগুল। নিজের হাতে নতুন চাষ-বাস, নতুন ফসল ফলাবার পরীক্ষায় তিনি মত্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর এ পাগলামিতে সানন্দে সহযোগিতা করেছিলেন তাঁর স্ত্রী। সত্যি তিনি ছিলেন স্বামীর সহধর্মিণী,—স্বামীর আদর্শে ও তাঁর ক্ষমতায় তাঁর পরিপূর্ণ আস্থা ছিল। সমস্ত জীবন পেস্তালৎসীর নানা পরীক্ষা, বিফলতা, দুঃখ-দারিদ্র্য, সম্মান, সফলতা, যশ, সমস্তের মধ্যে দিয়েই ছায়ার মত তিনি স্বামীর অনুসঙ্গিনী হয়েছিলেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে পেস্তালৎসী সমস্ত জীবন ভরে যে কর্মোদ্যম ও আদর্শানুসরণের পরিচয় দিয়েছেন তার পিছনে শক্তি, সাহস সান্ত্বনা জুগিয়েছেন তাঁর যোগ্যা সহধর্মিণী। কিন্তু পেস্তালৎসী ভাল ব্যবসায়ী ছিলেন না, ভাল ম্যানেজার ছিলেন না। কৃষি-পরীক্ষার দিক থেকে তাঁর খামার 'ফেল-মার্কা' ছিল না, কিন্তু ব্যবসায় হিসাবে পাঁচ বছরের মধ্যেই তাঁর খামার বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন। এর মধ্যে পেস্তালৎসীর একটি ছেলে হয়েছে। তিনি কিন্তু দমে গেলেন না। তাঁর মনে হোল নিতান্ত সাংসারিক লাভের লোভে খামার চালাতে গিয়েই তা ব্যর্থ হয়েছে। 'এমিল্'এর আদর্শে তখনও তাঁর বিশ্বাস অটল। তিনি তাঁর সন্তান ও নিরাশ্রয় কয়টি শিশুর শিক্ষার কথা ভাবতে লাগলেন। তাঁর এ চিন্তা তিনি তাঁর এক ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাতেই দেখা যায় তাঁর মনে জেগেছিল শিক্ষার এক নতুন আদর্শ—নতুন পদ্ধতির কথা। এ শিক্ষা দরিদ্র সাধারণ ছাত্রদের জন্যে। এতে শুধু বই মুখস্থ করা, শুধু মস্তিষ্কের চর্চা করা নয়—দৈহিক পরিশ্রমের দ্বারা উৎপাদন ও নীতিশিক্ষার ব্যবস্থার কথাও তিনি চিন্তা করেছেন। তিনি চিন্তা করেছেন এমন এক সম্পূর্ণ শিক্ষার কথা যা পেলে ছাত্ররা স্বাবলম্বী ও সুস্থ মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারবে।[৭]

খামার ফেল হওয়ার পর তিনি নিউহফে একটি অনাথাশ্রম খুললেন (১৭৭৪)।

[৭] Graves, *Great Educators of Three Centuries*, p. 124.

সেখানে কুড়িটি দরিদ্রতম বালক-বালিকাকে তিনি গ্রহণ করলেন—আপন সন্তানের মত। তাদের খাওয়াপরা শিক্ষার সব ভার তিনি নিলেন। দামী আসবাবপত্র দিয়ে, বইপত্র ও নানা উপকরণের সাহায্যে দামী শিক্ষার কথা তিনি ভাবতেই পারলেন না। তা তাঁর সাধ্যায়ত্তও ছিল না। তিনি তাদের নানা প্রকার হাতের কাজ শিক্ষা দিতে লাগলেন, ছোট ছোট জমি ভাগ করে চাষ করতে শেখালেন; মেয়েদের দিলেন সংসারের কাজ, সেলাইয়ের কাজ। তখনই তিনি বুঝেছিলেন—মানুষের যেসব অভাব বিশেষ জরুরী সেগুলোই সবচেয়ে বেশী দরকারী, তাই জীবনের পক্ষে কৃষি, গৃহস্থালীর কাজ প্রভৃতি শেখা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। বইপত্রের বদলে তাদের সাধারণ জ্ঞানের বিষয়গুলো শেখালেন তিনি মুখে মুখে, অক্ষর-পরিচয়ের আগেই। অভ্যস্ত করলেন তাদের ইন্দ্রিয় ব্যবহারের দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে আশেপাশের জিনিসগুলো চিনতে। তাদের মুখস্থ করিয়ে দিলেন বাইবেলের গল্পগুলো। এখানেই তিনি শুরু করলেন তাঁর পরীক্ষা—পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজ শিক্ষা। তখনও এ দুই-এর মধ্যে কোন যুক্তিগত সম্বন্ধ (correlation) তিনি আবিষ্কার করেননি। কিন্তু তাঁর পরীক্ষার অভাবনীয় সাফল্য এ কথা প্রমাণ করল যে, এ দুটি শিক্ষাকে যুক্ত করা যায়।[৮] অল্প কয়েকমাসের মধ্যে এ সব বালক-বালিকার শারীরিক, মানসিক, নৈতিক উন্নতি এতই উল্লেখযোগ্য হোল যে, পেস্তালৎসী অতিমাত্রায় উৎফুল্ল হয়ে ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে ফেললেন। এ নতুন ভার বইবার আর্থিক সামর্থ্য যে তাঁর নেই, এ কথা তিনি চিন্তা করলেন না। ফলে ১৭৮০ সালে তিনি একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়লেন।[৯]

তবে তাঁর অনাথাশ্রমের শিক্ষানীতির খ্যাতি ইতিমধ্যেই চারদিকে বেশ কিছুটা ছড়িয়ে পড়েছিল। শিক্ষার মধ্যে দিয়ে সমাজ-সংস্কারের স্বপ্নে বিশ্বাসী এক বন্ধু তাঁকে অনুরোধ করলেন—তাঁর নতুন শিক্ষানীতি সম্বন্ধে একখানা বই প্রকাশ করতে। তার ফলে পেস্তালৎসী—'দি ইভনিং আওয়ার অব্ এ হারমিট্' নামে তাঁর শিক্ষানীতির ১৮০টি সূত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করলেন। বন্ধুই এ ব্যয়ভার বহন করলেন। যদিও এতে শিক্ষার ক্ষেত্রে এ যাবৎ তাঁর পরীক্ষা ও ভবিষ্যৎ শিক্ষা সম্বন্ধে পরীক্ষার ইঙ্গিত ছিল, তথাপি এ নীরস গ্রন্থ সামান্য লোকেরই মনোযোগ

৮ Monroe, *A Brief History of Education.*

৯ Quick, *Essays on Educational Reformers.*

আকর্ষণ করেছিল।* তাই বন্ধুর উপদেশে ১৭৮১ সালে তিনি মনোজ্ঞ গল্পের ছলে নিজ শিক্ষানীতি প্রচার করলেন তাঁর একমাত্র জনপ্রিয় গ্রন্থ 'লিওনার্ড অ্যাণ্ড গারট্রুড্'-এ।

এই বইয়ে পেস্‌তালৎসী একটি কাল্পনিক গ্রাম 'বন্নাল'এর অজ্ঞ ও দুর্নীতি-পরায়ণ অধিবাসীরা গারট্রুড্ নামে একটি সরল অথচ তীক্ষ্ণ সাধারণ-বুদ্ধিসম্পন্না রমণীর শিক্ষার প্রভাবে কি ভাবে পরিবর্তিত হোল, তার মনোজ্ঞ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। গারট্রুড্-এর স্বামী মদ্যপ। স্ত্রীর চেষ্টায় লিওনার্ড-এর চরিত্র সংশোধন হোল। তাদের সন্তানটিকে গারট্রুড্ স্বভাবের বিকাশ অনুযায়ী হাতে-কলমে শিক্ষার সঙ্গে বিদ্যার চর্চায় রত করালেন। কি ভাবে এটা তিনি করলেন, তার বিবরণ থেকে পেস্‌তালৎসীর শিক্ষানীতির পরিচয় আমরা পাই। তাঁর এই শিক্ষার আশ্চর্য সুফল প্রতিবেশীদের আকৃষ্ট করল, এবং তাঁরাও গারট্রুড-এর শিক্ষার দ্বারা প্রভাবান্বিত হলেন। শেষে একজন বুদ্ধিমান্ শিক্ষক এলেন বন্নাল গ্রামে। তিনি গারট্রুড-এর শিক্ষাপ্রণালীর গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁর বিদ্যালয় পরিচালনায় গারট্রুড-এর সাহায্যপ্রার্থী হলেন। ক্রমে ক্রমে এ বিদ্যালয়ের কৃতিত্ব দেশের সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং গারট্রুড-এর শিক্ষানীতি সমস্ত দেশের শিক্ষা-সংস্কারের জন্যে গৃহীত হোল।

প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি যে শুধুই বিত্তশালীদের সন্তানদের জন্যে, এটা পেস্‌তালৎসীকে গভীর বেদনা দিয়েছিল। এমন কি, রুশোও সর্বসাধারণের জন্যে শিক্ষার কথা চিন্তা করেননি। রুশোর মানসপুত্র 'এমিল্' ধনীসন্তান। তার শিক্ষার ব্যবস্থা স্বতন্ত্র, অভিজ্ঞ গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে। কিন্তু পেস্‌তালৎসী গোড়া থেকেই বিশ্বাস করেছেন—সমাজ-সংস্কারের প্রধান উপায় দরিদ্র ও দুঃস্থদের জন্যে, সর্বসাধারণের জন্যে উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা। তিনি প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে দুঃখ করে লিখেছিলেন, "আমার দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে আমার যেটুকু পরিচয় ঘটেছে, তাতে আমার মনে হয়েছে, এ ব্যবস্থা যেন সুবৃহৎ এক অট্টালিকার সর্বোচ্চ প্রকোষ্ঠ, আলোকোজ্জল এবং শিল্পকার্যমণ্ডিত, কিন্তু এ প্রকোষ্ঠে বাসের অধিকার মুষ্টিমেয় কয়জন লোকের মাত্র। মাঝের তলার ঘরে মস্ত ভীড়, কিন্তু

---

* এই বইতেই রুশোর প্রতিধ্বনি করে তিনি লিখেছিলেন, "মানুষের যত সব সদ্‌গুণ তা অনুশীলনের দ্বারাও আয়ত্ত হয় না; অকস্মাৎও আয়ত্ত হয় না; তা প্রকৃতিদত্ত—all the beneficent powers of man are due to neither art nor chance, but to nature. তাই শিক্ষাও প্রকৃতি বা স্বভাবের ধারাকেই অনুসরণ করবে।"

এ তলা থেকে উপরের তলার ঘরে উঠবার কোন ভদ্র এবং আইন-সঙ্গত ব্যবস্থা নেই। যদি কেউ অসঙ্গতভাবে উপরের ঘরে বেয়ে উঠতে চায়, তা হলে তার হাত-পা ভাঙার সম্ভাবনা আছে। নীচের তলায় অগণিত জনসমুদ্রের সমাবেশ, তাদেরও উপরের তলার মানুষদের মত সূর্যের আলো উপভোগ করবার সমান অধিকার আছে; কিন্তু তাদের ফেলে রাখা হয়েছে অন্তহীন অন্ধকারের কূলে এবং উপরের তলার আলো ও ঐশ্বর্যের দিকে তাকাতেও তাদের দেওয়া হয় না।[১০]

নিউহফে শেষ দশ বৎসর পেস্তালৎসীর সমস্ত সময় ও শক্তিই ব্যয়িত হয়, প্রতিকূল আর্থিক অবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর আশ্রমটিকে বাঁচিয়ে রাখবার কাজে। ১৭৯৮ সালে এক রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে পেস্তালৎসী হঠাৎ বাধ্য হলেন স্ট্যাঞ্জ গ্রামে পিতৃমাতৃহীন বহু অনাথ বালক-বালিকার ভার গ্রহণ করতে। সুইৎজারল্যাণ্ড এ সময় ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ন কর্তৃক অধিকৃত হয়, এবং স্ট্যাঞ্জ গ্রামের সমগ্র বয়স্ক জনসাধারণকে হত্যা করা হয়। তাদের অসহায় অনাথ সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার ভার পেস্তালৎসী নেন, এবং স্ট্যাঞ্জ-এর ক্যাথলিক্ কন্‌ভেণ্টে তিনি আশ্রম-বিদ্যালয় খোলেন। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর ভালবাসা ও সহানুভূতি দিয়ে সেই শিশুদের চিত্ত জয় করে নিলেন। তাদের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতির ব্যাপারে নিউহফের মতই তিনি অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

এ বিদ্যালয় পরিচালনের ব্যাপারে তিনি প্রচলিত শিক্ষার দামী উপকরণ ও উপাদান সরকার থেকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। শুধু দাবি করলেন সরকার এ বিদ্যালয় পরিচালনার আর্থিক দায়িত্ব নেবেন এবং তাঁকে স্বাধীনভাবে পরীক্ষা করবার ক্ষমতা দেবেন। এখানে তিনি পূর্বের চেয়েও আরো স্পষ্ট করে বুঝলেন যে, শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বইপত্র, সরঞ্জাম অনেক ক্ষেত্রেই নিষ্প্রয়োজন শুধু নয়, প্রতিবন্ধক। শিক্ষার মূল হবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা,—ইন্দ্রিয়ের সতর্ক ও সোৎসুক ব্যবহার। শিশু হাতের কাজের মধ্যে দিয়েই সত্যিকার শেখে। কথা আর সূত্র আর ব্যাকরণের নিয়ম মুখস্থ করিয়ে যে প্রচলিত শিক্ষা, তাতে শুধু সময়ের অপব্যয় নয়, শিশুর স্বভাবের উপরও নিষ্ঠুর পীড়ন হয়। তিনি এর পরে প্রকাশিত তাঁর আর একটি বইয়ে লিখেছিলেন, "এটা আমার বিশ্বাস যে শিশুর প্রথম চিন্তার বিকাশ কথাসর্বস্ব শিক্ষা-ব্যবস্থা দ্বারা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

১০ Pestalozzi, *Leonard & Gertrude.*

এ শিক্ষা তার সামর্থ্যের উপযোগীও নয় এবং তার জীবনের স্বাভাবিক বিকাশের সঙ্গেও এর সামঞ্জস্য নেই। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে তখনই সাফল্য আসে যখন শিশুকে যা শেখানো হচ্ছে তা তার নিজ অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত হয়। সাধারণতঃ আমি কথা শেখানোর উপর সামান্যই জোর দিয়ে থাকি, যদিও বা সে কথার সঙ্গে যে ভাব থাকে তা শিশুর কাছে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে।[১১] আর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "আমাদের অ-মনোবিজ্ঞান-সম্মত বিদ্যালয়গুলি হচ্ছে প্রকৃতি জীবনে যে শক্তি ও অভিজ্ঞতা নিজে এনে দেয়, মূলতঃ তাকে কৃত্রিমভাবে রুদ্ধ করার যন্ত্র মাত্র।...পুরা পাঁচটি বৎসর ইন্দ্রিয় ব্যবহারের সুস্থ আনন্দ ভোগ করার পর, হঠাৎ তার চতুর্দিকের মুক্ত সুন্দর প্রকৃতিকে তার চোখের সামনে থেকে আমরা ছিনিয়ে নিই; তাদের অবাধ মুক্তির প্রচুর আনন্দের গতি অত্যাচারীর মত জোর করে রোধ করে দিই। ভেড়ার পালকে যেমন করে খোঁয়াড়ে আটকে রাখে, তেমনি করে তাদের দলে দলে আবদ্ধ করে রাখি পূতিগন্ধময় ঘরের মধ্যে; সেখানে নিষ্করুণ ভাবে তাদের শৃঙ্খলিত করে রাখি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অসুন্দর বই আর লেখার বন্ধনে। তাদের বাল্যের সুন্দর স্বাধীন জীবনের তুলনায় নিয়ে আসি যেন এক বিভীষিকাময় পাগলা গারদে।"[১২] কথাগুলো যেন রুশোরই লেখা।

স্ট্যাঞ্জে তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষার পদ্ধতির আরো নানা পরীক্ষা করেন। তিনি দেখলেন এ বিষয়ে সহজতম থেকে সুরু করতে হবে— to reduce all observation to its lowest terms. "শিক্ষা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অগ্রসর হবে—এটা একটা অস্পষ্ট কথা। তার একটি নির্দিষ্ট সহজ ধারা ও প্রণালী আবিষ্কার করা দরকার। তাঁর মনে ছিল এই কথাটি যে, সমগ্র সমাজের উন্নতি করতে হলে শিক্ষার ভার নিতে হবে অল্পশিক্ষিত মাতাদের। এই ভার তাদের হাতে নিরাপদে যাতে তুলে দেওয়া যেতে পারে এমন সরল ও সহজবোধ্য পদ্ধতি আবিষ্কার হোল তাঁর কাজ।"[১৩] এখানেই বর্ণসংযোগ শেখাবার সহজতম পদ্ধতি হিসাবে তিনি 'সিলেবারীজ' (Syllabaries) আবিষ্কার

---

১১ Pestalozzi, *How Gertrude Teaches Her Children.*

১২ ,, ,, ,, ,,

১৩ Rusk, *The Doctrines of Great Educators.*

করেন—যেমন পাঁচটি স্বরবর্ণের উচ্চারণ শেখাবার জন্যে তিনি প্রত্যেক স্বরবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত করে একটি তালিকা তৈরী করলেন—ab, eb, ib, ob, ub ; আবার ac, ec, ic, oc, uc। এই উচ্চারণ ও অনুশীলনের মধ্যে দিয়েই শিশু a, e, i, o, u, এই পাঁচটি বর্ণের উচ্চারণের প্রভেদগুলো প্রত্যক্ষ করবে। অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় শব্দ, ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণও তারা শিখতে অভ্যস্ত হবে।

ধর্ম ও নীতি শিক্ষার ব্যাপারেও তিনি এ কথাটি বুঝতে পারলেন যে, নির্বস্তুক ও নৈর্বক্তিক উপদেশ নিতান্ত অর্থহীন ; শিশুর সত্যিকার জীবনে যে ঘটনা ঘটে, যে সমস্যা আসে তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ভিত্তিতেই, শুধু নীতি ও আচরণের আদর্শের কথা শিশুকে শেখানো চলে।

স্ট্যাঞ্জ-এ হাতের কাজের সঙ্গে লেখাপড়াকে যুক্ত করা সম্বন্ধে তিনি নিউহফের থেকেও আরো বেশী অগ্রসর হন। অবশ্য তিনি তখনও শিক্ষাকে কর্মভিত্তিক করে গড়ে তুলবার কথা স্পষ্টভাবে চিন্তা করেন নি, এবং এ দুইয়ের মধ্যে যে যুক্তিগত নিবিড় সম্বন্ধ (correlation) আছে—তাও তখনও আবিষ্কার করেন নি। তথাপি তাঁর এই নতুন পরীক্ষার সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। তিনি লিখেছেন, "আমি পূর্বের চেয়েও অনেক বেশী নিশ্চিত হয়েছি যে, যখন আমরা লেখাপড়া শেখার বিদ্যালয়ের সঙ্গে হাতের কাজের কারখানা যুক্ত করব এবং ঠিক মনো-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে বিদ্যালয়গুলো পরিচালিত হবে, তখন আমরা এমন একটি পর্যায়ের ছাত্র তৈরী করতে পারব যারা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করবে যে, বর্তমানে শিক্ষার জন্যে যে সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করে আমরা যে ফল লাভ করি, সে ফল পেতে এর এক-দশমাংশ পরিশ্রমেরও প্রয়োজন হয় না।"[১৪]

স্ট্যাঞ্জে থাকবার সময় পেস্তালৎসী তাঁর ভবিষ্যৎ শিক্ষানীতির প্রধান স্থত্রগুলো আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর এ শুভ-সম্ভাবনাপূর্ণ পরীক্ষা কিন্তু অচিরেই বাধাপ্রাপ্ত হোল। এক বৎসর পরেই রাজনৈতিক চক্রের আবর্তনে এই স্ট্যাঞ্জ কনভেণ্টের দালানটি ফরাসী সৈন্যদের হাসপাতালের জন্যে নিয়ে নেওয়া হোল। পেস্তালৎসী বেকার হয়ে পড়লেন। যাই হোক, তাঁর কয়েকজন প্রভাবশালী বন্ধুর চেষ্টায় বার্গডোর্ফ-এ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকের কাজ পেলেন।

---

১৪ Quick, *Essays on Educational Reformers.*

স্ট্যান্স-এ নানা ভুলভ্রান্তি ও পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে তিনি যে সব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন, কোন প্ল্যান্ বা মূলসূত্র ব্যতিরেকেই তা বার্গডোর্ফ-এ এসেও চালিয়ে যেতে লাগলেন। এখানে এসে পড়া, লেখা, অঙ্ক সমস্ত বিষয়েরই সহজতম সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টায় তিনি প্রবৃত্ত হলেন। শুধু তাই নয়। শিশুর মানসিক বিকাশের স্তরগুলো নির্ধারণে অধিকতর মনোযোগী হলেন, এবং মানসিক বিকাশের স্তর অনুযায়ী শিক্ষার বিষয়গুলি বিভাগ করলেন। ভবিষ্যৎকালে হারবার্ট ও মন্তেসরী যে বিশেষ করে তাঁর পরীক্ষার দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি 'সিলেবারীজ-এর আরো বিস্তার ও সূক্ষ্মতর বিভাগ করেন। ভাষাশিক্ষার ভিত্তি করলেন আশেপাশে দ্রব্যাদির সংখ্যা, রূপ, অবস্থান, বর্ণ ও ডিজাইনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে। তিনি তাঁর 'বুক্ ফর মাদার্স'-এ দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়কে ভাষাশিক্ষার ভিত্তি হিসাবে ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। ভাষা শেখাবার জন্যে রঙীন কাঠের আলাদা আলাদা অক্ষর ব্যবহার প্রচলন করলেন। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সরল থেকে ক্রমশঃ জটিলতর বাক্যরচনা করে সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের তা বলিয়ে, ভাষা ব্যবহারের কৌশল তাদের আয়ত্ত করালেন। অঙ্কের জন্যে একটি বোর্ডকে কয়েকটি চৌকো খোপ (squares)-এ ভাগ করে তাতে এক থেকে স্থরু করে একশ' পর্যন্ত বিন্দু বা রেখা এঁকে, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগালেন। এর পর সংখ্যার জ্ঞান আরো পরিপূর্ণ করবার জন্যে পাথরের টুকরো, কড়াইশুঁটি প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যবহার আরম্ভ করলেন। জ্যামিতির মোটা ধারণা দিতেন বিভিন্ন রকমের ছবি (figures) এঁকে। এ সব পরীক্ষা যে ফ্রোএবেল্ ও মন্তেসরীর পদ্ধতির ভিত্তি, তা না বললেও চলে। এখানেই তাঁর মনে স্পষ্ট করে এ কথাটি জাগে যে, শিক্ষার ভিত্তি হবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং তার মূলমন্ত্র (A, B, C) নির্ধারণ নিতান্ত আবশ্যক। তাঁর শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য যে 'মনোবিজ্ঞান-সম্মত' পদ্ধতি আবিষ্কার, "I wish to psychologise education"—এখানেই এ কথাটি তিনি বলেন। এ কথাটি তিনি খুব স্পষ্ট করে বুঝেছিলেন যে, শিশুর মানসিক শক্তি ও সামর্থ্যের সঙ্গে শিক্ষা যদি তাল মিলিয়ে না চলে, তবে শিক্ষা অসার্থক হবে। তিনি আর একটি কথাও বুঝেছিলেন যে, ভাষার ব্যবহার হবে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, এবং বিচ্ছিন্ন ভাষাশিক্ষা, ব্যাকরণ শিক্ষা, প্রাচীন সাহিত্য শিক্ষা নীরস ও নিরর্থক।[১৫]

---

[১৫] Graves, *Great Educators of Three Centuries*, p. 133.

তাঁর পদ্ধতি খুব সুপরিচ্ছন্ন ছিল না, ভুল-ত্রুটিও ছিল তাতে। তবুও বার্গডোর্ফ স্কুলে তাঁর পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষিত ছাত্রেরা প্রথম বার্ষিক পরীক্ষায় এত ভাল ফল করল যে, স্কুল কমিশন উচ্চ প্রশংসা করে তাঁকে এক চিঠি দিলেন। ১৮০১ সালে সরকার তাঁকে নিজস্ব একটি পরীক্ষা-কেন্দ্র পরিচালনার জন্যে টাউনহল্ ব্যবহারের অনুমতি দিলেন এবং কিছু নিয়মিত অর্থসাহায্যেরও ব্যবস্থা করলেন। এখানে অনেক ছাত্র আকৃষ্ট হোল এবং অগ্রসর মতবাদে বিশ্বাসী কয়েকজন যোগ্য শিক্ষকও এসে যোগ দিলেন। এঁদের মধ্যে ক্রুশী, টোব্লার, রাস্, নাইডারার পরে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। পেস্তালৎসীর বিদ্যালয়ের সুনাম চারদিকে বেশ ছড়িয়ে পড়ে এবং দেশ-বিদেশ থেকে বিখ্যাত ব্যক্তি বার্গডোর্ফের শিক্ষা-প্রণালী দেখতে আসতেন। অনেকে তাঁর বিদ্যালয়ের প্রশংসা করেছেন। এতে করে ক্রমে ক্রমে তাঁর এই নতুন শিক্ষাপদ্ধতি দূর দূর দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ বিষয়ে জার্মানীই সর্বাগ্রগণ্য।

এর পর সাড়ে তিন বৎসরকাল পেস্তালৎসী এখানে তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে পরীক্ষা ও চিন্তা নিয়ে মগ্ন হয়ে থাকেন। এ সময় তিনি তাঁর শিক্ষানীতির বিশদ ব্যাখ্যা করে কয়েকখানা বই লেখেন। 'হাউ গারট্রুড্ টিচেস্ হার চিল্ড্রেন' বইয়ে তাঁর শিক্ষার সাধারণ মূলনীতি এবং ভাষা, চিত্রাঙ্কন, হস্তলিপি, পরিমিতি, সংখ্যাজ্ঞান ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ বিষয় কি ভাবে এই সাধারণ সূত্রানুযায়ী এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করে শেখাতে হবে, তার বিবরণ আছে। তিনি আর যে দু'খানা বই পরে লেখেন—'দি এ বি সি অব্ অবজারভেস্যান্' এবং 'দি বুক অব্ মাদার্স'—তাতে তাঁর নতুন শিক্ষাপদ্ধতির বিবরণ আছে, আর ইঙ্গিত আছে শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা সংস্কারের।

'হাউ গারট্রুড্ টিচেস্ হার চিল্ড্রেন্' শিক্ষানীতির দিক দিয়ে খুব মূল্যবান্ গ্রন্থ। কারণ পেস্তালৎসীর পরিণত চিন্তার বিশদ বিবরণ এতে আছে। কিন্তু বইখানা সুপাঠ্য নয়। এতে অনেক বাহুল্য কথা আছে, অনেক পুনরুক্তি আছে। পেস্তালৎসীর জীবনীকার মর্ফ (Morf) এই গ্রন্থ থেকে সযত্নে তাঁর চিন্তাধারার যে সার সংগ্রহ করেছেন তা মূল্যবান্। সেগুলো সংক্ষেপে এই :—

পেস্তালৎসীর চিন্তাধারার মূলকথা

১। সমস্ত শিক্ষাদানের (instruction) ভিত্তি হবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

২। ভাষা এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হবে।

৩। শিক্ষার সময়, এবং বিচার ও সমালোচনার সময়, এক নয়।

৪। প্রত্যেক বিষয়েই শিক্ষা স্থরু করতে হবে সহজতম বিষয় থেকে। তারপর শিশুর মনের ও বুদ্ধির পরিণতির ধারা অনুযায়ী ক্রমশঃ ধারাবাহিকভাবে কঠিনতর বিষয়ে অগ্রসর হতে হবে। এ শিক্ষার স্তরগুলো মনোবিজ্ঞান-সম্মত হতে হবে।

৫। প্রত্যেক নতুন বিষয় আরম্ভ করবার সময়ে যথেষ্ট সময় দিতে হবে, যাতে শিশু নতুন ব্যাপারটা তার মন দিয়ে গ্রহণ করতে পারে, ধরতে পারে ও আয়ত্ত করতে পারে।

৬। শিক্ষার ধারা খামখেয়ালী পুরোনো অপরীক্ষিত তত্ত্বানুযায়ী (dogmatic) না হয়ে, শিশুর মনের বিকাশের ধারা অনুযায়ী হবে।

৭। শিক্ষকের কাছে প্রত্যেক শিশুর ব্যক্তিত্ব পবিত্র ও শ্রদ্ধার বিষয় হতে হবে।

৮। প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুকে কতকগুলো জ্ঞান বা শক্তি পাইয়ে দেওয়া নয়, তার মনের নিজস্ব ক্ষমতাগুলোর বিকাশ ও বর্ধন।

৯। জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে শক্তি। যে জ্ঞান লাভ হোল, তা কি করে কাজে লাগাতে হয়, তা শিখতে হবে।

১০। শাসন-শৃঙ্খলার দিক থেকে ছাত্র ও শিক্ষকের সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত হবে ভালবাসার দ্বারা।

১১। শিক্ষাদান (instruction) এমন হওয়া চাই যাতে সমগ্র শিক্ষা (education) উচ্চতর আদর্শের অনুবর্তী হয়।[১৬]

এই সমগ্র শিক্ষা কি? পেস্তালৎসী তার এই সংজ্ঞা দিয়েছেন—"মানুষের শক্তি ও সামর্থ্যের স্বাভাবিক ক্রমান্বয় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ"—"the natural, progressive, and harmonious development of all the power and capacities of the human being."[১৭]

বার্গডোর্ফের কাজ যখন এমন সফলতার সঙ্গে চলছে, তখন আবার রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন ঘটল। তার ফলে ১৮০৪ সালে স্থইৎজারল্যাণ্ড-এর সেই ক্যাণ্টন্-এর সরকার যেখানে তাঁর বিদ্যালয় ছিল সেই টাউনহলটি ফেরত চাইলেন। পেস্তালৎসী মুশকিলে পড়লেন। কাছাকাছি 'হফ্ উইল'-এ ফেলেন-বার্গ (১৭৭১-

১৬ Quick, *Essays on Educational Reformers.*

১৭ Graves, *Great Educators of Three Centuries,* p. 145.

১৮৪৫) নামে একজন শিক্ষক পেস্তালৎসীর নীতি অনুসরণ করেই বেশ বড় একটি কৃষিবিদ্যালয় সুনামের সঙ্গে চালাচ্ছিলেন। পেস্তালৎসী তাঁর সঙ্গে একত্র হয়ে বিদ্যালয়টি চালাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু এ দু'জনের মনের গড়ন ছিল ভিন্ন রকমের। তাই এই মিলনের চেষ্টা সফল হোল না। ১৮০৫ সালে পেস্তালৎসী তাঁর বিদ্যালয়টি ইভারডুন (Yverdun)-এ সরিয়ে নিয়ে গেলেন। এখানে তাঁর জীবনের শেষ কুড়ি বছরের পরীক্ষা অনন্যমনা হয়ে চালাবার সুযোগ তিনি পেলেন।

এখানে তিনি তাঁর পূর্বের শিক্ষানীতির আরো বিস্তারসাধন করলেন, আরো সরল, আরো সহজ পদ্ধতি আবিষ্কারের চেষ্টা করতে লাগলেন। পূর্বের ন্যায় এখানেও শিক্ষার মূলনীতি হোল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভাষার ব্যবহার। শিশুরা যাতে সঠিকভাবে প্রত্যক্ষ করতে এবং তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ ও ব্যবহার করতে শেখে, বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সম্বন্ধ বিচার করে, যাতে তারা বিষয়ের নির্ভুল ধারণা করতে পারে, সে জন্যে নানা চেষ্টা তিনি করতে লাগলেন। 'সিলেবারীজ'-এর মধ্য দিয়ে উচ্চারণ-জ্ঞান ও অক্ষর-পরিচয়, 'টেবল্ অব্ ইউনিট্স্'-এর মধ্যে দিয়ে সংখ্যার জ্ঞান ইত্যাদি আরো সরলতর পদ্ধতিতে কি করে দেওয়া যায়, তাই তিনি উদ্ভাবন করতে চেষ্টিত হলেন। এবার সরল ভগ্নাংশ শিক্ষা দেবার জন্যে একটি চৌকোকে সমান ক'টি ভাগ করে 'টেবল্ অব্ ফ্র্যাক্‌সন্‌স্' তৈরী করলেন। তারপর জটিল ভগ্নাংশ শিক্ষার জন্যে তৈরী করলেন 'টেবল্ অব্ ফ্র্যাক্‌সন্‌স্ অব্ ফ্র্যাক্‌সন্‌স্'। এই সংখ্যা শিক্ষণবিষয়ে পেস্তালৎসীর ছাত্রদের মধ্যে ক্রুশী ও তারপরে স্মিড্ অনেক মৌলিক আবিষ্কার করেন। ফ্রোএবেল ও মন্তেসরীর বিভিন্ন কাঠ ও কার্ডবোর্ডের উপকরণ পেস্তালৎসীর আবিষ্কারেরই ফল। হস্তলিপি, অঙ্কন প্রভৃতির জন্যেও পেস্তালৎসীর ছাত্র রাস্ আবিষ্কার করলেন 'অ্যাল্‌ফাবেট্ অব্ ফর্ম্'। বিভিন্ন সহজ জিনিসের সোজা, বাঁকা ইত্যাদি নানা অবস্থানের সঙ্গে শিশুর প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটলে অঙ্কন ব্যাপারটা তাদের কাছে আকর্ষণীয় ও সহজ হয়। সঙ্গীত সম্বন্ধেও পেস্তালৎসীর বন্ধু ন্যাগেলী স্বরের সহজতম এবং সুন্দরতম সমাবেশ করে মনোবিজ্ঞানের ধারা অনুসরণ দ্বারা শিশুর স্বরজ্ঞানের বিকাশ কি করে হতে পারে তা আবিষ্কার করেন। নীতিজ্ঞান এবং ধর্মজ্ঞানও পিতামাতা, বন্ধু, প্রতিবেশী প্রভৃতির প্রতি বাস্তব আচরণের মধ্যে দিয়েই বিকাশের চেষ্টা করা হয়। অন্যেরও যে অধিকার আছে, অন্যের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষারও

যে দাম আছে—এ শিক্ষার বিকাশও শুধু একত্রে বিদ্যালয়ের নানা কর্মের মধ্যে পরস্পরের সহযোগিতার দ্বারাই সম্ভবপর বলে বিবেচনা করা হয়।

এ সময় পেস্‌তালৎসীর শিক্ষানীতি সম্বন্ধে অনেক বই, পুস্তিকা ইত্যাদি রচিত হয়। হারবার্ট ও ফ্রোএবেল দু'জনেই কিছুদিন পেস্‌তালৎসীর সান্নিধ্যে এসে তাঁর শিক্ষানীতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। দু'জনেই পেস্‌তালৎসীর শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। হারবার্টের প্রথম বই পেস্‌তালৎসীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষা সম্বন্ধে। দু'জনেই পেস্‌তালৎসীর মহৎ ব্যক্তিত্বের প্রভাব অনুভব করেছিলেন। হারবার্ট পেস্‌তালৎসীর শিক্ষা-প্রণালীর উন্নতির কথা, এবং এর ত্রুটিগুলো দূর করার কথাই বেশী চিন্তা করেছেন। ফ্রোএবেল্ পেস্‌তালৎসীর কঠোরতর সমালোচনা করলেও আদর্শগতভাবে পেস্‌তালৎসীর ঘনিষ্ঠতর অনুগামী।*

ইভারডুন-এর বিদ্যালয়ের বহু বিস্তৃত যশ সত্ত্বেও তার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা এর বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ হোল। পেস্‌তালৎসী বৃদ্ধ হয়েছিলেন। এ সময় তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যু তাঁকে দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে যেন পঙ্গু করে দিয়ে গেল। তিনি কোন কালেই ভাল পরিচালক ছিলেন না। তা ছাড়া বৃদ্ধবয়সে তিনি তাঁর ছাত্র স্মিড্-এর উপর অতিমাত্রায় নির্ভর করতেন। স্মিড্ কিন্তু অহংকারী ও কলহপরায়ণ ছিলেন। ফলে অনেক পুরোনো শিক্ষকেরা একে একে প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে গেলেন। ছাত্রসংখ্যাও অতিরিক্ত ছিল। বাইরের থেকে অনেকে এ বিদ্যালয় দেখতে আসতেন, তাতেও অনেক ক্ষতি হত। যাই হোক, কুড়ি বৎসর নানা সফল ও সম্ভাবনাপূর্ণ পরীক্ষার কেন্দ্র, পেল্‌তালৎসীর পরিণত জীবনের সাধনার ক্ষেত্র ইভারডুন বিদ্যালয়ের দ্বার ১৮২৫ সালে রুদ্ধ হয়ে গেল। দু'বছর পর ১৮২৭ সালে পেস্‌তালৎসীর মৃত্যু হোল।

পেস্‌তালৎসী ও রুশো

পেস্‌তালৎসী রুশোর মতই বিশ্বাস করেছিলেন যে শিক্ষা হচ্ছে শিশুর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার স্বাভাবিক ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। শিক্ষা বাইরে থেকে

* রবার্ট ওয়েনও স্কটল্যাণ্ডে নিউল্যানার্ক মিল্-এ আদর্শ শিশুবিদ্যালয় স্থাপন (১৮১৬ খ্রীঃ) করার আগে ইভারডুন-এর বিদ্যালয় দেখতে গিয়েছিলেন। তিনিও কিছুটা নিরাশ হয়েছিলেন। সেখানে শিক্ষার ব্যাপারে মুখস্থের উপর জোর দেওয়াটা তিনি অপছন্দ করেছেন।

চাপানো জিনিস নয়, তার সম্ভাবনা থাকে শিশুরই স্বভাবে। তিনি লিখেছিলেন—"আমার কাছে সুশিক্ষার প্রতীক হচ্ছে সরস জলধারার কাছে রোপিত শিশুবৃক্ষ। ক্ষুদ্র একটি বীজ ভূমিতে বপন করা হয়। তারই মধ্যে থাকে পরিণত বৃক্ষের রূপ, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্য। ধীরে ধীরে এ বীজ অঙ্কুরিত হয়; কাণ্ড, শাখা, পত্র, ফল-ফুলে তা বিস্তার লাভ করে। বৃক্ষের সমস্ত অংশের ধীর ও বাধাহীন পুষ্টি ও পরিণতি একটি অবিচ্ছেদ্য ধারা। সমগ্রের সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ও পরিণতির ছন্দটি ছিল ওই ক্ষুদ্র বীজে, তার শিকড়ের মধ্যে। মানুষও এই গাছেরই মত। সদ্যোজাত শিশুর মধ্যেই সুপ্ত আছে সেই সমস্ত শক্তি ও সম্ভাবনা যা ভবিষ্যৎ জীবনে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। ব্যক্তি ও তার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়াদি ক্রমশঃ সমগ্র একতায় গড়ে ওঠে, এবং তাদের পরিপূর্ণ বিকাশ হয় ভগবানের প্রতিচ্ছায়ায়।"[১৮]

কিন্তু স্বভাববাদে বিশ্বাসী হলেও পেস্তালৎসী আদিম প্রবৃত্তির শাসন ও নিয়ন্ত্রণের কথা মানেন। তিনি জানেন যে শিক্ষকের কাজ শিশুকে উচ্ছৃঙ্খল উদ্দামতার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া নয়—শিশুর স্ব-ভাবের ধারার নিয়ন্ত্রণ।[১৯] এ বিষয়ে উগ্র পরিবেশবাদীরা অবশ্য রুশোর একেবারে উল্টো কথা বলতে চাইবেন। তাঁরা বলবেন স্ব-ভাব কিছু নয়, শিক্ষার ক্ষেত্রে সুনিয়ন্ত্রণই সব। এটাও অবশ্য অতিভাষণ। বর্তমান কালে রাশিয়ান্ শিক্ষাবিদেরা এবং আমেরিকার ডিউইও, রুশোর মতের চেয়ে পেস্তালৎসীর মতেরই বেশী সমর্থক। বর্তমান কালে শিক্ষার আদর্শ শুধু ব্যক্তির বিকাশ নয়, সমাজ-পরিবেশের অঙ্গ হিসাবে ব্যক্তির বিকাশ। এ হিসাবে রুশো ও পেস্তালৎসীর আদর্শ কিছুটা অসম্পূর্ণ।

পেস্তালৎসীর অবদান

বর্তমান যুগের পক্ষে পেস্তালৎসীর সর্বশ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে তিনি শিক্ষাকে পরীক্ষা-ভিত্তিক করবার পথ দেখিয়ে গেছেন। প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির জঞ্জাল বিদূরণের কাজে রুশোর মত তাঁরও কৃতিত্ব আছে। তবে এক হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব বেশী। রুশো ভেঙ্গেছেন। তিনি গড়ার পথ দেখিয়েছেন। শিক্ষা কি, তার উদ্দেশ্য কি, তার উপায় কি, আর বিদ্যালয়ে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক কি হওয়া উচিত—এসব

---

১৮. Pestalozzi, *The Evening Hour of a Hermit.*

১৯ Monroe, *A Brief History of Education.*

বিষয়ে স্পষ্ট আধুনিক মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গী আমরা পেস্‌তালৎসীর কাছ থেকেই প্রথম পাই।

রুশো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা শিক্ষার যে পদ্ধতি প্রচলন করে যান, তিনি তার আরো উন্নতি করেন, এবং কার্যকরীভাবে এ পদ্ধতি কি করে ব্যবহার করা যায়, তারও পথ দেখিয়ে যান।

তাঁর ত্রুটি অনেক ছিল, অনেক ভুলও তিনি করেছেন। তিনি নিজেও এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তিনি স্বীকার করেছেন, অনেক সময় আবেগ দ্বারা তিনি চালিত হয়েছেন, বুদ্ধির দিকে হয়তো তাঁর ত্রুটি ঘটেছে। তিনি সাধারণ সূত্র স্পষ্ট করে বুঝলেও তার সঠিক ব্যবহারটি করতে পারতেন না। তিনি মুখস্থ করা অপছন্দ করতেন। অথচ তাঁর প্রণালীতে মুখস্থ করা অনেকটা স্থান জুড়ে আছে। তা ছাড়া তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তাঁর বন্ধু বা ছাত্রদের অনেক আবিষ্কার ও প্রণালীও তাঁর নামেই প্রচলিত হয়েছে। এটা এ সাধু মানুষটি জানতেন। তাই তিনি লিখেছিলেন, "তোমরা আজ যা তোমাদের সামনে দেখতে পাচ্ছ, তা সব আমারই সৃষ্টি, এ দাবী আমি করি না। নাইডারার, ক্রুশী বা স্মিডের শিক্ষক হিসাবে নিজেকে যদি আমি দাবী করি তবে নিশ্চয়ই তারা হাসবে। আমি ভাল হিসাব জানি না, ভাল লিখতে জানি না। আমি ব্যাকরণ, অঙ্ক বা অন্য সম্বন্ধে কিছুই জানি না। আমার যে নিতান্ত মূর্খ ছাত্র তারাও এসব বিষয়ে আমার চেয়ে বেশী জানে। আমি এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম কাজটি সুরু করে দি এবং তারপর আমার মত ও পদ্ধতিগুলো যাতে কাজে লাগানো হয় সে জন্যে অন্যের উপর নির্ভর করি।"[২০]

তিনি কেবলই পরীক্ষা করেছেন, পরিবর্তন করেছেন ; পরিপূর্ণ সত্যকে লাভ করেছেন এমন দাবি করেন নি। তাঁর কাজের মধ্যে সব সময় শৃঙ্খলা ছিল না, সামঞ্জস্য ছিল না, তা বাহুল্যপূর্ণ ও পুনরুক্তি দোষদুষ্ট ছিল। এ ঈশ্বরভক্ত ও মানবভক্ত মানুষটি তাই জীবনের শেষে বিনয়ের সঙ্গেই বলে গেছেন, "দরিদ্র, দুর্বল, অজ্ঞাত, অযোগ্য, অসমর্থ, মূর্খ আমি, তথাপি এ কাজে হাত দিয়েছিলাম। সারা পৃথিবীর মানুষেরা বললে, এ এক পাগলামি, কিন্তু ভগবানের মঙ্গলহস্ত ছিল আমার পশ্চাতে। আমার কাজ সফল হোল। অনেক বন্ধু লাভ করলুম, যাঁরা আমাকে এবং আমার কাজকে ভালবাসলেন। আমি কি করেছি তা আমি জানি

[২০] Monroe, *A Brief History of Education.*

না। আমি কি চেয়েছিলুম তাও বুঝি জানতুম না। তবুও আমার কাজ সফল হোল।"

কেন ? তার কারণ পেস্তালুৎসীর মানবপ্রেম, তাঁর ঐকান্তিক একাগ্র সাধনা। তিনি নিজের জন্যে কিছু চাননি—চেয়েছিলেন সমাজের উন্নতি, মানুষের উন্নতি। নিউহফ্ তাঁর প্রথম আশ্রম বিদ্যালয়ের পিছনে তার স্মৃতি-রক্ষার্থ এ ক'টি কথা প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ আছে,—"সত্যিকার মানুষ, খ্রীষ্টপ্রেমী, আদর্শ নাগরিক, যা কিছু করেছেন তা সবই পরের জন্যে,—নিজের জন্যে কিছুই করেননি। তাঁর নামের উপর ভগবানের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক"—"Man, Christian, Citizen, Everything for others, nothing for self. Blessings on his name."[২১]

শিক্ষাবিদ্ যোহন ফ্রেড্রিক্ হারবার্ট

(১৭৭৬-১৮৪১)

রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস মসৃণ গতিতে বয়ে চলে না,—তাতে উত্থান-পতন আছে —প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক টয়েন্‌বি ইতিহাসের ধারাকে দুটি কথায় সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন—'Rally and rout'. শক্তিসমাবেশ ও পশ্চাদপসরণ। কোন জাতির জীবনে উন্নতির ধারা অবিচ্ছিন্ন নয়। অগ্রগমন ও পশ্চাদপসরণের সর্পিল গতিতে ইতিহাস চিহ্নিত। কাণ্ট্ বা হেগেলের মত আদর্শবাদী দার্শনিকেরা (idealist philosophers) এই ইতিহাসের গতির মধ্যে সৃষ্টির মূলাধার চেতন-শক্তির (Absolute Idea) ক্রমবিকাশই লক্ষ্য করেন। শিক্ষার ইতিহাস সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। এখানেও শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতি একটানা উন্নতির পথে অগ্রসর হয়ে চলেনি। নতুন আদর্শ বহু বাধা অতিক্রম করে আত্মপ্রকাশ করেছে, আবার এসেছে বিপরীত মতের সংঘর্ষ। শেষে আবার দেখা দিয়েছে নতুন ও সম্পূর্ণতর সমন্বয়, হেগেলের ভাষায় "থিসিস্—অ্যান্টিথিসিস্—সিন্থেসিস্"। এই হচ্ছে চেতনা ও সদ্‌বস্তুর বিকাশের সূত্র।

রুশো (১৭১২-১৭৭৮) থেকে য়ুরোপে শিক্ষাদর্শের ধারা আমরা অনুসরণ করেছি। মধ্যযুগের জীর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নির্মম আঘাতে সচকিত করে রুশো

[২১] Graves, *Great Educators of Three Centuries*, p. 144.

প্রচার করলেন শিশুর দাবি; বললেন, শিশুর শক্তি, তার রুচি, তার মানসিক বিকাশের ধারাকে অনুসরণ করবে শিক্ষকের শিক্ষারীতি। এ অসম্ভব সাহসের কথা তুলল প্রতিবাদের ঝড়। কিন্তু একটা প্রকাণ্ড সুফল ফলল এতে। চিন্তাশীল শিক্ষাবিদ্ মাত্রেই বাধ্য হলেন প্রাচীন শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষারীতির মূল্য নতুন করে খতিয়ে দেখতে। নতুন চিন্তার জোয়ার এল বদ্ধ প্রবাহহীন জলাশয়ে। নতুন পরীক্ষার সাহস জাগল শিক্ষকের মনে। অনেক ভুলভ্রান্তি হোল, কখনো ঘটল একদেশদর্শী অতিভাষণ, কখনো ঘটল প্রাচীন প্রথার অসহিষ্ণু বর্জন, কিন্তু সজীব চিন্তা ও সফল পরীক্ষা মোটের উপর একটা ক্রমোন্নতির পথেই এগিয়ে নিয়ে চলেছে শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষারীতিকে। উন্নতির ধারা অবিচ্ছিন্ন নয়, তবুও শিক্ষাব্রতী আশা করছেন, বিশ্বাস করছেন—এ ধারা অগ্রগমনের—ক্রমোন্নতির।

রুশোর বৈপ্লবিক শিক্ষাদর্শদ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবান্বিত হলেন পেস্তালৎসী (১৭৪৬-১৮২৭)। রুশো বলেছিলেন, কৃত্রিমতার বন্ধন থেকে শিক্ষাকে মুক্তি দিতে হবে—শিক্ষা হবে স্বভাব-অনুযায়ী (Naturalism)। পেস্তালৎসীর কাজ তাই হোল শিশুর 'স্বভাব'টিকে জানা—তার বিকাশের স্তরগুলো আবিষ্কার ও এই মনোবিজ্ঞান-সম্মত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নতুন শিক্ষারীতি গঠন। তাই তাঁকে দেওয়া হয় মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রথম শিক্ষাকে দাঁড় করাবার(psychologising education) সম্মান। তিনি ছিলেন শিশু-দরদী—শিক্ষা-সংস্কারক। কিন্তু তাঁর মনস্তত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান যথেষ্ট ছিল না এবং শিক্ষার একটি সম্পূর্ণ দর্শন প্রণয়ন করার মত স্পষ্ট চিন্তারও অভাব ছিল। "পেস্তালৎসী শিক্ষাকে সর্বজনগম্য করবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে য়ুরোপকে সচেতন করেছিলেন এবং প্রচলিত প্রাণহীন শিক্ষাব্যবস্থাকে সঞ্জীবিত করে তুলেছিলেন। কিন্তু সংস্কারের যে শক্তিকে তিনি গতি দিলেন তার সুষ্ঠু পরিচালনার শক্তি ছিল না তাঁর অস্পষ্ট ও অসমন্বয়িত চিন্তা ও প্রকাশের মধ্যে। শিক্ষাকার্যকে মনস্তত্ত্বভিত্তিক করতে হবে, তাই শিশুর শিক্ষা সুরু হবে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান (sense perception) থেকে—এটা তিনি অনুভব করেছিলেন। কিন্তু প্রচলিত মনস্তত্ত্বকে নতুন করে গঠন করবার সময় তাঁর ছিল না, সে উপযুক্ত শিক্ষারও তাঁর অভাব ছিল। প্রত্যক্ষ জ্ঞানলব্ধ উপাদান বিশ্লেষণ করে কিভাবে একটা সুষ্ঠু সমন্বয়ে পৌছানো যাবে, এবং একটা জীবন্ত অভিজ্ঞতা পরিপাকের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করতে হবে—সে প্রশ্নের সমাধান করবার মত পাণ্ডিত্য তাঁর ছিল না। অন্যপক্ষে হারবার্ট এমন একটি নতুন সম্পূর্ণ

মনস্তত্ত্ব গঠন করলেন যা প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তিনি দেখালেন প্রত্যক্ষজ্ঞানকে সমগ্র অন্বয়ীকরণের (Apperception) পন্থায় কিভাবে শিক্ষা গ্রহণের কেন্দ্রে (assimilation) পরিণত করা যেতে পারে। তিনি আরও দেখালেন শিক্ষার সমস্ত উপাদান ও পদ্ধতি উপযুক্ত শিক্ষাপদ্ধতির দ্বারা কি করে ছাত্রের সম্পূর্ণ নৈতিক বিকাশরূপ বৃহৎ আদর্শের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা চলে।"[১]

এখানেই হারবার্টের কৃতিত্ব। তিনি দিলেন শিক্ষার একটি সম্পূর্ণ দার্শনিক ভিত্তি (a complete philosophy of education)। তা ছাড়া তিনি পেস্তালৎসীর অসংলগ্ন ও অসমন্বয়িত মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিকে নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক রূপ দিলেন : শিক্ষাপদ্ধতির প্রত্যেকটি স্তরকে মানসিক বিকাশের ছন্দের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে সুচিহ্নিত করে দিলেন। "সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, হারবার্ট ও পেস্তালৎসীর কাজ হচ্ছে বিপরীত। হারবার্টের পদ্ধতি হচ্ছে যুক্তিভিত্তিক ও দার্শনিক ; পেস্তালৎসীর প্রণালীতে যুক্তিগত ও সুশৃঙ্খল বিকাশের অভাব এবং এর পশ্চাতে কোন স্পষ্ট দার্শনিক ভিত্তি নেই। একজনের (হারবার্ট) আছে দার্শনিকের ব্যাপক দৃষ্টি ও শান্ত যুক্তিবাদ ; আর একজনের আছে সংস্কারকের তীব্র ভাবালুতা ও নিকট ভবিষ্যতে ফললাভের আকাঙ্ক্ষায় উদ্দেশ্য ও ইচ্ছার উদ্দাম সংকল্প—কিন্তু দূর অন্তিম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত অস্পষ্ট ধারণা।"[২]

হারবার্টের জন্ম সুশিক্ষিত ভদ্র পরিবারে। তাঁর পিতামহ ছিলেন জার্মানীর অন্তর্গত ওল্ডেনবুর্গের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (gymnasium) রেক্টর। তাঁর পিতা ছিলেন উকিল ও প্রিভিকাউন্সিলর। তাঁর মাতা ছিলেন বিদুষী মহিলা। তিনি হারবার্টকে গ্রীকভাষা ও অঙ্ক শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তাঁর শিক্ষাবিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন। যৌবনেই হারবার্টের "বিভিন্ন বিষয়ে সুসমঞ্জস আগ্রহের" (many-sided and balanced interest) পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। পরবর্তী কালে এই বহুমুখী ও সুসংবদ্ধ আগ্রহসৃষ্টিকে হারবার্ট শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা করেছেন। জেনা বিদ্যালয়ে পাঠকালীন তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ফিক্‌টে ও শেলিং-এর সংস্পর্শে আসেন ও তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হন। কিন্তু তাঁর যুক্তিবাদী দৃষ্টি এঁদের দর্শনকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারেনি এবং সেই যৌবন বয়সেই নিজস্ব চিন্তাধারা বিকাশে তিনি ব্রতী হন।

১ Graves, *Great Educators of Three Centuries*, p. 184.

২ Monroe, *A Brief Course in the History of Education*, p. 320.

বি.এ. পাস করবার কিছুদিন পূর্বেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে সুইৎজারল্যাণ্ড এর অন্তর্গত ইণ্টারলেকেন্-এর শাসনকর্তা (Governor) হের্ ফন্ স্টাইগার্-রেগিস্বার্গ-এর তিনটি ছেলের শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন। এই দু'বছরই (১৭৯৭-১৭৯৯) তিনি সত্যিকার শিক্ষকতার কাজ 'হাতে কলমে' শেখেন। তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতি কেমন, কিভাবে তাঁর শিক্ষানীতি শিক্ষকতার কাজে ব্যবহার কচ্ছেন, তাঁর ছাত্রদের উন্নতি-অবনতি কতটা হোল, প্রতি দু'মাস অন্তর তার বিস্তারিত বিবরণ স্টাইগার্-রেগিস্বার্গকে লিখে পাঠাতে হত। এটা হারবার্টের খুব কাজে লেগেছিল, কারণ এতে তাঁর শিক্ষাবিষয়ক চিন্তাগুলোকে সুশৃঙ্খল ও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে হারবার্ট বাধ্য হয়েছিলেন। এ বিবরণ থেকেই দেখা যায় যে গোড়াতেই তাঁর এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছিল যে, শিক্ষা হবে মনস্তত্ত্বভিত্তিক। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ছাত্রদের শক্তি, রুচি, প্রয়োজন ও ব্যক্তিত্বের বিচারও যে নিতান্ত প্রয়োজন—এটাও তিনি জেনেছিলেন। সুইৎজারল্যাণ্ডে থাকতেই তিনি শিক্ষা-সংস্কারক, দরদী ও উৎসাহী পেস্তালৎসীর সঙ্গে পরিচিত হন এবং পেস্তালৎসীর শিক্ষাপ্রণালী তাঁকে আকৃষ্ট করে। ১৭৯৯ সালে তিনি পেস্তালৎসীর বার্গডর্ফের বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। পরের দু'বছর ব্রিমেনে তাঁর অসম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে তিনি ডিগ্রীলাভ করেন। এ সময়ই তিনি পেস্তালৎসীর শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কারে ব্রতী হন। পেস্তালসৎসীর শিক্ষানীতির অস্পষ্টতা ও উদ্দেশ্যহীনতা সম্বন্ধে তিনি সচেতন হন এবং শিক্ষার একটি সম্পূর্ণ দার্শনিক ভিত্তি স্থাপন ও শিক্ষার স্তরগুলো শিশুর মানসিক বিকাশের অনুগামী করে আরো অধিকতর মনস্তত্ত্বসম্মত করার প্রয়োজনীয়তার কথা অনুভব করেন। ১৮০২ থেকে ১৮০৯ সাল পর্যন্ত গোটিংজেন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিষয়ে (pedagogies) অধ্যাপক হিসাবে বক্তৃতা দেন। এ সময়ই শিক্ষার দর্শন ও প্রণালী বিষয়ে তাঁর চূড়ান্ত ধারণা তিনি লিপিবদ্ধ করেন দুটি বইয়ে। শিক্ষার আদর্শ যে ছাত্রের সম্পূর্ণ নৈতিক বিকাশ—একথাও অত্যন্ত স্পষ্ট করে তিনি প্রকাশ করেন।

১৮০৮ সালে হারবার্ট কোনিগ্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এ আসন কয়েক বৎসর পূর্বে বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক ইম্যানুয়েল্ ক্যাণ্ট্ অলংকৃত করেছিলেন। শিক্ষা-বিষয়ক পরীক্ষাকার্যের জন্যে তিনি একটি শিক্ষণ-বিদ্যালয় (pedagogical seminar) স্থাপন করেন। সেখানে বহু

অনুরাগী ছাত্র হারবার্টের মনস্তত্ত্ব ও দর্শন অনুযায়ী শিক্ষণ-প্রণালীর নানা পরীক্ষায় রত হয়। হারবার্ট নিজেও শিক্ষানীতি ও মনস্তত্ত্ব নিয়ে অনেক লেখা প্রচার করেন, কিন্তু প্রাসিয়ার প্রাচীনপন্থী শাসকেরা হারবার্টের অগ্রসর শিক্ষাদর্শনকে খুব প্রীতির চক্ষে দেখছিলেন না। ফলে প্রায় পঁচিশ বৎসর কোনিগ্স্বার্গে কাজ করার পর, তিনি তাঁর প্রাচীন কর্মস্থল গোটিন্‌জেন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের কাজ পুনর্গ্রহণ করেন। জীবনের বাকী আট বৎসর তাঁর এখানেই কাটে। এখানে প্রচুর সম্মান ও সাফল্যের সঙ্গে স্বীয় শিক্ষানীতি তিনি প্রচার করেন। তাঁর পরিণত চিন্তার শেষ নিদর্শন রেখে যান তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ দুটি গ্রন্থে। যশের সমুচ্চ চূড়ায় অবস্থিত অবস্থায়, ৬৫ বৎসর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়।

হারবার্ট দার্শনিক। তাই গোড়াতেই তিনি এই প্রশ্নটি তুললেন—শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ কি? এ সম্বন্ধে তাঁর ধারণায় কোন অস্পষ্টতা নেই। তাঁর 'এস্‌থেটিক্ প্রেজেণ্টেশন্-এর প্রথম ছত্রটি হচ্ছে "শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য—শিক্ষার সমগ্র উদ্দেশ্য—একটিমাত্র কথায় ব্যক্ত করা যায়। সে কথাটি হচ্ছে নীতিজ্ঞান (morality)।"[৩] আর এক জায়গায় বলছেন, 'নীতিধর্ম' (virtue)—এই একটি কথাতেই শিক্ষার সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে।"[৪] আবার বলেছেন, "শিক্ষার শেষ উদ্দেশ্য 'নীতিধর্ম'—এই কথার মধ্যেই নিহিত।"[৫]

এই নীতিধর্ম কি—এ কথাটিও তিনি অস্পষ্ট রাখেন নি। ক্যাণ্ট নীতিধর্মকে বলেছেন, 'অ-সাপেক্ষ আজ্ঞা' (categorical imperative)। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে যৌক্তিকতা (rationality)। মানুষের এই যৌক্তিকতা তাকে শুভকর্ম পথে চালিত করে, কোন লাভ বা ফলাকাঙ্ক্ষার বশীভূত না হয়ে। মানুষের অন্তরের নীতিবোধ বলে, "এ কাজ যুক্তিযুক্ত বলেই শুভ, তাই এ কাজ করতে হবে।" মানুষের অন্তরের নীতিবোধের (goodwill) এ অমোঘ আদেশ (imperative) তাকে প্রলোভন দেখায় না, ভয় দেখায় না। সে শুধু বলে—শুভকর্ম তোমার স্ব-ভাবজাত, শুভকর্ম তোমার প্রকৃত স্বারাজ্য (self-determination)।[৬] হারবার্টের সঙ্গে ক্যাণ্টের নীতিধর্ম সম্পর্কে মতের কিছু অমিল আছে,

---

৩ Herbart's *A B C of Sence Perception and Minor Pedagogical Works*, p. 92.

৪ *Umriss*, p. 3.

৫ *Umriss*, p. 62.

৬ Mckenzie, *A Manual of Ethics*, p. 190.

কারণ হারবার্ট ক্যাণ্টের মত আত্মাকে (self or soul) সক্রিয় শক্তি বলে স্বীকার করেন না। কিন্তু তবু তাঁদের মতে মিলও আছে। হারবার্টও মানেন যে, মানুষের নীতিজ্ঞান অভিজ্ঞতাপ্রসূত (empirical) নয়, এটা মানুষের অন্তরের সম্পদ। দু'জনেই মানেন যে, নীতিজ্ঞানের দ্বারা যখন মানুষ চালিত হয় তখনই সে মুক্ত (free), তখনই সে আত্ম-চলিত (self-determined)। হারবার্টের মতে নীতিজ্ঞান হচ্ছে অন্তর্নিহিত আত্মকর্তৃত্বের বোধ, যা ব্যক্তির মধ্যে একটি স্থায়ী বাস্তব সত্যে বিকাশলাভ করে—the idea of inner freedom which has developed into an abiding actuality in an individual. হারবার্টের মতে নীতিবোধ অন্তরের নিজস্ব সম্পদ হলেও তার বিকাশ আছে। এর মূলটি অভিজ্ঞতালব্ধ না হলেও তার বিকাশ অভিজ্ঞতার বহুল সঞ্চয় (cumulative) এবং অভিজ্ঞতার সুশৃঙ্খল বিন্যাসের (organisation) উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তির মধ্যে এই নীতিবোধকে জীবন্ত স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত করার কৌশলের নামই হচ্ছে সুশিক্ষা। এখানেই শিক্ষকের কৃতিত্ব ও দায়িত্ব। শিশুর সমস্ত অভিজ্ঞতাকে এমনি করে একটি স্থায়ী কেন্দ্রদ্বারা নিয়ন্ত্রণ ও আদর্শানুসারী করে গড়ে তোলার বিদ্যার নামই হচ্ছে শিক্ষা-বিজ্ঞান। শিশুর মধ্যে গড়ে তুলতে হবে সেই সার্থক সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গী যাতে স্বভাবতঃই সে আকৃষ্ট হয় সত্যের প্রতি, আর ঘৃণা করতে শেখে অসত্য ও অসুন্দরকে। এই দিক থেকে তিনি সৌন্দর্য-বিজ্ঞানকে (aesthetics) নীতিবিজ্ঞানের উপরে স্থান দিয়েছেন।[৭] এখানে কাণ্টের থেকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক। কাণ্টের মতে ইচ্ছাশক্তি আত্মার নিজস্ব অন্তর্নিহিত শক্তি। অ্যারিষ্টট্‌ল্ বলেছিলেন এটা আত্মার একটা পৃথক্ শক্তি বা ফ্যাকাল্‌টি। হারবার্ট এই দুই মতের একটিও গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতে—চিন্তা, ধারণা, ভাবনাই ইচ্ছাকে প্রবৃত্ত করে,—'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী', 'ইচ্ছা হচ্ছে অভিজ্ঞতার ফল' কিন্তু সাধারণতঃ মনে করা হয়ে থাকে যে ইচ্ছাই কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইচ্ছা সম্বন্ধে হারবার্টের এ মত না বুঝলে তাঁর শিক্ষানীতি বোঝা যায় না।[৮] শিক্ষাদ্বারা যার ধারণা সম্পূর্ণ সুসঙ্গত হয়নি সে নীতিজ্ঞানের অধিকারী নয়। গ্রীক পণ্ডিত সক্রেটিসের কথার প্রতিধ্বনি করে তিনি বললেন, "মূর্খ মানুষ নীতিজ্ঞানসম্পন্ন হতে পারে না।" ধারণা থেকেই আবেগের উদ্ভব

৭ Rusk, *Doctrines of Great Educators*, p. 207.

৮ Monroe, *A Brief Course in the History of Education*, p. 322.

এবং আবেগ থেকেই আসে কর্ম।[৯] কাজেই হারবার্টের শিক্ষা-পদ্ধতির মূল কাজটি হচ্ছে ছাত্রের অভিজ্ঞতা, ধারণা ও বুদ্ধিকে একটি সুসম ও সমঞ্জস সমগ্রতায় কেন্দ্রীভূত করা। এরই তিনি নাম দিয়েছেন—'অ্যাপারসেপ্শন্' (Apperception)।[১০]

নীতিজ্ঞানকে তিনি পাঁচটি গুণে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথম হচ্ছে আত্মার স্বারাজ্য (inner freedom)—আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যয়ের সামঞ্জস্য। দ্বিতীয় হচ্ছে কুশলতা বা সুসমঞ্জস বিকাশ। তৃতীয়, উদারতা বা সদিচ্ছা। চতুর্থ, ন্যায়-পরায়ণতা। পঞ্চম, স্বাভাবিক সততা। কি করে শিক্ষক শিশুর চিন্তা, ধারণা, অনুভূতি ও ইচ্ছাকে এই আদর্শানুযায়ী করবেন—এই হচ্ছে হারবার্টের শিক্ষা-প্রণালী।

হারবার্ট বললেন—কি করে শিক্ষা দিতে হবে, কি তার স্তর, কি তার প্রক্রিয়া—এ কথা জানতে গেলে মানুষের মনের খবর জানতে হয়। তাই প্রয়োজন হচ্ছে বিজ্ঞানের। মন কি, তার ধর্ম কি, প্রক্রিয়া কি—এ সব সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মত আছে—এটা হচ্ছে হারবার্টের মনস্তত্ত্ব। প্রচলিত মনোবিজ্ঞানকে তিনি নতুন করে গড়েছেন। এটা তাঁর কৃতিত্ব। যদিও তাঁর মনস্তাত্ত্বিক মতামত অনেক ক্ষেত্রে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে ও পরিত্যক্ত হয়েছে তবুও তাঁর মনস্তত্ত্ব-ভিত্তিক শিক্ষাপ্রক্রিয়া আজও মূল্যবান্ এবং অনেক ক্ষেত্রে আজও ব্যবহৃত হচ্ছে।

হারবার্টের মতে আত্মা একটি অখণ্ড বস্তু। অ্যারিস্টট্ল্ বলেছিলেন আত্মা কতকগুলো শক্তি বা ফ্যাকাল্টির সমাবেশ। এ কথা হারবার্ট স্বীকার করেন না। তবে আত্মার মধ্যে কতকগুলো অন্তর্নিহিত ভাব (innate idea) জন্ম থেকেই বর্তমান থাকে, ডেকার্ট প্রমুখ বুদ্ধিবাদীদের (Rationalists) এ কথাও তিনি গ্রহণ করেন না। বরঞ্চ অভিজ্ঞতাবাদীদের (Empiricists) মত তিনিও মনে করেন মানুষের সমগ্র জ্ঞান, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা মানুষের মন বা আত্মা সংগ্রহ করে অভিজ্ঞতা দ্বারা। অভিজ্ঞতার দ্বার হচ্ছে দুটি—(১) প্রকৃতি-পরিচয় (২) ও মানুষের সংস্পর্শ। এই দুই পথে বিচ্ছিন্নভাবে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় সুশিক্ষকের কাজ হচ্ছে ছাত্রের মধ্যে সেগুলোকে সুশৃঙ্খল ও সম্পূর্ণ করে গড়ে

৯ Herbart, *Allgeimine Padagogic*, Introduction.

১০ Graves, *Great Educators of of Three Centuries*, p. 174.

তুলে তার সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গী ও সৎকর্মের অভ্যাসকে তার স্বভাবধর্মে পরিণত করা। শিক্ষক শিশুর বহিরাগত বিশৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাকে পরিণত করেন সম্যক-জ্ঞানে, আর মানুষের সঙ্গে সংস্পর্শজনিত অপরিণত অভিজ্ঞতাকে পরিণত করেন মানব-প্রীতিতে।[১১] মনের পরিণতি ও বিকাশ ঘটে অন্তর্নিহিত শক্তির স্ফুরণে নয়—বহিরাগত অভিজ্ঞতার সুসমঞ্জস সংযোজনায়। মানুষ জন্মগতভাবে সৎও নয়, অসৎও নয়। তার অভিজ্ঞতার প্রভাবে সে সৎ বা অসৎ হয়। অভিজ্ঞতাকে যে সুশৃঙ্খল করতে পারে সে হয় সৎ, আর যে পারে না সে হয় অসৎ। কাজেই এ থেকে দুটি মূল্যবান্ শিক্ষার সূত্র পাওয়া যাচ্ছে। মনের প্রধান ধর্ম হচ্ছে গ্রহণ, আত্মকরণ ও সংযোজন (assimilation)। শিক্ষা শিশুকে গঠন করে, কারণ শিক্ষার কাজ হচ্ছে মন যে অভিজ্ঞতারূপ উপাদান সংগ্রহ করছে তার নিয়ন্ত্রণ ও তার সংগঠন করা। শিক্ষা নতুন অভিজ্ঞতাকে পুরাতন জ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে সজীব ও সার্থক করে তোলে। কোন্ অভিজ্ঞতা শিশু গ্রহণ করবে, কোন্‌টি বর্জন করবে, যা গ্রহণ করছে তা কি করে তার প্রাচীন অভিজ্ঞতার পরিধির (circle of thought) মধ্যে মানিয়ে নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ করবে, —তা অনেকটা নির্ধারণ করবেন শিক্ষক। তাই হারবার্টের শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষক নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র নন।

মনের নিজস্ব কোন শক্তি বা সমন্বয়ী ক্রিয়া নেই। বাইরের প্রবৃত্তি থেকে এবং ভিতরের অনুভূতি থেকে সে উপাদান সংগ্রহ করে। এই ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা (presentation) হচ্ছে আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি—পেস্‌তালৎসীর একথা তিনি স্বীকার করেন, এবং কি করে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা নির্ভুলভাবে পেতে হবে, শিশুকে তা শিক্ষা দেওয়া যে শিক্ষকের প্রথম কাজ—একথাও তিনি মানেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মতবাদ পেস্‌তালৎসী নিয়েছেন লকের (Locke) কাছ থেকে। হারবার্ট পেস্‌তালৎসীর পদ্ধতিকে সম্পূর্ণতর এবং অধিকতর বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করেন। হারবার্টের পর মন্তেসরীর হাতে এ পদ্ধতি নতুন তাৎপর্য লাভ করে। যাক, মন এই প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতালব্ধ উপাদানগুলো গ্রহণ করে। এ উপাদানগুলো নিজেরা কোন শক্তি না হলেও পরস্পরের সান্নিধ্যে সংযোগ, বিয়োগ, সমন্বয়ের ক্ষমতা লাভ করবে। যে অভিজ্ঞতাগুলো একই ধরনের তারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়; যে অভিজ্ঞতাগুলো বিপরীত সেগুলো

[১১] Monroe, *A Brief Course in the History of Education*, p. 321.

একে অন্যকে বাধা দেয়। যেখানে উপাদানগুলো সম্পূর্ণ বিপরীত নয়, সেখানে অনুরূপ অংশগুলো সংযুক্ত হয়, কতকটা বিপরীত অংশগুলো আংশিক বাধা সৃষ্টি করে। পরস্পর বৈপরীত্য-জনিত বাধার ফলে কোন কোন অভিজ্ঞতা চেতন মনে প্রবেশলাভের ছাড়পত্র পায় না। তারা কিন্তু মরে না—মনের অবচেতনে লুক্কায়িত হয়ে থাকে ; বাধা দূর হলে চেতনার অঙ্গন (threshold of consciousness) পেরিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এ মতবাদ যে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের পূর্বাভাস তা বোঝা কঠিন নয়।[১২]

সমধর্মী কতকগুলো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা পুনঃ পুনঃ চেতনায় উপস্থিত হলে তারা পরস্পরের মধ্যে নিবিড় সম্বন্ধযুক্ত একটি মণ্ডলী (system) সৃষ্টি করে। একে ইংরেজীতে বলা যায় 'প্রেজেণ্টশন্-ম্যাস্' (presentation-mass)। মনের প্রাথমিক সঞ্চয়গুলো হচ্ছে শিক্ষার মূলধন। নতুন কোন অভিজ্ঞতা মনের সামনে এলে, তাকে সেই 'প্রেজেণ্টেশন্-ম্যাস্'এর সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়ে মন তাকে গ্রহণ করে। এই প্রাচীন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে নতুন অভিজ্ঞতা গ্রহণকে হারবার্ট বলেছেন শিক্ষার অন্বয়ীকরণ বা অ্যাপারসেপ্শন্ (apperception)। "নতুন অভিজ্ঞতার উপাদান যখন পুরাতন সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তখনই শিক্ষায় অন্বয়ীকরণ ঘটে। যা নতুন, তার তাৎপর্য নির্ণয় হয় পুরাতন অভিজ্ঞতার নিকষ-পাথরে।"[১৩] শুধু যে ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বেলায়ই এ কথা খাটে তা নয়, মনের ভিতর থেকে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা (inner perception) আসে, সে ক্ষেত্রেও এ কথা খাটে। হারবার্টের শিক্ষা-প্রণালীর এটি প্রথম সোপান এবং শিক্ষাসৌধের ভিত্তি হচ্ছে শিক্ষার অন্বয়ীকরণ। বর্তমানের মনোবিজ্ঞানীরাও একথা মানেন। স্টাউট বলছেন—"শিক্ষার প্রথম সোপান কি—এ সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানের সবচেয়ে মূল্যবান্ আবিষ্কার হচ্ছে এই যে, নতুন জ্ঞান অর্জন ও পরিবেশনের জন্যে আবশ্যক পুরাতন অভিজ্ঞতাকে নতুন জ্ঞানের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার।"[১৪] কার্লাইল ও ব্রাউনিংও অনুরূপ কথা বলেছিলেন। কার্লাইলের উক্তি হচ্ছে, "চক্ষু ততটুকুই দেখে যতটুকু শক্তি দিয়ে সে দেখছে"—the eye sees only what it brings the power to see,

---

১২ Rusk, *Doctrines of Great Educators*, p. 210.

১৩ Herbart, *Umriss*, p. 74.

১৪ Stout, *Analytic Psychology*, ii, p. 137-8.

ব্রাউনিং বলেছেন, "যারা পূর্বে শিক্ষালাভ করেছে তারাই নতুন শিক্ষা দ্বারা লাভবান্ হতে পারে"—'Tis the taught already that profit by teaching.

হারবার্ট-এর মনস্তত্ত্ব অনেকের মতে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাচীন অভিজ্ঞতার সঙ্গে নতুনের অন্বয়ীকরণের প্রয়োজন সম্বন্ধে তাঁর অভিমত আধুনিক শিক্ষাবিদ্ ও মনোবিজ্ঞানীরাও সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে থাকেন। বর্তমানের কালের আমেরিকার শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্ জন্ ডিউই শিক্ষার এই সূত্রকে নাম দিয়েছেন 'প্রিন্সিপ্‌ল্ অব কন্‌টিন্যুয়িটি'—শিক্ষার অবিচ্ছিন্ন ক্রমবিকাশের সূত্র।[১৫] এই মূল সূত্রকেই কিছুটা অন্যভাবে প্রকাশ করেছেন গেস্টল্ট্‌বাদীরা। তাঁরা বলেন প্রত্যেক বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাই প্রাচীন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি সম্পূর্ণতা, একটি সমগ্র প্যাটার্নে পরিণতি খোঁজে (pattern-forming)।[১৬] হারবার্ট ঠিকই বলেছেন একই শিক্ষা সকলে সমানভাবে গ্রহণ করতে পারে না। শিক্ষকের কাজ হচ্ছে ছাত্রের মনের অতীত অভিজ্ঞতার বলয়টি (circle of thought) উপযুক্তভাবে সৃষ্টি করে দেওয়া, যাতে সে নতুন শিক্ষা সফলভাবে গ্রহণ করতে পারে। পেস্‌তালৎসী ইন্দ্রিয়গত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা সুরু করার কথা বলেছিলেন, হারবার্ট তার সঙ্গে এ নতুন তত্ত্বটি যোগ করে পেস্‌তালৎসীর শিক্ষাপ্রণালীকে সম্পূর্ণতর করলেন।[১৭]

হারবার্টের মতে আবেগ, অনুভূতি, ইচ্ছা (feeling and will) চিন্তা বা অভিজ্ঞতা থেকে পৃথক মনের ক্রিয়া নয়। এরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারই বিভিন্ন অবস্থা (changeable conditions for presentation)। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপরই অনুভূতির প্রকৃতি ও গতি নির্ভর করে। কাজেই শিক্ষকের কাজ হচ্ছে ছাত্রের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রটি উপযুক্ত ভাবে সৃষ্টি করা। তার মধ্যে দিয়েই শিক্ষক চরিত্র সৃষ্টির উপায় খুঁজে পাবেন।

শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে তা'হলে হারবার্ট তিনটি কথা বললেন—(১) শিক্ষার কাজ হচ্ছে মনের সামনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ধরে দেওয়া; (২) সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-গুলোকে অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সুসঙ্গতভাবে সমন্বয় করে, সুসংবদ্ধ ধারণার মণ্ডল

---

১৫ Dewey, *Experience and Education.*

১৬ Koffka, *The Growth of the Mind.*

১৭ Rusk, *The Doctrines of Great Educators*, p. 212.

(circle of ideas) সম্পূর্ণ করে, আবেগ ও ইচ্ছাকে নীতিমুখী করে, শুভকর্মে প্রবৃত্ত করানো ; (৩) শিক্ষা, উপদেশ ও সুপরিচালনা (educative instruction) দ্বারা চরিত্র গঠন। উপযুক্ত শিক্ষক ছাত্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাগুলোকে নিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খলিত করে তার আবেগ ও ইচ্ছাকে গতিদান করেন, সংযত করেন এবং মনস্তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-প্রণালী ব্যবহার করে তার চরিত্রগঠন করেন।

হারবার্টের শিক্ষানীতিতে শিক্ষক মোটেই নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র নন। শিশু তার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনার স্বাধীন বিকাশ দ্বারা গড়ে উঠবে—রুশোর এ মত হারবার্টের মত নয়। হারবার্ট বলেন শিক্ষকই গড়েন ছাত্রকে। কিন্তু শিক্ষা মানে উপর থেকে বিদ্যা চাপিয়ে দেওয়া নয়। ছাত্রের মনকে আগে তৈরী করে নিতে হবে তার অ্যাপারসেপ্শন্-এর ক্ষমতাটিকে সক্রিয় করে তুলে। তখনই ছাত্রের মন শিক্ষকের শিক্ষার জন্যে গ্রহণেচ্ছু ও গ্রহণের অধিকারী হবে। হারবার্ট বলছেন, "শিক্ষণ মানে শুধু টুকরো টুকরো তথ্য বিতরণ নয়। এভাবে বাইরের থেকে চাপানো শিক্ষার মধ্যে এমন কোন রক্ষাকবচ নেই যা ছাত্রের মনের বিকৃতি বা কুপ্রভাব থেকে তাকে রক্ষা করবে। তার মনের ধারণা, যা তার ইচ্ছা ও আবেগকে নিয়ন্ত্রিত করে, সেখানে পৌঁছতে হবে। শিক্ষক যে পরিমাণে সেই ধারণা ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করে আদর্শানুসারী করতে পারবেন, সেই পরিমাণেই শিক্ষা ছাত্রের সহায়ক হতে পারবে।"[১৮]

শিক্ষকের উদ্দেশ্য

চরিত্র গঠন ও ছাত্রের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হচ্ছে শিক্ষকের উদ্দেশ্য। একে হারবার্ট বলেন ট্রেনিং। এর জন্যে ছাত্রের ধারণা, চিন্তা সুশৃঙ্খল করতে হবে। একে হারবার্ট বলেন ইন্‌স্ট্রাক্‌শন্। আর এ জন্যে নিষেধ, শাসন ও শাস্তির প্রয়োজন হয়। একে হারবার্ট বলেন গভর্ণমেণ্ট—আমরা বর্তমানে একে বলি ডিসিপ্লিন্। গভর্নমেণ্ট বা শাসন হচ্ছে নেতিবাচক। এটা উদ্দেশ্য নয়—উপায়। ছাত্রদের বাধ্যতা ও শৃঙ্খলা শিক্ষা দেওয়ার জন্যে, বিদ্যালয়ের সুপরিচালনার জন্যে, ছাত্রদের নিজ নিজ কর্মে ব্যাপৃত রাখার জন্যে গভর্নমেণ্টের প্রয়োজন আছে। শিক্ষক তাই একে অবহেলা করেন না। এখানে হারবার্ট রুশোর সঙ্গে একমত নন। রুশো বাইরের থেকে শাসনের বিরুদ্ধে। তিনি বলেছিলেন শিশু সমাজের কাছে থেকে, বাইরের দ্রব্য ও ঘটনার কাছ থেকে বাধা ও আঘাত পেয়েই আত্মশাসনে

১৮ Monroe, *A Brief Course in the History of Ed cation*, p. 323.

অভ্যস্ত হবে। হারবার্ট অবশ্য মানেন যে চরিত্র গঠন দ্বারা আত্মশাসনের অভ্যাসই হোল আদর্শ, কিন্তু বাইরের শাসনেরও প্রয়োজন আছে। তবে বাইরের শাসনের বিপদ সম্বন্ধে হারবার্ট সম্পূর্ণ সচেতন। "যেখানে ছাত্রেরা কেবলই শিক্ষক দ্বারা তাড়িত হোল এবং আত্মশাসনে অভ্যস্ত হোল না, সেখানে তাদের নৈতিক বিকাশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে থাকে।[১৯]

শিক্ষণ ব্যাপারের মধ্যে তাই যেন একটা আপাত-বৈপরীত্য আছে। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্রের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব বিকাশ, কিন্তু তার উপায় হচ্ছে ছাত্রের বুদ্ধি, বিবেচনা, অনুভূতি ও ইচ্ছার শাসন ও নিয়ন্ত্রণ। হারবার্ট তাই বলেছেন—"শিক্ষার পরিণতি যদি স্বাধীনতা না হয় তবে তা উৎপীড়ন।"[২০] ফরাসী শিক্ষাবিদ্ বুট্রু এ কথাই বলেছেন—"শিক্ষকের কাজ হচ্ছে ভারী অদ্ভুত। শিশুর বিচার ও বিবেককে এমন করে তিনি নিয়ন্ত্রণ করবেন যাতে সে স্বাধীন চিন্তা ও বিচারের শক্তিলাভ করে। শিক্ষকের কাজ হচ্ছে উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ দ্বারা শিশুকে এমনি করে গঠন করা যাতে সে স্বাধীন কর্মোদ্যমে প্রবৃত্ত হতে পারে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে জ্ঞান আহরণে উৎসাহিত হয়। শিক্ষকের কাজ হচ্ছে শাসন-নিয়ন্ত্রণের দ্বারা স্বাধীন মানুষ গড়ে তোলা।"[২১]

শিক্ষার অন্তরঙ্গ প্রণালী

শিক্ষণের এ হচ্ছে বহিরঙ্গ প্রণালী। শিক্ষার অন্তরঙ্গ প্রণালীর সম্পর্কে হারবার্ট যে মত প্রকাশ করেছেন তা আধুনিক কালের শিক্ষা-প্রণালীর একটি মূল-সূত্র। শিশুর ধারণা, বুদ্ধি, অনুভূতি, ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে শুধু বাইরের শাসন যথেষ্ট নয়; সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ছাত্রের আন্তরিক সমর্থন। ছাত্রের জীবন্ত আগ্রহ সৃষ্টি না করতে পারলে সব বিদ্যাদানই বৃথা। এ আগ্রহ হওয়া চাই সুস্থ, সম্পূর্ণ ও বহুমুখী (**many-sided interest**)। শিক্ষকের এ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার,—আর এখানেই হচ্ছে শিক্ষকের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা। এ কৌশলটি আয়ত্ত করাই হচ্ছে শিক্ষকের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। হারবার্ট বলেছেন, "শিক্ষার শেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে নীতিজ্ঞান, কিন্তু এই দূর উদ্দেশ্যটি সাধন করতে হলে একটি অদূরবর্তী উদ্দেশ্য

---

[১৯] Graves, *Great Educators of Three Centuries*, p. 184.

[২০] Herbart, *Berichte on an Herrn von Steiger*, iii.

[২১] E. Boutroux, *Education and Ethics*, p. x.

সামনে রাখতে হবে। এই অদূরবর্তী উদ্দেশ্যকে আমরা বলব, 'বহুমুখী আগ্রহ'। ইন্‌স্ট্রাক্‌শন্ দ্বারা যে মানসিক ক্রিয়াটি ছাত্রের মনে উদ্বুদ্ধ করে দিতে শিক্ষক সচেষ্ট তাকেই সাধারণভাবে বলা যায় আগ্রহ। শুধু মাত্র তথ্য (information) সংগ্রহ যথেষ্ট নয়। এ যেন হচ্ছে ভাণ্ডারে নানা উপাদান সংগ্রহ। এ সংগ্রহ এক ব্যক্তির থাকতে পারে এবং আর-এক ব্যক্তির না থাকতে পারে, তাতে তার প্রকৃতির কোন ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু যে এই তথ্য সংগ্রহ নিয়েই সন্তুষ্ট নয়, যে এই তথ্য সংগ্রহকে পরিপাক করে আরও নতুন তথ্য সংগ্রহে উৎসাহী হয়, সে হচ্ছে আগ্রহশীল। কিন্তু এ মানসিক ক্রিয়া হচ্ছে বহু বিষয় সম্পর্কে, কাজেই আগ্রহ কথাটিকে আর-একটি বিশেষণ-যুক্ত করেছি—'বহুমুখী'[২২]। তবে আগ্রহ শুধু বহুমুখী হলেই চলবে না, তা স্থায়ী হওয়া চাই। তবেই তা চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনের সহায়ক হতে পারে।

আগ্রহকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করতে পারি,—(১) জ্ঞান-সম্পর্কিত (২) ও সামাজিক জীবন সম্পর্কিত। জ্ঞান-সম্পর্কিত আগ্রহ আবার তিন রকমের,—(ক) ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ; এ অভিজ্ঞতা জ্ঞানেন্দ্রিয়-নির্ভর; (খ) চিন্তা ও যুক্তিলব্ধ; এর মূল হচ্ছে কার্যকারণ-সম্বন্ধ-বিচার; (গ) সৌন্দর্যবুদ্ধিসঞ্জাত; এর উদ্ভব হচ্ছে যুক্তিগত, সুসংযত চিন্তায় আনন্দ থেকে।

সমাজ-জীবন সম্পর্কিত আগ্রহও তিন প্রকার,—(/০) সহানুভৌতিক,—অন্য ব্যক্তির সঙ্গে ব্যবহার বা আদান-প্রদানের ফলে এর জন্ম। (৵০) সামাজিক,—সমগ্রভাবে সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক এর মূল। (৶০) ধর্মসম্পর্কিত—এর মূল হচ্ছে মানুষের সঙ্গে ভগবানের সংযোগ থেকে।

শিক্ষককে দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে আগ্রহ একদেশদর্শী না হয়। শিক্ষা মানেই হচ্ছে বিভিন্ন আগ্রহের সুসমন্বয়।[২৩]

এই প্রধান দুইটি আগ্রহ অনুযায়ী তিনি শিক্ষার বিষয়বস্তুকে দুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত করেছেন:

১) ঐতিহাসিক—এর মধ্যে থাকবে ইতিহাস, সাহিত্য, ভাষাজ্ঞান।

(২) বৈজ্ঞানিক—এর মধ্যে থাকবে অঙ্ক, কারিগরী, ও প্রকৃতি-বিজ্ঞান ইত্যাদি।

---

[২২] Herbart, *Allgeimine Padagogic*, p. 12, Bk I., ch 2.

[২৩] Graves, *Great Enucators of Three Centuries*, p. 179.

আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা

ছাত্রের আগ্রহ, প্রয়োজন ও মানসিক বিকাশের ধারানুযায়ী তার জন্যে সুসমন্বিত, সুষ্ঠু সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার আয়োজন করতে হবে। শিক্ষক দেখবেন ছাত্রের শক্তি ও আগ্রহ যাতে বিচ্ছিন্ন ও উৎকেন্দ্র হয়ে শক্তির অপচয় না ঘটায়। হারবার্ট বলেছেন, "বহুমুখিতার বিপরীত যেমন একদেশদর্শিতা, তেমনি বিচ্ছিন্নতাও (scattering)। নীতিজ্ঞানের মূল হবে বহুমুখী উদ্যম ; কিন্তু নীতিজ্ঞান ব্যক্তিত্বের বিশিষ্ট গুণ, কাজেই যাতে ব্যক্তিত্বের কেন্দ্রীভূত একত্ব বিনষ্ট না হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। শিক্ষা বা ইন্‌স্ট্রাক্‌শনের কাজ হচ্ছে ব্যক্তির বিভিন্ন দিক গড়ে তোলা এবং অপচয়কর বিভিন্ন নিষ্ফল উদ্যম থেকে ছাত্রকে বিরত করা। সমস্ত বহুমুখী জ্ঞান ও আগ্রহকে সুসংবদ্ধ করে পরস্পর নিবিড় সম্বন্ধযুক্ত একতার কেন্দ্রে সংহত করে, যে ব্যক্তি তা নিজ ব্যক্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে বোধ করতে শিখেছে, তার শিক্ষা সফল হয়েছে।"[২৪]

হারবার্টের সমন্বয়বাদ

হারবার্টের শিক্ষানীতির এই সমন্বয়বাদ পরবর্তী কালে তাঁর অনুবর্তীদের কাছে 'কোরিলেশন্' (correlation) নামে শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যমণি বলে বিবেচিত হয়েছিল। হারবার্টের ছাত্র জিলার্ এর থেকেই কেন্দ্রীকরণ (concentration) ও সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী শিক্ষার সোপান নির্ণয় (culture-epoch theory) মতবাদ প্রচার করেন।

পাঠ্যবিষয় তখনই অধিগত হতে পারে যখন সেই বিষয়টি অন্য দশটি বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, তা বোঝা যায়। সুশিক্ষক তাই মুখস্থ করার উপর জোর দেন না, জোর দেন সমন্বয়ীকরণের উপরে। ছাত্রের মনে তখনই একটি বিষয় দাগ কাটবে, যখন অন্যান্য আগ্রহবস্তুর সঙ্গে সে বিষয়ের সম্বন্ধটি তিনি নির্ণয় করে দিতে পারবেন। এই হচ্ছে 'কোরিলেশন্' প্রণালী।

আগ্রহ ছাড়া শেখা হয় না। তাই কোন বিশেষ আগ্রহের বিষয়কে বেছে নিয়ে, তাকে কেন্দ্র করে, শিক্ষার্থীকে অন্য দশটি বিষয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ। রোমাঞ্চকর, বীরত্বব্যঞ্জক গল্প থেকে সুরু করে আগ্রহের সূত্র ধরে শেখাতে হবে ইতিহাস, সাহিত্য, ভূগোল ইত্যাদি। এরই নাম কন্‌সেন্‌ট্রেশন্। হারবার্ট

[২৪] Graves, *Great Educators of Three Centuries*, p 180.

বলেছিলেন হোমারের মহাকাব্যগুলো ছোট শিশুর মনকে সহজেই আকর্ষণ করে, কাজেই তাদের কেন্দ্র করে বিদ্যার বিস্তার সহজ হয়। তিনি 'কেন্দ্র' হিসাবে ঐতিহাসিক বিষয়গুলোর মূল্য বৈজ্ঞানিক বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় থেকে সমধিক, একথা মনে করতেন। তিনি এর একটা কারণও নির্দেশ করেছিলেন। মানবজাতির শৈশবে যুদ্ধবিগ্রহ, শৌর্যবীর্য প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। তাই মানব-জাতির মনেও এ জাতীয় কাহিনীর স্বাভাবিক একটা আকর্ষণ আছে। এ ইঙ্গিতকেই ভিত্তি করে জিলার্ এই মতবাদ প্রচার করলেন যে, শিশুর শিক্ষা মানব-সভ্যতার ইতিহাসের ধারাকে অনুসরণ করবে।[২৫] স্ট্যানলি হল্ খেলার বিভিন্ন রূপের বিকাশ ব্যাখ্যা করতে জিলারের অনুরূপ কথাই বলেছিলেন।[২৬] এ মতবাদে নূতনত্ব আছে, এ মতবাদ চিন্তাপ্রসূতও বটে, তথাপি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এ মতকে যথেষ্ট সমর্থন করে না।

শিক্ষার পঞ্চসোপান

বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রণালী হচ্ছে শিশুর সামনে উপযুক্ত বিষয় স্থাপন করে, তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগস্থাপন ও অন্বয়ীকরণ। শিশুর আগ্রহ সৃষ্টি দ্বারা শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্যক গ্রহণোপযোগী করে, তার ধারণা, অনুভূতি ও ইচ্ছাকে রঞ্জিত করতে হবে, তবেই তা মানব-কল্যাণ বা নৈতিক আদর্শের অভিমুখী হবে। নির্দিষ্ট ক্রম-পর্য্যায়ে কি কি স্তর বা সোপান অতিক্রম করে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে, হারবার্ট এ সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত সূচী প্রস্তুত করেছেন (The Herbartian Steps or Method)। হারবার্ট শিশুর মানসজীবন বিকাশের ও আগ্রহের ধারা অনুযায়ী চারটি সোপান নির্দেশ করেছিলেন। আগ্রহের চারটি স্তর—(১) স-মনোযোগ প্রত্যক্ষ (observation), (২) ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা (expectation), (৩) চাহিদা (demand), (৪) ক্রিয়া (action)। এ স্তর-বিভাগ অনুসারী শিক্ষণ-পদ্ধতিরও চারটি সোপান—(ক) সুস্পষ্টতা (clearness), (খ) পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ততা (association), (গ) সমন্বয় (system), ও (ঘ) সাধারণ সূত্রের ব্যবহার (method)। (ক) হচ্ছে কোন একটি বিষয়ে তীব্র মনোযোগ। পেস্তালৎসীও এই স্তরটি উল্লেখ করেছিলেন এবং একে অবজারভেশন্ নাম দিয়াছিলেন। জিলার্ এ স্তরটিকে দুটি স্তরে ভাগ করিলেন—(১) প্রস্তুতি (preparation), (২) উপস্থাপন (presen-

---

২৫ Ziller, *The Basis of the Doctrine of Educative Instruction.*

২৬ Stanley Hall, *Adolescence*, p. 230.

tation)। প্রস্তুতি হচ্ছে যে নতুন বিষয়টি ছাত্রের মনের সামনে উপস্থিত করতে হবে তার সঙ্গে নির্দিষ্ট-সম্বন্ধযুক্ত পুরাতন অভিজ্ঞতা ছাত্রের স্মৃতিতে পুনরানয়ন। এমনি করে মন প্রস্তুত হলেই নতুন বিষয় ছাত্রের বোধগম্য হতে পারে। এই নতুন ও পুরাতন-এর মধ্যে সংযোগ-সাধনের নাম আমরা পূর্বে বলেছি অ্যাপার-সেপ্‌শন্ (Apperception)। প্রস্তুতির পর নতুন বিষয়টি উপস্থাপিত (presentation) হলে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্যবোধ হবে। এবং এই বিষয়গুলো যে একটি সাধারণ সূত্রের অঙ্গ, তা ছাত্রেরা বুঝতে শিখবে; তৃতীয় পদক্ষেপ হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন্ (Association)—অধিগত বিষয়কে কল্পনার সাহায্যে নতুন অন্য বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করার ফলে যে বিষয় শেখা হোল, তা মনের মধ্যে শিকড় গেড়ে বসে। চতুর্থ সোপান, সিসটেম্ (system)—সাধারণ সূত্রকে বিশেষ বিষয়গুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করে চিন্তা করা ক্ষমতা, অর্থাৎ বিশুদ্ধ চিন্তার (abstract thought) ক্ষমতা এ স্তরে জন্মাবে। সাধারণ সূত্রকে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্প্রসারিত করে একটি সমন্বিত একতাবোধ জন্মে। এ স্তরে পৌছতে বিচার-বিবেচনা ও ভাষার সম্যক্ ব্যবহার প্রয়োজন। পঞ্চম স্তর—মেথড্ বা অ্যাপ্লিকেশন্। এবার ছাত্র তার সমন্বিত জ্ঞান জীবনের প্রকৃত সমস্যা সমাধানের কাজে ব্যবহার করার ক্ষমতা অর্জন করে। তার চিন্তা, ধারণা, অনুভূতি ইচ্ছা ও ক্রিয়ার সমন্বিত গঠনেই ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের প্রতিষ্ঠা।

শিক্ষকের কর্তব্য

কি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি বা প্রণালী অনুসরণ করে ছাত্রের সম্পূর্ণ সুসমন্বিত বিকাশ ঘটানো যায়—একথা নিয়েই হারবার্টের যত আলোচনা। সে প্রণালী ও তার স্তর বা সোপান সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তিনি। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই তাঁর বিশেষ দান। তিনি নিজে বলেছেন, "শিক্ষাদান (instruction) সুসমন্বিত চিন্তার বলয় (circle of thought) সৃষ্টি করে। সম্পূর্ণ শিক্ষা গঠন করে চরিত্র। শেষটি (চরিত্রগঠন) ভিন্ন প্রথমটি মূল্যহীন। আমার সমস্ত শিক্ষানীতির সম্পূর্ণ তত্ত্ব এইখানেই।"[২৭] হারবার্টের ছাত্র জিলার্ যেমন 'স্পষ্টতা' (clearness) নামক সোপানকে ভাগ করলেন প্রস্তুতি (preparation) ও উপস্থাপন (presentation) এই দুই ভাগে, তেমনি তাঁর আর-এক ছাত্র রেইন্ (Rein) প্রস্তুতি এই

[২৭] Monroe, *A Brief Course in the History of Education*, p. 328-29.

সোপানে আর-একটি স্তর যোগ করলেন—উদ্দেশ্য (aim)। বর্তমানে হারবার্ট ও তাঁর অনুগামিগণ-নির্দিষ্ট নামগুলি কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে ব্যবহার করা হয় এবং হারবার্টের পঞ্চসোপানকে এভাবে প্রকাশ করা হয়, যথা—(১) প্রস্তুতি (preparation), (২) উপস্থাপন (presentation), (৩) তুলনা ও বিমূর্তন (comparison and abstraction), (৪) সামান্যীকরণ (generalisation), এবং (৫) সূত্র-ব্যবহার (application)।[২৮]

শিক্ষাক্ষেত্রে হারবার্টের দান

শিক্ষার ক্ষেত্রে হারবার্টের দান সামান্য নয়। শিক্ষকের দিক থেকে শিক্ষাদান-প্রণালী সফল করবার জন্যে কি করণীয়, এ সম্বন্ধে তাঁর মত আজও মূল্যবান্। আগ্রহকে শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করতে হবে এবং জ্ঞানকে বহু-সম্বন্ধযুক্ত আগ্রহের সমন্বয়ে ছাত্রের মনে দৃঢ়সংবদ্ধ করতে হবে, এটি আধুনিক শিক্ষানীতির একটি প্রধান সূত্র। শিক্ষণের প্রণালীকে সুনির্দিষ্ট করে দিয়ে, তিনি শিক্ষকের কাজকে সহজ করেছেন। আগ্রহবস্তুকে কেন্দ্র করে শিক্ষাপদ্ধতির বিস্তার (concentration) আধুনিক কালে সমস্ত ক্রিয়া-কেন্দ্রিক (activity-centred) ও শিল্প-কেন্দ্রিক (craft-centred) শিক্ষাপদ্ধতির ভিত্তি। পেস্তালৎসীর মত ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করলেও তিনি তাঁর চেয়ে বেশী অগ্রসর হয়ে শিক্ষার নৈতিক আদর্শ নির্দেশ করে তাকে সম্পূর্ণতর করেন। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বেলায় বস্তুর রূপ ও আকার নির্ধারণ (perception of form) তিনি অতিশয় প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন এবং এ বিষয়ে কিছু পরীক্ষাও করেছিলেন। কোন সন্দেহ নেই যে তাঁর মত ও পরীক্ষা মন্তেসরীর মতবাদকে প্রভাবান্বিত করে। তিনি 'ফ্যাকাল্টি সাইকোলজীর' ভ্রম নির্দেশ করেছেন, ও শিক্ষায় সংক্রামকতা (transfer of training) রূপ ভ্রমাত্মক মতবাদও গ্রহণ করেননি। তাঁর শিক্ষানীতি ভবিষ্যতে জার্মানী ও আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থাকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করে।

কিন্তু হারবার্টের মনস্তত্ত্ব বহুক্ষেত্রেই ঠিক নয় বলে পরিত্যক্ত হয়েছে। তিনি ফ্যাকাল্টি মতবাদ ত্যাগ করলেও অনুষঙ্গ মতবাদ (associationism) গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মনস্তত্ত্বে অনুভূতি ও ইচ্ছাকে (feeling and willing) চিন্তার (thinking) সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থা (attendant conditions) বলে

২৮ Findlay, *Principles of Class Teaching.*

গৌণস্থান দেওয়া হয়েছে। তাঁর শিক্ষা-প্রণালীর স্তরবিভাগ পেস্‌তালৎসীর তুলনায় পূর্ণতর ও অধিকতর বৈজ্ঞানিক হলেও তা অতিমাত্রায় যান্ত্রিক (mechanical)। তাঁর শিক্ষা-প্রণালীতে শিশুর ক্রিয়া-শক্তির বিকাশের (motor development) দিকটা অবহেলিত রয়ে গেছে। এদিক থেকে ফ্রোএবেল্ ও মন্তেসরীর শিক্ষানীতি সফলতর। ফ্রোএবেল্ ও মন্তেসরী দৃষ্টি দিয়েছেন শিশুর বিকাশের ধারা অনুসরণে ও তার আত্মপ্রকাশের (self-activity) দিকে। কিন্তু হারবার্ট-এর দৃষ্টি মূলতঃ শিক্ষকের দিকে। তাঁর শিক্ষারীতি শিশুকেন্দ্রিক (paido-centric) শুধু এই অর্থে যে, শিশুর আগ্রহকে জাগ্রত ও অবলম্বন করে শিক্ষা অগ্রসর হবে। তবে শিশুর আগ্রহকে পরিচালন করার ভার, তাকে আদর্শানুগামী করবার ভার, শিক্ষকের উপর ন্যস্ত।

হারবার্টের পঞ্চপদী সূত্র অনুসরণে একটি পাঠটীকা

[অধ্যাপিকা শান্তি দত্ত, এম.এ., এম.এ-এড্ (লণ্ডন)]

তারিখ	সময়	বিদ্যালয়
শিক্ষিকা	ছাত্রীসংখ্যা	গড় বয়স ৯+
শ্রেণী—পঞ্চম	বিষয়—গণিত	বিশেষ পাঠ—বিভাজ্য

সাধারণ উদ্দেশ্য—চিন্তা ও বিচারশক্তির বিকাশ।

বিশেষ উদ্দেশ্য—বিভাজ্য কি তাহা বুঝিতে সাহায্য করা।

প্রস্তুতিকরণ বা আয়োজন

নিম্নলিখিত প্রশ্নের সাহায্যে পূর্বজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনপূর্বক শিক্ষিকা ছাত্রীদের মন পাঠাভিমুখী করিবেন—

(১) তোমরা ভাগ করিতে জান ?

(১) ভাগ মিলিয়া যাওয়া জান ? ছাত্রদের নিকট হইতে তাহাদের পূর্বজ্ঞানের পরিচয়স্বরূপ কয়েকটি উদাহরণ গ্রহণ।

পাঠ-ঘোষণা ও উপস্থাপন

ভাগ মিলিয়া যাওয়াকে শুদ্ধ ভাষায় বলে বিভাজ্যতা, যেমন ১২ সংখ্যাটি ২ সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে মিলিয়া যায়, কাজেই বলা হয় ১২ সংখ্যা ২ সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য। আজ আমরা এই 'বিভাজ্য' সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

(১) বিশেষ উদাহরণ বা পরীক্ষা

২ দ্বারা ভাগ করিলে মিলিয়া যায় এমন কয়েকটি সংখ্যা ছাত্রীদের সাহায্যে শিক্ষিকা বোর্ডে লিখিবেন,—যেমন, ১০, ১২, ১৬, ৪, ৬, ৩২, ৮, ১৫০ ইত্যাদি।

তুলনা ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা সূত্র গঠন

এই সংখ্যাগুলির বৈশিষ্ট্যের প্রতি ছাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ, যথা—প্রত্যেকটি সংখ্যার পিছনে হয় একটি জোড় সংখ্যা, অথবা একটি শূন্য থাকিবে, তাহা হইলেই ঐ সংখ্যাটি ২ দ্বারা বিভাজ্য হইবে।

(২) বিশেষ উদাহরণ

৩ সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে মিলিয়া যায়, এমন কয়েকটি সংখ্যা ছাত্রীদের সাহায্যে শিক্ষিকা বোর্ডে লিখিবেন, যেমন, ৩, ৬, ৯, ২৭, ২১, ২৪, ৩০ ইত্যাদি।

তুলনা ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা সূত্র গঠন

৬ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে প্রত্যেকটি সংখ্যার যোগফল সর্বদাই ৩, ৬ অথবা ৯ হইবে। প্রথম যোগফল ৯ হইতে বেশী হইলে পুনরায় ঐ যোগফলের সংখ্যাগুলিকে পরস্পরের সহিত যোগ করিতে হইবে। (যেমন ২৩৬৮২ সংখ্যাটির যোগফল ২১, উহার পুনঃ যোগফল ৩, সুতরাং ঐ সংখ্যাটি ৩ দ্বারা বিভাজ্য।)

অভিযোজন

সূত্র গঠন করিবার পর শ্রেণীর প্রত্যেকটি মেয়ে সূত্রগুলি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে কি না এবং প্রয়োগ করিতে পারে কি না তাহা পরীক্ষার্থে নিম্নলিখিত মৌখিক অঙ্কগুলি করিতে দেওয়া হইবে ও প্রশ্ন করিতে হইবে, যথা—

নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলি ২ বা ৩ দ্বারা বিভাজ্য কি না? বিভাজ্য হইলে কি কারণে বিভাজ্য?

(১) ৭৪, ৮৯০, ১২৬, ৩৪২ ইত্যাদি।

(২) ৬১২, ১৭০১, ২০০১, ২৩৬৮২ ইত্যাদি।

কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে অঙ্ক বা বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ে এই পঞ্চপদী সূত্র যেমন নিখুঁতভাবে ব্যবহার করা যায় সাহিত্য বা ইতিহাস শিক্ষণের ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব হয় না। সেখানে সূত্রটি মোটামুটি ভাবে ব্যবহার করা যায়।

শিশু চারাগাছের দরদী মালী
ফ্রেডরিক্ উইল্‌হেলম্ অগষ্ট ফ্রোএবেল্
(১৭৮২-১৮৫২)

অধ্যাত্ম জগত সত্য শাশ্বত, চিরন্তন। কিন্তু এ সত্য বারে বারে নতুন করে আবিষ্কারের অপেক্ষা রাখে। কোন সাধকের অনুভূতি ও চিন্তায় যখন সত্যের একটি বিশেষ দিক উজ্জল হয়ে ফুটে ওঠে, তখনই সে সত্য জীবন্ত হয়, সার্থক হয়—তা এক নতুন তাৎপর্য লাভ করে।

এমনি একটি মরমী সাধক ফ্রোএবেল্।

ভারতের প্রাচীন ঈশোপনিষদ্-এর প্রথম বাক্যটি হচ্ছে 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'—যিনি এই জগতে ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছেন, যিনি একে ধারণ করে আছেন, পালন করছেন, পোষণ করছেন, তিনিই ঈশ্বর। তিনি সর্বমূলাধার,—তাঁর শক্তিতেই সমস্ত জগতের অস্তিত্ব, গতি, সৌন্দর্য ও আনন্দ।

তিনি জড় ও চেতন সকলেরই মূল। কঠোপনিষদের বাণী—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥

যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে (দাহ্যবস্তুর) রূপভেদে তত্তদ্রূপ হয়েছেন, তেমনি এক সর্বভূতের অন্তরাত্মা নানা বস্তুভেদে তত্তদ্ বস্তুরূপ হয়েছেন, এবং (সমুদায় পদার্থের) বাহিরেও আছেন।

জ্ঞানের অর্থ ই হচ্ছে বহুর মধ্যে সেই পরম একক জানা। মুণ্ডকোপনিষদে তাই প্রশ্ন,—'কস্মিন্ন্ ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি'—হে ভগবন্, কি জানলে এ সমস্তই জানা যায়? এ প্রশ্নের উত্তর ঈশোপনিষদের ঋষি দিচ্ছেন,—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥
যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমপুপশ্যতঃ॥

যিনি আত্মাতে সমুদায় বস্ত দেখেন, এবং সমুদায় বস্তুতে আত্মাকে দেখেন, তিনি সেই কারণে (কাহাকেও) ঘৃণা করেন না। যখন এরূপ জ্ঞান হয় যে আত্মাই সমুদায় বস্তুরূপী হয়েছেন, তখন (এইরূপ) একত্বদর্শী ব্যক্তির পক্ষে মোহ ও শোকের সম্ভাবনা থাকে না।

প্রাচীন ভারতের এই আধ্যাত্ম সাধনার বাণীর প্রতিধ্বনি আমরা শুনি যেন ফ্রোএবেল্-এ। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'দি এডুকেশন্ অব্ ম্যান্'-এর প্রথম ক'টি ছত্র হচ্ছে—"সমস্ত বস্তুর মধ্যেই বাস করে, রাজত্ব করে, এক সনাতন অমোঘ বিধান। যাঁর অন্তরের রুচি ও চেতনা এ বিশ্বাস দ্বারা পরিব্যাপ্ত ও অনুপ্রবিষ্ট, যে ইহাই প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য বিধান, এর কোন ব্যতিক্রম কোথায়ও সম্ভব নয় এবং যাঁর স্বচ্ছ প্রশান্ত মানসদৃষ্টি বাইরের বহু দ্রব্যসমষ্টির মধ্যে অন্তরের ঐক্যকে দেখে এবং এটাও জানতে পারে যে অন্তরের মূলের যুক্তিগত বিকাশ অনুযায়ীই বহির্বিশ্বের দ্রব্য ও ঘটনার বিকাশ ঘটে, তিনিই সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে বহির্বিশ্ব ও অন্তরের আত্মিক জগৎ, এবং বহিঃ ও অন্তর যেই প্রাণক্রিয়ার মধ্যে মিলে গেছে, তার মধ্যে এই অলঙ্ঘ্য বিধানের ঐক্যকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন। এই সর্বব্যাপী নিয়মানুবর্তিতার মূলে আছে সক্রিয়, প্রাণবন্ত, চেতন, সনাতন ও একক শক্তি। বিশ্বাস ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা এ নিয়মিততা ও ঐক্য যে সর্বব্যাপী, সে বোধ অত্যন্ত স্পষ্ট করেই জন্মে। সুতরাং শান্ত অনুসন্ধিৎসু মন ও স্বচ্ছ মানববুদ্ধি কখনও এ মৌলিক ঐক্যকে অস্বীকার করতে পারেনি, কোনদিন তা অস্বীকার করতে পারবে না। এই সর্বমূলাধার ঐক্যের নামই হচ্ছে ঈশ্বর।" [১]

প্রাচীন সত্যের এ পুনরাবিষ্কার ফ্রোএবেল্এর চিন্তায় ও কর্মে এক নতুন তাৎপর্য লাভ করল। তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সত্যকে সচেতনভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে নিয়োগের কাজে ব্রতী হলেন, যেমন গান্ধীজী সত্য ও অহিংসার নীতি রাজনীতির ক্ষেত্রে নিয়োগ করে নতুন পথ দেখিয়েছিলেন।

তাঁর শিক্ষারীতিতে এ দুটি মূলসূত্রকে ফ্রোএবেল্ অনুসরণ করেছিলেন—

(১) বিশ্বের সমগ্র বস্তু নির্দিষ্ট নিয়মাধীন। তার কারণ সমগ্র বিশ্বজগৎ একই মূলশক্তি ভগবানের প্রকাশ। শিক্ষার কাজ সমস্ত দ্রব্য ও বস্তুর সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ ও তুলনা দ্বারা তাদের অন্তর্নিহিত মৌলিক ঐক্যের আবিষ্কার।

(২) যে ঐক্য সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করে আছে তা গতিশীল, জীবন্ত ও

[১] Froeble, *The Edncation of Man*, p. 1.

নিয়ত বিকাশমান, তাই প্রত্যেক বস্তু বা দ্রব্যের বিকাশের নির্দিষ্ট ধারা আছে। শিশুর মনের বিকাশের ধারা অনুযায়ী তার শিক্ষার বিষয় নিয়ন্ত্রিত হবে। শিক্ষা বাইরের থেকে চাপিয়ে দেওয়া জ্ঞানের বোঝা নয়। শিক্ষা শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ, প্রয়োজন ও ক্রিয়ার স্বাভাবিক পরিণতি। ফ্রোএবেল্ বললেন, "ভগবান্ বাইরের থেকে জোড়া লাগান না, বাইরের থেকে অনুপ্রবেশ করিয়ে দেন না। তিনি চিরন্তন অন্তর্নিহিত প্রত্যেক বস্তুর বিশিষ্ট নিয়মানুযায়ীই প্রত্যেককে বিকশিত করেন।"[২]

তাঁর শিক্ষানীতি অভিনব হলেও যে অধ্যাত্মবাদ তাঁর শিক্ষাদর্শের ভিত্তি, তা ভারতীয় চিন্তার সমধর্মী ; তাই তাঁকে বোঝা আমাদের কাছে খুব কঠিন নয়। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে তাঁর সম্বন্ধে বিরুদ্ধতা কিছু কম নয়। অল্প কয়েকজন চিন্তাশীল শিক্ষাব্রতী ফ্রোএবেল্-এর শিক্ষাদর্শকে ঋষিদৃষ্টি-প্রসূত বলে শ্রদ্ধার আসন দিয়েছেন, আবার বহুজন তাঁকে যথেষ্ট নিন্দাও করেছেন। তাঁরা বলেছেন, তাঁর মতবাদ খ্রীষ্টান ধর্মমতের বিরোধী, তিনি অতীন্দ্রিয় সত্যে বিশ্বাসী (mystic), বিশ্বেশ্বর-বাদী (Pantheist), তিনি মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাসী (Symbolist)। তিনি নিতান্তই পাগল আর শিক্ষার তপস্যার ক্ষেত্রে ক্রীড়া-চাঞ্চল্যের প্রশ্রয় দিয়ে শিশু-শিক্ষার সর্বনাশ করেছেন।[৩] অনেকে তাঁকে বাইরের দিক থেকে বিচার করেছেন নতুন শিক্ষাপ্রণালী কিণ্ডারগার্টেনের স্রষ্টা হিসাবে, শিক্ষার ক্ষেত্রে নানা খেলা, গান ও নানা শিল্পক্রিয়ার প্রবর্তক হিসাবে, কিন্তু তাঁর যারা ভক্ত তাঁরা বলেন, "এমন করিয়া দেখো না আমারে, দেখো না আমারে বাহিরে"। তাঁদের মতে ফ্রোএবেল্-দর্শনের গুহ্য (esoteric) অধ্যাত্মভিত্তিকে না জানলে তাঁর শিক্ষাদর্শকে সম্যক বোঝা অসম্ভব। তাই ফ্রোএবেল্এর শিক্ষাপ্রণালীর বিচারে তাঁর বাহ্য ও আন্তর—এ দুটি দিক সম্বন্ধেই জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এ জ্ঞান সহজ নয়। কুইক্ ঠিকই লিখেছেন, "এমন কোন কোন মহামানব আছেন যাঁরা এমন একটি জগতে প্রবেশলাভ করেন যা সাধারণ মানুষের অনধিগম্য। মোজেস্-এর মত তাঁরা দুরূহ পর্বতচূড়ায় আরোহণ করেন এবং সে উচ্চভূমিতে তাঁরা যা প্রত্যক্ষ করেন তার ভিত্তিতে তাঁরা আমাদের পথ নির্দেশ করেন। কিন্তু আমরা তাঁদের মত উচ্চ-চূড়ায় আরোহণ করতে পারি না ; সুতরাং আমরা অনুভব করি, আমরা তাঁদের

---

২ Hughes, J. L., *Froebl's Education Law. for All Teachers.* p. 13.

৩ F. Eby, *The Development of Modern Education*, p. 496.

সম্পূর্ণ করে বুঝতে পারি না। যদিও তাঁদের সততা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, তথাপি তাঁরা যা প্রত্যক্ষ করেছেন তার স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের কখনও কখনও দ্বিধা জাগে।"[৪] তিনি স্বীকার করছেন ফ্রোএবেল্‌কে তিনি সম্পূর্ণ করে বুঝতে পারেন নি। তথাপি তিনি জোর করেই বলছেন, "আমার ধারণা বর্তমান কালে শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ চিন্তার সমস্ত ধারাই ফ্রোএবেল্‌এর উক্তি ও ক্রিয়ায় পরিণতি লাভ করেছে।"[৫] বাস্তবিক পক্ষে য়ুরোপ আমেরিকার শিশু-শিক্ষার ব্যবস্থা ফ্রোএবেল্‌এর শিক্ষাদর্শ ও প্রণালীকে আজও অনুসরণ করছে।[৬]

দক্ষিণ জার্মানীর মনোরম পার্বত্য আরণ্যপ্রদেশ থুরিঙ্গিয়ার অন্তর্গত ওবের উইল্‌ব্যাক্ গ্রামে ১৭৮২ সালে ফ্রোএবেল্ জন্মগ্রহণ করেন। এই নিবিড় অরণ্যানী ফ্রোএবেল্‌এর কল্পনা ও চেতনাকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। তাঁর পিতা ছিলেন গ্রামের ছোট গীর্জার পুরোহিত। পিতা কর্মব্যপদেশে অতিব্যস্ত থাকতেন, সন্তানদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল সামান্যই। ফ্রোএবেল্‌এর বয়স যখন মাত্র নয় মাস, তখন তিনি মাকে হারান। তার অল্পদিন পরেই তাঁর পিতা আবার বিবাহ করেন। বিমাতা শিশু ফ্রোএবেল্‌এর প্রতি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। তাঁর কাছে ফ্রোএবেল্ স্নেহ-ভালবাসা তো পানই নি, বরংচ নানা দুর্ব্যবহারই পেয়েছেন। স্নেহবঞ্চিত ও সঙ্গীহীন ফ্রোএবেলের নিরানন্দ বাল্যজীবন তাঁকে গম্ভীর ও অন্তর্দর্শনে অভ্যস্ত (introspective) করে তোলে। এই সঙ্গীহারা শিশুকে বনের গাছ, ফুল, লতা, পাখী, আকাশ ও মেঘ হাতছানি দিয়ে ডাক দিত। কল্পনায় তাদেরই মধ্যে শিশু খুঁজে পেত বন্ধুর প্রীতি ও সাহচর্য। ভবিষ্যতে শিশুর মনোজগৎ সম্বন্ধে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও বাহ্য-প্রকৃতিকে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান ও প্রত্যক্ষকরণের প্রবৃত্তি এবং বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে গভীর মিল সম্বন্ধে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়ের মূলে আছে তাঁর বাল্যজীবনের অভিজ্ঞতা। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ফ্রোএবেল্‌এর তুলনা করা চলে। নিজের স্নেহকাঙ্গাল, আনন্দহীন বাল্যজীবনের তিক্ত স্মৃতি তাঁকে শিশুর প্রতি এমন দরদী করে তুলেছিল। তাঁর পিতামাতার ধারণা ছিল ফ্রোএবেল্ নিতান্ত নির্বোধ। কাজেই বাল্যকালে তাঁর উপযুক্ত শিক্ষার কোন ব্যবস্থা তাঁরা করেন নি। এ জন্যে ফ্রোএবেল্ বড় হয়ে বহু দুঃখ করেছেন।

৪ Quick, *Essays on Educational Reformers*, pp. 384-85.
৫ ,, ,, ,, ,, p. 384.
৬ Monroe, *A Brief Course in the History of Education*, p. 334.

তাঁর দশবছর বয়সের সময় ফ্রোএবেল্‌এর মামা দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে রাখেন। চারবছর মামার কাছে তাঁর সুখেই কাটে। মামা তাঁকে স্কুলে ভর্তি করে দেন। বাড়ীর স্নেহ তিনি এই প্রথম পান এবং সমবয়স্ক সঙ্গী-সাথীর সঙ্গ এবং নিয়মিত বিদ্যাচর্চায় তাঁর দিনগুলো ভালই কেটেছিল। সব-চেয়ে বড় কথা, ধর্ম সম্বন্ধে মামার মত তাঁর অন্তরে গভীর রেখাপাত করে। তাঁর মামাও স্থানীয় গীর্জার পুরোহিত ছিলেন এবং বাস্তবিক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। এ সময় থেকেই ফ্রোএবেল্‌ বিশ্বাস করতে থাকেন যে সমগ্র সৃষ্টির মূলে আছে ভগবানের ঐশীশক্তি। উপযুক্ত দৃষ্টি থাকলে, প্রত্যেক দ্রব্যের পশ্চাতে সেই রহস্যময় সর্বব্যাপী শক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তাঁর 'এডুকেশন্‌ অব্‌ ম্যান্‌' গ্রন্থে পরবর্তী কালে তিনি লিখেছেন, "বাল্যকালেই বিশেষ করে মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন করা উচিত। এ প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রাকৃতিক দ্রব্যাদির খুঁটিনাটি সম্বন্ধে নয়, তাদের বাইরের বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধেও নয়, এ পরিচয় হচ্ছে ঈশ্বরের যে শক্তি এ সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে বাস করে ও তাদের নিয়ন্ত্রণ করে, সে সম্বন্ধে।"[৭] কিন্তু স্কুলের পাঠ তাঁর অনুসন্ধিৎসার, রহস্যময় ঐক্যের অনুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি দিতে পারে নি। তাই শিক্ষকেরা তাঁকে 'গাধা ছেলে' বলেই ঠাউরেছিলেন। তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্যে পাঠানো হোল, কিন্তু তাঁকে দু-বছরের জন্যে (১৭৯৭—৯৯) বনবিভাগের এক কর্মচারীর অধীনে কাজ শিখতে দেওয়া হোল। লেখাপড়ার দিক দিয়ে ক্ষতি হলেও এতে গাছপালার জগতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় নিবিড়তর হোল। প্রকৃতির যে রহস্য ও ঐক্যের সূত্র তাঁর অন্তর অনুসন্ধান করছিল তা তিনি খুঁজে পেলেন। তাঁর কাছে যেন নতুন জগতের দ্বার খুলে গেল। তিনি বুঝতে শিখলেন যে-নিয়মে পাতা নড়ে, ফুল ফোটে, বীজ অঙ্কুরিত হয়, তা এক জীবন্ত সর্বব্যাপী ঐশীশক্তিরই প্রকাশ। সে শক্তি শুধু বৃক্ষ-লতা-পাতার জগতেই নয়, সমস্ত বিশ্বের সমস্ত দ্রব্যের মধ্যেই ক্রিয়া করছে।

এর থেকে তাঁর মনে তীব্র স্পৃহা জন্মাল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-চর্চার। তাঁর মনে এ দৃঢ় বিশ্বাস হোল যে বিভিন্ন বিজ্ঞান-চর্চার দ্বারা সর্বব্যাপী ঐক্যের সূত্রটি কিভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছে, তা তিনি স্পষ্টতর ভাবে বুঝতে পারবেন। বহু কষ্টে পিতামাতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। কিন্তু

[৭] Froebel, *The Education of Man*, Tr. Hailmann, p. 162.

অর্থাভাবে শীগ্‌গিরই তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বাড়ীতে ফিরে আসতে হোল। জীবিকার সন্ধানে নানারকম কাজ নিতে তিনি বাধ্য হলেন। কিছুদিন করলেন চাষবাস, কিছুদিন জমি জরীপ, কিছুদিন হিসেব-রক্ষকের কাজ। এর কোন কাজেই তিনি তৃপ্তি পেলেন না। এ সময় (১৮০২) তাঁর বাবা মারা যান।

তাঁর মনের মধ্যে কিন্তু একটি দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, ভগবান্ একটি মহৎ কাজ তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। তিনি স্থপতি-বিজ্ঞান শিখছিলেন এমন সময় (১৮০৫) ডাঃ গ্রুনার নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তাঁর অনুরোধে তিনি পেস্‌তালৎসীর শিক্ষানীতি অনুসরণকারী ফ্রাঙ্কফোর্টএর এক আদর্শ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ নেন। সেখানে শিশুদের মাঝে গিয়েই ফ্রোএবেল্ বুঝতে পারলেন এই তাঁর বিধিনির্দিষ্ট মহৎ কাজ। তিনি লিখেছেন, "প্রথম থেকেই আমি বুঝতে পারলুম আমার মন চিরদিন যা খুঁজেছে, এতদিন যা কেবলই আমাকে এড়িয়ে গেছে, এই সেই কাজ আমি পেলুম, আমার প্রাণ যেন তার নিজ স্থানটি খুঁজে পেল—মাছ যেমন জল পেলে খুশী হয় আমার মন তেমনি খুশী হয়ে উঠল।" [৮]

এই স্কুলে তিন বছর ফ্রোএবেল্ খুব সুনামের সঙ্গে কাজ করেন। কিন্তু ক্রমশঃই তিনি বোধ করতে লাগলেন শিক্ষকতার কাজে তাঁর উপযুক্ত শিক্ষার অভাব। এ সময় তিনি তিনটি ছাত্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন এবং ছেলেদের পিতার অনুমতিক্রমে তিনি পেস্‌তালৎসীর বিখ্যাত ইভারডুন্ বিদ্যালয়ে ছাত্রদের নিয়ে ভর্তি করেন। সেখানে ১৮০৭ থেকে ১৮০৯ পর্যন্ত দু'বৎসর পেস্‌তালৎসীর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসে তাঁর শিক্ষারীতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করেন। তিনি পেস্‌তালৎসীর শিক্ষাব্যবস্থার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হন। কিন্তু তিনি এটাও বোধ করেন যে পেস্‌তালৎসীর শিক্ষাব্যবস্থা যথেষ্ট সুশৃঙ্খল নয় এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে মৌলিক ঐক্যের সূত্র আবিষ্কার সম্বন্ধে পেস্‌তালৎসী সচেতন নন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "শীঘ্রই অনেক ত্রুটিও আমার চোখে পড়ল... পেস্‌তালৎসীর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব একটি অব্যক্ত প্রভাব বিস্তার করত, তা আমাদের অন্তরাত্মাকে মহত্তর জীবনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তুলত, কিন্তু তথাপি আমি বোধ করতাম সেই আদর্শটি স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলতে, অথবা কি করে সে আদর্শে

৮ Baroness von Marenholtz-Bulow, *Recollections of Friedrish Froebel.*

উন্নীত হওয়া যায় সে পথ তিনি খুব পরিষ্কার করে নির্দেশ করেন নি।" [৯] পেস্তালৎসীর পরীক্ষা থেকে ফ্রোএবেল্ শিক্ষার মূলসূত্রগুলো স্পষ্ট করে আবিষ্কার করলেন। তিনি পেস্তালৎসীর শিক্ষানীতিকে সম্পূর্ণতা দান করলেন।[১০] স্মিড্ লিখছেন, "ফ্রোএবেল্ পেস্তালৎসীর ছাত্র; তিনি গুরুর মতই প্রতিভা-সম্পন্ন। তিনি তাঁর গুরুর শিক্ষাপদ্ধতিকে সম্পূর্ণ করলেন। পেস্তালৎসী তাঁর শিক্ষণ-চেষ্টার নানা অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। ফ্রোএবেল্ তাঁর সে সব পদ্ধতির অন্তর্নিহিত মূলসূত্রগুলো স্পষ্ট করে প্রকাশ করলেন। তিনি এ কাজটি করলেন নূতনতর পরীক্ষা দ্বারা নয়। মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত থেকে তিনি এ সূত্রগুলোকে পেলেন অবরোহ প্রণালী দ্বারা (deduction)। এ প্রকারে তিনি মানব-মনের বিকাশের ধারা এবং প্রকৃত শিক্ষার উপযুক্ত পথ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণায় পৌঁছতে সক্ষম হন।[১১] এখানেই তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে সঙ্গীত ও হাতের কাজের মধ্য দিয়ে যে আশ্চর্য ফললাভ করতে পারা যায় তা প্রত্যক্ষ করলেন। এখানেই কয়েকটি ছাত্রকে শিক্ষাদান-কালে পরীক্ষামূলকভাবে কাগজ, পেস্টবোর্ড, কাঠ দিয়ে নানা জিনিস তৈরি করে শিশুর গঠন-প্রবৃত্তিকে শিক্ষার কাজে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন। এখানেই তিনি শিশুর শিক্ষার প্রথম স্তরে মাতার স্নেহপূর্ণ পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট করে অনুভব করেন।[১২]

তিনি নিশ্চিত বুঝেছিলেন যে মানুষের মনের ধারা এবং বাহ্য প্রকৃতির ধারা একই নিয়ম অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত। তাই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যে পাঠ জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুরু করে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তা আবার সুরু করতে তিনি সংকল্প করলেন। ১৮১১ সালে এ উদ্দেশ্যে তিনি গোটিঙ্গেন্ ও পরে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, "এতদিন পর্যন্ত যে জাতীয় আলোচনার জন্যে আমার মন-প্রাণ উৎসুক হয়ে ছিল তা আমি পেলুম, এবং পূর্বের চেয়েও দৃঢ়তর প্রত্যয় নিয়ে আমি অনুভব করতে লাগলুম যে সমগ্র বিশ্বের দ্রব্য ও ঘটনার বিকাশের অন্তর্নিহিত মূলসূত্র নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা যায় (demonstrable)। এটাও আমি বুঝেছিলুম, বিশ্বের নানা

---

৯ Froebel, *Autobiography*, Tr. E. Michaelis & H. Moore, p. 79.

১০ Quick, *Essays on Educational Reformers*, p. 388.

১১ Smidt. K., *Gesch. d. Pad*, 3rd Ed. by Lange, Vol. IV.

১২ Graves, *Great Educators of Three Centuries*, p. 199.

বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার মধ্যে যে মূলগত ঐক্য আছে সে সম্বন্ধে মানুষ সম্পূর্ণ সচেতন হতে পারে। এই একের মধ্যেই নিত্য বহুর বিকাশ ও উন্মোচনের লীলা চলছে। এবং আমার চেতনার মধ্যে এবং অনুভূতিতে এই প্রত্যয় যখন স্পষ্ট হয়ে উঠল যে অহংএর অস্তিত্বের ঐক্যের মধ্যেই মানুষের সমস্ত জীবন, কর্ম ও চিন্তা ও অবস্থা বিভেদের কেন্দ্র, তখনি আবার আমার মনকে শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যার দিকে ফেরাতে সক্ষম হয়েছিলুম।"[১৩]

ফ্রোএবেল্‌এর বহুমুখী প্রতিভা ও সদাজাগ্রত বিপ্লবী মন গোটিংঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার আবহাওয়াতে বিকশিত হয়ে উঠল। সেখানে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের আলোচনা, দার্শনিক ফিক্‌টের অধ্যাত্মবাদ, তাঁর উর্বর মানসক্ষেত্রে নতুন নতুন চিন্তার বীজ বপন করে দিল। কিন্তু সমস্ত জ্ঞানচর্চার মধ্যে দিয়ে এই প্রতীতিই তাঁর দৃঢ়তর হোল যে সমস্ত বিশ্বের মূলে একই শক্তি ক্রিয়া করছে—সমস্ত জ্ঞানের উদ্দেশ্য সেই মূলসূত্রের আবিষ্কার।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম, জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনের অগ্রগমনের একটি উল্লেখযোগ্য যুগ। ভাষাতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক আলোচনার মধ্যে দিয়ে উলফ্, বোয়েথ্, শ্লেগেল সমস্ত ভাষার বিকাশের ধারার মূল ঐক্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রসায়নে ব্ল্যাক্ ও প্রিষ্ট্‌লের চিন্তা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও মৌলিক ঐক্যের দিকে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিল। দর্শনের ক্ষেত্রে ফিক্‌টে, শেলিং এবং বিশেষ করে হেগেল্ শুদ্ধ চিন্তা দ্বারা জগৎব্যাপারের মূল অনুসন্ধানে রত ছিলেন। ফ্রোএবেল্‌এর উৎসুক মন এ সমস্ত চিন্তা দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয়েছিল, তবে তিনি তাঁর জীবনদর্শনের ভিত্তি খুঁজেছিলেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানচর্চা ও অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে দিয়ে।[১৪]

তাঁর এ চিন্তাধারা বিশেষ করে উৎসাহ লাভ করে বার্লিনে অধ্যাপক উইসের অধীনে ধাতুবিজ্ঞান আলোচনার ফলে। বিশেষতঃ স্ফটিকগঠনের রীতির (laws governing the formation of crystals) মধ্যে তিনি জীব ও অজীব জগতের নিবিড় ঐক্যের নিঃসন্দেহ পরিচয় পান। ধাতুবিজ্ঞানে তাঁর এতটা ব্যুৎপত্তি জন্মে যে তাঁকে এই বিষয়ে অধ্যাপক-পদ গ্রহণের জন্যে অনুরোধ করা

---

১৩ Froebel, *Autobiography*, Tr. Michaelis & Moore.

১৪ F. Eby, *The Development of Modern Education*, p. 499.

হয়েছিল এবং বার্লিনে ধাতুদ্রব্যের মিউজিয়ামে তিনি কিছুদিনের জন্যে সহকারী কিউরেটরের কাজ করেছিলেন।

১৮১৩ সালে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। তাঁর কাজে আবার ব্যাঘাত ঘটল। তিনি প্রাশিয়ার রাজার আহ্বানে সেনাপতি লুট্‌জাওএর সৈন্যদলে ভর্তি হলেন। তাঁকে অবশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হয় নি। তাঁর লেখাপড়ায় বাধা হলেও সৈন্যদলে গিয়ে নিয়মানুবর্তিতা, দশে মিলে কাজ করা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি গুণের মর্যাদা তিনি খুব ভাল করেই বুঝতে পারেন। এখানে তাঁর আর একটি মস্ত লাভ হয়। তিনি ল্যাঙ্গেথাল্ ও মিডেন্‌ডর্ফ নামে দুইজন ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত হন। এঁরা তাঁর শিক্ষানীতিতে এমনই মুগ্ধ হলেন যে পরবর্তী কালে এঁরা ফ্রোএবেল্‌এর সমস্ত পরীক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর অনুগামী হয়েছিলেন।

১৮১৪ সালে তিনি আবার বার্লিনে ফিরে আসেন এবং অধ্যাপক উইসের অধীনে স্ফটিকতত্ত্ব (crystallography) চর্চা পুনরারম্ভ করেন।

কিন্তু তাঁর বিধিনির্দিষ্ট কর্তব্য শিক্ষাদান, একথা তিনি বিস্মৃত হন নি। তিনি প্লামান্‌এর পেস্‌তালৎসী-রীতি অনুসরণকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ নিলেন। এখানে তিনি শিশুর মন বোঝার কাজে অধিকতর মনোযোগী হলেন এবং তাঁর মনে এ বিশ্বাস দৃঢ়তর হোল যে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন, এবং অধিকতর সুসংবদ্ধ, শিশুমনের কাছে অধিকতর আকর্ষণীয়, জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষানীতি আবিষ্কার সম্ভবপর। ১৮১৬ সালে তিনি ষ্টক্‌হোলমে একটি অধ্যাপকের পদ গ্রহণ না করে, ডাঃ উইসের উপদেশের বিরুদ্ধে পাঁচটি অল্পবয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন।[১৫] এখানে তাঁর দুই শিষ্য ল্যাঙ্গেথাল্ ও মিডনে্‌ডর্ফও তাঁর আহ্বানে এসে মিলিত হন এবং তিনজনে মিলে 'দি ইউনিভার্সাল্ জার্মান্ ইন্‌ষ্টিট্যুট্ অব এডুকেশন' নাম দিয়ে কীল্‌হাউ গ্রামে একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করলেন। ফ্রোএবেল্-শিক্ষাপ্রণালীর প্রথম পরীক্ষা সুরু হোল। এখানেই আমরা ভবিষ্যৎ কিণ্ডারগার্টেন নীতির পরিচয় পাই। এখানে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের অন্তর্নিহিত সমস্ত শক্তির সুসমঞ্জস বিকাশ। এ বিকাশ আসবে সুচিন্তিতভাবে নির্ধারিত, পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধযুক্ত, কতকগুলো বিষয়ে ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। আত্মপ্রকাশ (self-development) এবং স্বাধীন বিকাশ (free development)—এই দুটি ছিল এ বিদ্যালয়ের

১৫ Graves, *Great Educators of Three Centuries*, p. 199.

মূলমন্ত্র। অনেকটা শিক্ষাই দেওয়া হত খেলার মধ্যে দিয়ে। অবশ্য ভবিষ্যৎ কিণ্ডারগার্টেনে ছাত্ররা ছিল ছোট ছোট, এখানে তারা অপেক্ষাকৃত বড় ছিল······ খোলা হাওয়ায়, বাগানে, স্কুলঘরের চারপাশে এবং স্কুলঘরের ভিতরেও অনেক শিক্ষা দেওয়া হত নানা কাজের মধ্যে দিয়ে। ছেলেরা নদীর বাঁধ, ময়দা পেষাইর কল, দুর্গ, প্রাসাদ—এ সব তৈরী করত কাদা, কাঠ, কাঠের গুঁড়ো, তুলো, এ সব দিয়ে। বনে ঘুরে তারা নানা জন্তু, পাখী, পোকা, ফুল, এ সব সংগ্রহ করে আনত। তারা বিভিন্ন রূপ (forms) ও সংখ্যা (number) নিয়ে নানা বাস্তব সমস্যার সমাধান শিখত এবং তাদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে নতুন জগতের দ্বার তাদের মনের সামনে উন্মুক্ত করে দেওয়া হত নানা কাহিনী, উপকথা, যুদ্ধসঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে। [১৬]

এখানে থাকতেই ফ্রোএবেল্, ল্যাঙ্গেথাল্, মিডেন্‌ডর্ফ ও আর একজন নতুন শিক্ষক ব্যারপ্ সবাই বিয়ে করে এই ছাত্রদের সঙ্গে একই পরিবারভুক্ত বৃহৎ সংসারের মত বিদ্যালয়টি চালাতে লাগলেন। তাঁদের ঐকান্তিকতা, সহানুভূতি, বুদ্ধিমত্তার গুণে নতুন শিক্ষাপদ্ধতির ফল ফলতে দেরী হোল না। তাঁদের এই নতুন বিদ্যালয়ের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ক্রমে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু ফ্রোএবেল্ টাকাপয়সার বিষয়ে এবং পরিচালনা ব্যাপারে খুব সতর্ক বা সাংসারিক বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন না। এবং বিদ্যালয়ের অতিরিক্ত প্রসার করতে গিয়ে নানা আর্থিক অসুবিধা দেখা দিল।

দশ বছর কীল্‌হাউ বিদ্যালয় পরিচালনা করবার পর ১৮২৬ সালে এ বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত শিক্ষানীতি প্রচারের উদ্দেশ্যে ফ্রোএবেল্ তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'দি এডুকেশন্ অব্ ম্যান্' প্রকাশ করলেন।

এ গ্রন্থ কিন্তু শিক্ষাজগতে বিশেষ কোন আলোড়ন সৃষ্টি করে নি। অবশ্য কিছু কিছু চিন্তাশীল শিক্ষাব্রতী এ বই পড়ে বিশেষ উৎসাহিত হন এবং তাঁর নতুন শিক্ষানীতি প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু আবার অন্যদিকে প্রাচীনপন্থীরা তাঁর অগ্রসর শিক্ষানীতির মধ্যে বিপ্লব ও ধর্মহীনতার গন্ধ পেয়ে বিরোধী হয়ে উঠলেন।

তাঁর বিদ্যালয় সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্যে সরকার থেকে একজন বিদ্যালয়-পরিদর্শককে পাঠানো হোল। এই পরিদর্শক ডাঃ জেন ফ্রোএবেল্‌এর বিদ্যালয় দেখে এমন মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তাঁর রিপোর্টে তিনি লিখলেন, "এখানে আমি দেখলাম,

[১৬] Graves, *Great Educators of Three Centuries*, p. 200.

ষাটটি পরিবার নিবিড় প্রীতি ও বিশ্বাসের বন্ধনে একটি বৃহৎ সংসারে বাস করে। প্রত্যেকেই সকলের মঙ্গলের জন্যে কাজ করে যাচ্ছেন। ছাত্রদের উপর এর সুফল অত্যন্ত প্রত্যক্ষ……শিশুর কোন সুপ্তশক্তিই অ-বিকশিত থাকে না, প্রত্যেকেই এ বৃহৎ পরিবারের মধ্যে নিজের প্রয়োজনীয় উৎসাহ খুঁজে পায়। এ বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য জ্ঞানদান ও বিজ্ঞানশিক্ষা মাত্র নয়—এর উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বতঃপ্রণোদিত ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজ নিজ অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ।"

যাই হোক ১৮৩০ সালে ফ্রোএ:বল্‌এর এক অনুরাগী বন্ধু তাঁর নতুন শিক্ষা-প্রণালী সুইজারল্যাণ্ডে স্থাপনের জন্যে তাঁকে লুসার্নএর অন্তবর্তী ওয়ারটেন্‌সীতে একটি প্রাসাদ ছেড়ে দেন। ফ্রোএবেল্ কীল্‌হাউ-এর বিদ্যালয় ব্যারপের হাতে দিয়ে শিষ্য-বন্ধু ল্যাঙ্গেথাল্‌কে নিয়ে সুইজারল্যাণ্ডে চলে যান। কিন্তু সেখানে ক্যাথোলিক পুরোহিতরা গোড়া থেকেই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগলেন এবং চারবছর চালাবার পরও বিদ্যালয়টি বিশেষ সাফল্যলাভ করল না। পুরোহিতরা বিরোধিতা করলেও সুইস্ গভর্নমেণ্ট তাঁর শিক্ষানীতি প্রবর্তনের জন্যে আগ্রহান্বিত ছিলেন এবং বহু শিক্ষককে নতুন শিক্ষাপ্রণালী শিখবার জন্যে তাঁরা ফ্রোএবেল্‌এর কাছে পাঠাতে লাগলেন। শেষে ফ্রোএবেল্ বার্গডর্ফএ একটি সরকারী অনাথাশ্রম এবং শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রের ভার নিলেন। ইতিপূর্বে ত্রিশ বছর আগে পেস্‌তালৎসীও এই শহরে তাঁর প্রসিদ্ধ পরীক্ষামূলক বিদ্যাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। মিডেন্‌ডর্ফও সুইজারল্যাণ্ডে এসে ফ্রোএবেল্‌এর কাজে যোগ দিয়েছিলেন। ফ্রোএবেল্ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে এখানে দশ বৎসর কাজ করেন এবং সমস্ত পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে তাঁর চিন্তাও অধিকতর পরিপূর্ণতা লাভ করে। এ সব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তিনি বুঝলেন শিক্ষার উন্নতি করতে হলে একেবারে শিশুকাল (তিন বৎসর) থেকে শিশুর উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং এ কাজে সুশিক্ষিতা মাতার সাহায্য অপরিহার্য। তা ছাড়া এখানে থাকতেই তিনি খেলা ও কাজের মধ্যে দিয়ে শিশুশিক্ষার বিভিন্ন স্তরগুলো সম্বন্ধে কতকগুলো স্থিরসিদ্ধান্তে পৌছেন, এবং অনেক খেলা ও খেলার উপাদান আবিষ্কারে মন দেন। কিন্তু এ সময় তাঁর স্ত্রীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়াতে তিনি কীল্‌হাউতে ফিরে আসেন। পথে বার্লিনে কিছু-দিন তিনি ছিলেন এবং তখন সেখানের শিশু-শিক্ষালয়গুলোর সঙ্গে তিনি পরিচিত হন এবং তাঁর নিজের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে মা ও শিক্ষকদের কাছে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। কীল্‌হাউ ফিরে এসে, থুরিঙ্গিয়ার মনোরম আরণ্য প্রদেশের কাছাকাছি

ব্ল্যাকেন্‌বুর্গ গ্রামে একটি শিশুবিদ্যালয় স্থাপন করেন (১৮৩৭)। তাঁর পরিণত জীবনের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তিনি এই শিশুবিদ্যালয় পরিচালনায় ব্রতী হলেন। এখানে ছাত্রদের বয়স তিন থেকে সাত বৎসর মাত্র। একদিন সেই প্রাণপূর্ণ শান্ত আরণ্যভূমিতে ভ্রমণকালে তাঁর মনে এ বিদ্যালয়ের 'কিণ্ডারগার্টেন' এ সার্থকতাপূর্ণ নামটি হঠাৎ উদিত হয় (১৮৩৯)। কিণ্ডারগার্টেন মানে 'শিশু-উদ্যান'। কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির আবিষ্কর্তা হিসাবেই ফ্রোএবেল্ আজ জগৎ-বিখ্যাত। এখানে ঐক্য ও ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে স্বতঃবিকাশের যে সূত্রে তিনি বিশ্বাস করে এসেছেন তার বাস্তব রূপায়ণে তিনি রত হলেন। সুইজারল্যাণ্ডে যে সব খেলা ও খেলার উপাদান তিনি আবিষ্কার করেছিলেন এবং আরো নতুন খেলা ও গান তিনি শিশুশিক্ষার কাজে লাগালেন এবং সেগুলোকে শিশুর বিকাশের স্তর অনুযায়ী কিভাবে সুশৃঙ্খলভাবে ব্যবহার করতে হবে তার প্রণালী নির্ধারিত করে দিলেন। তাঁর এ নতুন পরীক্ষা সমগ্র মানব-সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করবে, এ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তাঁর নতুন শিক্ষাপ্রণালীর বিবরণ তিনি সাপ্তাহিক এক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে লাগলেন। বড় বড় নগর থেকে ডাক আসতে লাগল এ সম্বন্ধে বক্তৃতা করবার জন্যে। এবং ব্ল্যাকেনবুর্গে শিক্ষক-শিক্ষণের নিয়মিত ব্যবস্থা করলেন। তাঁর খ্যাতি এবার বহুদূর বিস্তৃত হোল। কিন্তু তাঁর প্রথম কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয় অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে গেল। ১৮৩৯ সালের শেষ দিকে তিনি তাঁর স্ত্রীকে হারান। ফ্রোএবেল্ কিন্তু নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেন না। তিনি নতুন নতুন জায়গায় কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয় খুলে তাঁর শিক্ষাপ্রণালীকে জনপ্রিয় করে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি এ সময় নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে তাঁর শিক্ষানীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করে বেড়াতে লাগলেন। বিশেষ করে মাঁ ও শিক্ষকদের কাছে নব-শিক্ষানীতি প্রচার তিনি অত্যন্ত প্রয়োজন বোধ করলেন। ১৮৪৯ সালে তিনি স্যাক্‌সে মাইনিঙ্গেন্‌এর অন্তর্গত লাইবেনষ্টিনে স্থায়িভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। এ স্থান স্বাস্থ্যকর ধাতুগুণসম্পন্ন প্রস্রবণের জন্যে বিখ্যাত। এখানে তিনি আবার বিবাহ করলেন। যাঁকে বিবাহ করলেন তিনি ছিলেন একজন সম্পূর্ণ অশিক্ষিতা গ্রাম্য বালিকা। 'ইনি ফ্রোএবেল্‌কে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এবং ফ্রোএবেল্‌এর কাছে কিণ্ডারগার্টেন-পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করেন।[১৭]

---

১৭ Graves, *Great Educators of Three Centuries.*

এর কিছুদিন আগেই ফ্রোএবেল্ ব্যারনেস ফন্ ম্যারেন্‌হোলৎস ব্যুলাউ নামে বিত্তশালিনী মনস্বিনী মহিলার সঙ্গে পরিচিত হন। এই মহিলার চেষ্টায়ই কিণ্ডারগার্টেনএর আদর্শ জার্মানীর বাইরে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তিনি ফ্রোএবেল্‌এর একটি চমৎকার জীবনী প্রকাশ করেছিলেন এবং ফ্রোএবেল্‌এর মৃত্যুর পরে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাদর্শ য়ুরোপ ও আমেরিকায় প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর চেষ্টায় ম্যারিয়েন্থাল শহরে এক প্রাসাদোপম ভবনে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। কিন্তু জার্মানীতে ফ্রোএবেল্‌এর কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষার অগ্রসর ও গণতান্ত্রিক আদর্শ দেশের ক্ষমতাপ্রিয় আমলাতান্ত্রিক সরকারের সন্দেহ ও বিরাগ সৃষ্টি করল। এ সময় ফ্রোএবেল্‌এর এক ভ্রাতুষ্পুত্র কার্ল ফ্রোএবেল্ সমাজতন্ত্র প্রচার করে এক পুস্তক প্রকাশ করলেন। শাসক ও পুরোহিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে কিণ্ডারগার্টেনএর বিরুদ্ধে এক প্রবল আন্দোলন চলল। ফলে প্রুশিয়ার শিক্ষামন্ত্রী কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষার বিরুদ্ধে এক হুকুম জারী করেন (১৮৫১) এবং সমস্ত প্রুশিয়ায় কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাঁর আজীবন সাধনার ফল এমন ভাবে ব্যর্থ হওয়াতে ফ্রোএবেল্ দারুণ আঘাত পেলেন। শিক্ষাব্রতীরা এই হুকুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। ফ্রোএবেল্ প্রচার করলেন যে কার্ল ফ্রোএবেল্‌এর সমাজতন্ত্রবাদএর সঙ্গে তাঁর শিক্ষানীতির কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী কোন যুক্তিতে কর্ণপাত করলেন না। ফ্রোএবেল্ এ আঘাত সহ্য করতে পারলেন না। অল্পদিন পরেই ১৮৫২ সালের মে মাসে সত্তর বৎসর বয়সে তিনি মারা যান।

যদিও তাঁর জন্মভূমি জার্মানীতে তিনি আদৃত হননি তথাপি অচিরেই য়ুরোপের অন্যান্য দেশে কিণ্ডারগার্টেনএর আদর্শ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তবে কিণ্ডারগার্টেনের সমধিক প্রচার হয়েছে আমেরিকায়, এবং আজও সেখানে প্রাক্-বিদ্যালয় স্তরে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে কিণ্ডারগার্টেনএর নীতিই অনুসৃত হচ্ছে।

ফ্রোএবেল্‌এর শিক্ষাদর্শ সম্পূর্ণ মৌলিক বা অভিনব এমন দাবি তিনি নিজেও কখনো করেন নি। তাঁর পূর্বসূরীদের কাছে ঋণ তিনি অকুণ্ঠভাবেই স্বীকার করেছিলেন। এ কথা বলা যেতে পারে নিম্নলিখিত চারটি সূত্র থেকে তিনি তাঁর শিক্ষানীতি ও প্রণালী আহরণ করেছেন—(১) কাণ্টের পরবর্তী ভাববাদী দার্শনিকদের (Post-Kantian idealistic philosophers) মতবাদ; (২) তৎকালীন বিভিন্ন বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়; (৩) পূর্ববর্তী

শিক্ষাব্রতীদের শিক্ষাদর্শ ; (৪) তাঁর নিজস্ব দরদী মন, যা দিয়ে তিনি বাহ্যপ্রকৃতি ও শিশুমনের ক্রমবিকাশ পরম যত্ন ও আগ্রহের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছেন।[১৮]

জেনা এবং বার্লিনে যখন ফ্রোএবেল্ ছাত্র হিসাবে গিয়েছিলেন তখন নানা জীবন্ত চিন্তার ধারার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। দার্শনিক ফিক্‌টের কাছে তিনি পড়েছেন। তাছাড়া ব্রূনো, শেলিং, শিলার ও বিশেষ করে হেগেলের দার্শনিক মতবাদ তাঁকে প্রভাবান্বিত করেছিল।

কাণ্টএর সময় থেকে জার্মানীতে ভাববাদী দর্শনের ধারা প্রবল হয়ে ওঠে। "এই সমগ্র দার্শনিক মতবাদের ধারার মূলতত্ত্বটি হচ্ছে জগতের সমস্ত সত্তা ও জীবনের ব্যাখ্যার সূত্র আছে একটি সর্বব্যাপী চিৎশক্তির ঐক্যের মধ্যে ; এই শক্তি একদিকে মানুষের মন আর একদিকে প্রকৃতির সমস্ত ঘটনাকে একই নিয়মের সূত্রে গ্রথিত করে।"[১৯] এই ভাববাদী দার্শনিক চিন্তাধারার সঙ্গে ফ্রোএবেল্‌এর চিন্তার মোটামুটি মিল আছে ; সকলেই একটি ঐক্যের কেন্দ্র অনুসন্ধান করেছেন। ফিক্‌টে এই ঐক্যের সূত্রকে পেয়েছেন মানুষের মনে, আর বহিঃপ্রকৃতিকে এই অন্তঃপ্রকৃতি থেকে অনুস্যূত করেছেন ; শেলিং আবার বিপরীতভাবে বহিঃপ্রকৃতি থেকেই অন্তঃপ্রকৃতিকে টেনে এনেছেন। ফ্রোএবেল্ এই বহিঃ ও অন্তঃপ্রকৃতি দুইকেই এক স্বয়ংক্রিয়, সচেতন, মৌলিক ঐশীশক্তির প্রকাশ বলে বিশ্বাস করেন। ঈশ্বরের সৃষ্টির এক রূপকে আমরা দেখি প্রকৃতির মধ্যে শক্তি (force) হিসাবে আবার সেই সৃজনী ক্রিয়ার অন্য রূপ দেখি মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা রূপে। এ সৃষ্টিক্রিয়া একটি নির্দিষ্ট কালব্যাপী চূড়ান্ত ঘটনা নয়, এ একটি চিরন্তন প্রবহমান স্রোত—ক্রমবিকাশের অবিচ্ছিন্ন ধারা। সেই এক ঈশ্বর যিনি সমস্ত জগৎ ও জীবনের কেন্দ্র, তিনি প্রকৃতির বহু দ্রব্য ও ঘটনা এবং মনের অসংখ্য ক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই নিজেকে প্রকাশ করেন। এই বহুর মধ্যেই একের সার্থকতা

ফ্রোএবেল্‌এর সমসাময়িক দার্শনিক ক্রওস্ (Krause)এর মতের সঙ্গে তাঁর খুব বেশী মিল আছে। ক্রওস্‌এর সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল এবং তাঁর বার্গডর্ফ থাকাকালে ক্রওস্‌ই শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে খেলার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ইতিপূর্বে কমেনিয়াস্ তাঁর 'স্কুল্ অব্ ইনফ্যান্সি' গ্রন্থে যে আলোচনা করেছিলেন তার প্রতি ফ্রোএবেল্‌এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[২০]

---

১৮ F. Eby, *The Development of Modern Education* p. 500.
১৯ Monroe, *A Brief Course in the History of Education*, p. 332.
২০ Graves, *Great Educators of Three Centuries*, p. 201.

বহুর মধ্যে দিয়েই এক নিজেকে প্রকাশ করে, সুতরাং এক ও বহু বাস্তবিক পরস্পরবিরুদ্ধ নয়। ক্রওস্ তাঁর মূল ঐক্য-তত্ত্বকে তাই নাম দিলেন—'অংশ-সমগ্র' (Part-whole, Gleidganzes)। তিনি উদাহরণ দিলেন হাতের একটি আঙুলের নিজস্ব একটা সত্তা আছে, কিন্তু সে তো স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ নয়, সেটি হাতের একটি অংশ। আবার হাতের একটা নিজস্ব সত্তা থাকলেও সে আবার বাহুর অঙ্গ। এমনি করে পৃথিবীর প্রত্যেক দ্রব্যেরই দুটি রূপ আছে—একটি তার বিচ্ছিন্ন একক রূপ, আর একটি তার সমগ্র রূপ।

মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন তার একই দেহের বিভিন্ন প্রকাশ, মানুষের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি মানসিক ক্রিয়াও তেমনি একই মনের বিভিন্ন প্রকাশ। দেহ ও মনও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র নয়। দৈহিক ক্রিয়া ও মানসিক চেতনা পরস্পরের হাত ধরে চলে। তাদের যখন বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র করে দেখি তখনই আমরা ভুল করি। দার্শনিকের সমগ্রদৃষ্টিই হচ্ছে সার্থক দৃষ্টি।[২১]

শিক্ষাকে ফ্রোএবেল্ তাই সমগ্র জগৎ ও জীবনের বিকাশের ধারার সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছেন। "শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন করে ব্যক্তির জীবনকে ভিতর থেকে বিকশিত করে তোলা, যাতে সে বিশ্বজগতের মূল সর্বব্যাপী চেতন শক্তির সঙ্গে নিজেকে এক করে দেখতে পারে। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির বিভিন্ন বস্তু ও ক্রিয়ার মধ্যে যে ঐক্য ও পরস্পর-নির্ভরতা রয়েছে তা জানতে পারাই হচ্ছে সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতিকে ব্যাখ্যার উপায়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মনকে এমন করে বিস্তার ও বিকশিত করা, যাতে সে এই পরস্পর-সংযুক্ত ঐক্যের ক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে নিজের একাত্মতা বোধ করতে পারে।[২২]

ফ্রোএবেল্এর সমগ্রদৃষ্টি থেকেই তাঁর শিক্ষাপ্রণালীর একটি সূত্রও আমরা পাই। শিক্ষার প্রণালী এমন হওয়া চাই যাতে মানুষের সমস্ত শক্তি, ইচ্ছা, অনুভূতি, ক্রিয়ার সুসমঞ্জস সম্পূর্ণ বিকাশ ও পরিণতি ঘটতে পারে। প্রচলিত যে শিক্ষাপ্রণালী, যা শুধু মুখস্থ করা বা বিচ্ছিন্ন কতকগুলি কার্যে নিপুণতা অর্জনের উপর জোর দেয়, তা শুধু অসম্পূর্ণ নয়—তা হানিকরও বটে, এবং সর্বথা পরিত্যাজ্য।[২৩]

---

[২১] F. Eby, *The Development of Modern Education*, pp. 502-3.

[২২] Monroe, *A Brief Course in the History of Education*, p. 332.

[২৩] E. Eby, *The Development of Modern Education*, p. 503.

ফ্রোএবেল্‌এর দর্শনের ভিত্তি বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর পরিচিতি। ভাষাতত্ত্ব, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, ধাতু-বিজ্ঞান, বিশেষতঃ স্ফটিক-বিজ্ঞানেও তিনি একই ঐক্যের সূত্রের নিশ্চিত সন্ধান পেয়েছিলেন।

এই ঐক্যের সূত্রের পরিপূরক হিসাবে আর দুইটি সূত্রও তাঁর বিজ্ঞান আলোচনার ফল হিসাবে তিনি বিশ্বাস করেছেন ; এ দুটি সূত্র হচ্ছে অবিচ্ছিন্নতা ও ক্রমবিকাশ।

তিনি বিশ্বাস করেছেন সৃষ্টির মধ্যে বিভিন্ন স্তর আছে কিন্তু প্রত্যেকটি স্তরই তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অন্যান্য সমস্ত স্তরের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত। মানুষের বেলায়ও এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। বাল্য, শৈশব, কৈশোর, যৌবন—মানুষের জীবনের এ সব স্তর পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নয়। ইতিপূর্বে প্লেটো বা রুশো জীবনের প্রত্যেক স্তরকে যেন এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অবস্থা হিসাবে ধারণা করেছেন এবং প্রত্যেক স্তরের জন্যে আলাদা আলাদা শিক্ষার বিষয় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু ফ্রোএবেল্ বললেন, "মানুষের বিকাশের বিভিন্ন স্তর, যথা বাল্য, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, অথবা স্ত্রী বা পুরুষে ভেদকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন বলে মনে করা নিতান্তই ভ্রম ; শিশুকে তার পূর্বের ও পরের অন্য সমস্ত বিকাশের স্তরের সঙ্গে সংবদ্ধ করে, এবং অন্যান্য সমস্ত স্তরের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ধারায় যুক্ত করে দেখতে হবে। সে বিকাশের ধারায় কোন ছেদ নেই, কোন ফাঁক নেই। প্রত্যেক পরবর্তী স্তরের সবল ও সম্পূর্ণ বিকাশ পূর্ববর্তী সমস্ত স্তরের সবল ও সম্পূর্ণ বিকাশের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর-শীল। কোন একটা নির্দিষ্ট বয়স হয়েছে বলেই কেউ বালকত্ব বা যৌবন লাভ করে না—তার পূর্বের সমস্ত স্তরগুলি অতিক্রম করে দেহ ও মনে ও অনুভূতিতে উপযুক্ত পরিণতি লাভ করলেই কেবল মাত্র সে বালকত্ব বা যৌবন লাভ করেছে একথা বলা যায়। বালকত্ব, কৈশোর, যৌবন ইত্যাদি প্রত্যেক স্তরে উপযুক্ত পরিণতি লাভ করার প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য কিছু করণীয় নেই।"[২৪] ফ্রোএবেল্‌এর শিক্ষানীতিতে এই অবিচ্ছিন্নতার সূত্রের দুটি ব্যবহার উল্লেখযোগ্য—(১) মানুষের জীবনে বুদ্ধি, কল্পনা, অনুভূতি, ইচ্ছা ইত্যাদি বিচ্ছিন্ন ক্রিয়া নয়। শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার কালে তার সমস্ত শক্তিকেই উদ্বুদ্ধ করতে হবে। (২) শিশুর শিক্ষণীয় বিষয়গুলি বিচ্ছিন্ন ও পৃথক নয়। শিক্ষার অর্থ হোল প্রত্যেকটি বিষয়ের সঙ্গে অন্য সমস্ত বিষয়ের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ও মূলগত ঐক্য অনুধাবন করা। শুধু তাই নয়, এ

২৪ Froebel, *The Education of Man.*

বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা জীবন ও সমাজের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত ও সমঞ্জস করতে হবে। "মানুষের শিক্ষার পক্ষে প্রয়োজন,—ধর্ম, প্রকৃতি ও ভাষা ও তাদের পরস্পর সম্পর্ক সম্বন্ধে সুশৃঙ্খল জ্ঞান। এই জ্ঞান ও তাৎপর্যবোধ ব্যতিরেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষা স্বতঃবিরুদ্ধ ও অর্থহীন হয়ে পড়ে।"[২৫]

সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে একটা ক্রমবিকাশের ধারা আছে এবং এ ধারা জীবজগৎ ও জড়জগৎ দুইএর বেলায়ই সত্য। তিনি ডারউইনের পূর্ববর্তী, কিন্তু লামার্কের চিন্তার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল এবং সামগ্রিক ক্রমবিকাশবাদে (organic evolution) তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। সমগ্র বিশ্বজগৎ এক জীবন্ত ঐশীশক্তির ক্রমবিকাশ, তাঁর এই ধারণাটি না বুঝলে, তাঁর শিক্ষাদর্শের অনেক অংশ অবোধ্য থেকে যাবে। তাঁর এ ধারণার জন্যে তাঁকে অনেক সময় বিশ্বেশ্বরবাদী (pantheist) বলা হয়। কিন্তু এ কথা তিনি নিজে স্বীকার করেন না। জগতের সর্বজীবে, সর্ববস্তুতে ভগবান বিরাজমান, এ কথা তিনি স্বীকার করেন কিন্তু জগৎ ও ভগবান্ অভিন্ন, এ কথা তিনি মনে করেন না। ভগবান্ সম্বন্ধে তিনি কবির মতই বিশ্বাস করেন, "তোমার সৃষ্টির চেয়ে তুমি যে মহৎ।" সসীমের মধ্যেই অসীমের প্রকাশ, এ কথা সত্য কিন্তু অসীম সসীমের সমষ্টি মাত্র নয়। তাই তাঁর মতকে জগদতিরিক্ত ঈশ্বরবাদ (Panentheism) বলাই উচিত। এ বিষয়ে তিনি হেগেলের সমগোত্রীয়। যাক, তাঁর ক্রমবিকাশবাদে ফিরে যাওয়া যাক। তিনি মানুষকে তুলনা করেছেন জলধারা-সেবিত উর্বর ক্ষেত্রে রোপিত চারাগাছের সঙ্গে। অন্তর্নিহিত অদৃশ্য শক্তির তাড়নায় বীজ হতে সবুজ অঙ্কুর দেখা দেয়, তা বেড়ে ওঠে; দু'চারটি পাতা দেখা দেয়—শেষে আরো বেড়ে কত ডালপালা, ফুলফলে বিকশিত হয়। এ বাড়াটা বাইরের তাগিদে নয়—ভিতরের নিজস্ব স্বাভাবিক নিয়মে। ফ্রোএবেল্‌এর মতে এই অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের ধারা জীব ও অজীব জগতের বেলায় যেমন সত্য, মানসিক ও আত্মিক জগতের পক্ষেও সমান সত্য। সর্বত্র সহজ থেকে জটিলে ক্রমবিকাশের অবিচ্ছিন্ন গতি। এ গতির মধ্যে আছে বিপরীতের সংঘর্ষ (the law of contraries or the law of opposites)। হেগেল্‌ও বলেছেন ডায়ালেক্‌টিক্ বা বৈপরীত্যের সংঘর্ষের ফলে সাম্যাবস্থার নীতির (thesis—antithesis—synthesis) কথা। ফ্রোএবেল্‌এর মধ্যে এ রীতি শুধু ভাব ও

[২৫] Froebel, *The Education of Man.*

চিন্তার নীতি নয়, সমগ্র স্থষ্টির নীতি।[২৬] হেগেলের মতে বহির্জগৎ শুদ্ধভাবের প্রকাশ (pure thought) মাত্র, জড়বাদীদের মতে ইহা জড়বস্তু ও শক্তির প্রকাশ। ফ্রোএবেল্ এই দুই মতের কোন্‌টিই গ্রহণ করেন না। তিনি বিশ্বাস করেন, সমগ্র জগৎ একটি জীবন্ত ক্রমবিকাশমান সত্তা, যা একদিকে জড়জগতে আর একদিকে ভাবজগতে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রসারিত।[২৭]

ক্রমবিকাশের ধারায় মানুষ এসেছে সকলের পরে। এখানে দেখা যায় দৈহিক ও মানসিক শক্তির সুসমঞ্জস পরিণতি। মানুষের মধ্যে মূল অধ্যাত্মশক্তি আত্ম-সচেতনতা লাভ করেছে। এখানে দেখা যাচ্ছে স্থষ্টির গতির পরম উৎকর্ষ। মানুষ কার্যকারণের অমোঘ শৃঙ্খলের দাস নয়—সে স্বয়ং স্রষ্টার স্বাধীন ইচ্ছা, স্বাধীন ক্রিয়ার, বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী।

তাই মানুষ যখন আপনাকে ভাল করে জানে তখন সে জানে শিশুকে কি করে সম্পূর্ণ করে সুসমঞ্জসভাবে বিকশিত করে তুলতে পারবে। এ বিষয়ে সে শুদ্ধ অন্ধ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে না, পরিণত স্বচ্ছ বুদ্ধির দ্বারা শিক্ষার ব্যবস্থাকে সে পরিচালনা করতে সক্ষম। কিন্তু মানুষ আজ যা হয়েছে এখানেই তার পূর্ণতা শেষ নয়, সে পূর্ণতর পরিণতির অপেক্ষা রাখে। ক্রমবিকাশের ধারা মানুষে এসেই থেমে যায় নি—আরো উচ্চতর সম্ভাবনার ইঙ্গিত রয়েছে এর উর্ধ্বগতিতে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সামগ্রিক ক্রমবিকাশ-নীতির ব্যবহার ফ্রোএবেল্ ও আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর বিশেষত্ব। শিশুর ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক ধারা অনুসরণ করেই শিক্ষা অগ্রসর হবে। কতকগুলি নির্দিষ্ট জ্ঞান শিশুকে শিখিয়ে দিতে হবে, ফ্রোএবেল্ এ প্রাচীন প্রণালীর সম্পূর্ণ বিরোধী। শিশু নিজ অন্তর্নিহিত শক্তি, আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন নতুন বিষয় নিজ আগ্রহেই আয়ত্ত করবে। শিক্ষকের তাড়নায় নিতান্ত কুইনিন্ গেলার মত মুখস্থ করে শেখাকে শিক্ষা নাম দেওয়াই চলে না। এটা অস্বাভাবিক, সময় ও শক্তির অপব্যয়, এবং শিক্ষার বিকাশের ধারার পক্ষে ক্ষতিকর। শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা যাতে স্বাভাবিক তৃপ্তিলাভ করে—যাতে তা রুদ্ধ বা বিকৃত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য।

শিক্ষা হবে স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া—তাতে থাকবে আবিষ্কারের আনন্দ, পরীক্ষার

[২৬] F. Eby, *The Development of Modern Education*, p. 505.

[২৭] Froebel, *The Education of Man*, p. 17.

আনন্দ, সৃষ্টির আনন্দ। রুশোর এই নতুন শিক্ষানীতি নতুন মর্যাদা পেল ফ্রোএবেল্‌এর শিক্ষাপ্রণালীতে। শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশ এবং "এর উপায় প্রাণহীন অনুকরণ নয়, এর উপায় স্বতঃস্ফূর্ত ঔৎসুক্য ও আত্মানুশীলন··· মানবজাতির একজন হিসাবে, এবং ভগবানের সন্তান হিসাবে, সমগ্র মানবজাতির প্রাণকোষ সঞ্জীবিত হয় প্রত্যেক মানুষের মধ্যে। কিন্তু এই মানবতার প্রকাশ প্রত্যেক মানুষে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং প্রত্যেক ব্যক্তির এই স্বকীয়তার সম্পূর্ণ বিকাশ দ্বারা শিক্ষাপ্রণালীর সাফল্য নির্ণীত হবে।"[২৮]

এই স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহের পথে শিক্ষা মানে উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, খেয়ালখুশি মত চলা নয়। বিচ্ছিন্ন একটি প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষার দ্বারা সম্পূর্ণ ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের বিকাশ লাভ হতে পারে না। শিক্ষকের এদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে শিক্ষাক্রিয়ার মধ্যে শিশুর সমগ্র সত্তা সক্রিয় হয়ে বিকাশ লাভ করতে পারে।

এ ব্যক্তিত্বের বিকাশ সমাজের জীবন্ত পটভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সম্ভব নয়। ব্যক্তি ও সমাজ বিপরীতও নয়, বিচ্ছিন্নও নয়। "অন্য মানুষের সঙ্গে যুক্ত হয়েই মানুষের শিক্ষা সম্ভবপর। প্রত্যেক সামাজিক প্রতিষ্ঠানই ব্যক্তির সম্পূর্ণ বিকাশের পটভূমিকা, তার প্রয়োজনীয় প্রেরণা ও উপাদান জোগায়। স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে শিশু তার পরিমণ্ডলের জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়—বৃহৎ ঐক্যের বন্ধনটি আবিষ্কার করে। ব্যক্তি সে পরিমাণেই সার্থক ও সুবিকশিত, যে পরিমাণে সে বৃহৎ সমাজের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও ক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে। তার চরিত্রের দৃঢ়তা সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষ ও সহযোগিতার মাধ্যমেই আসে।[২৯]

শিশু যখন স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে ও আগ্রহে শেখে তখনই সে চায় নতুন সৃষ্টি করতে, নতুন পরীক্ষা করতে। শিশু তার মনের মধ্যে নানা ছবি, নানা স্মৃতি নতুন নতুন ভাবে সাজায়, ভাঙ্গে, গড়ে। সে তেমনি তার চারপাশের দ্রব্য ও ঘটনা সম্বন্ধে স্বভাবতঃই উৎসুক, সেখানেও সে নাড়াচাড়া করতে চায়, পরিবর্তন করতে চায়, নতুন করে ভাঙতে গড়তে চায়। এটা জীবনের ধর্ম। কাজেই এটা শিক্ষারও ধর্ম। "যেহেতু ভগবান মানুষকে নিজ মূর্তিতেই সৃষ্টি করেছেন কাজেই ভগবানের মত মানুষও সৃষ্টি করবে, নতুনের জন্মদান করবে। মানুষের সমস্ত কর্ম, সমস্ত শ্রম, সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষার অন্তর্নিহিত গূঢ় তাৎপর্য এই।[৩০]

---

২৮ Froebel, *Education of Man*, p. 16.

২৯ Graves, *Great Educators of Three Centuries*, p. 214.

৩০ Froebel, *Education of Man*, p. 23.

শিক্ষার ক্ষেত্রে হাতের কাজের প্রয়োজনীয়তা ও তার বিশেষ মূল্য দার্শনিক যুক্তি ছাড়া মনস্তাত্ত্বিক যুক্তির উপরও নির্ভর করে। "মানুষের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সাধনের উপায় হিসাবে এ হাতের কাজের যথেষ্ট দাম আছে। এমন কি, শিশু-কালেও সে কতটা বাইরের থেকে গ্রহণ করল ও আয়ত্ত করল, তার চেয়েও বেশী মূল্যবান হচ্ছে সে নিজে কি সৃষ্টি করল, নিজেকে কতটা প্রকাশ করতে পারল। তার চিন্তা ও বাক্যের মধ্যে দিয়ে নূতন সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, নমনীয় উপাদান দিয়ে বিভিন্ন বস্তু ও জীবনের রূপায়ণ, শুধুমাত্র মুখস্থের মধ্য দিয়ে বাক্য আহরণের চেয়ে, তার বিকাশ ও পরিণতির পক্ষে অনেক বেশী উপযোগী।[৩১]

ফ্রোএবেল্এর শিক্ষানীতিতে প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। এর কারণ ফ্রোএবেল্এর মতে গাছপালা, পাথর, ধাতু, সকলের মধ্য দিয়েই একই ঐক্যের সূত্র প্রসারিত—বাহ্যজগৎ অন্তর্জগৎকে জানতে ও বুঝতে সাহায্য করে। বাহ্য প্রকৃতির দ্রব্য ও ঘটনা সর্বব্যাপী ঐশী-শক্তির প্রতীক, সেই মূলগত এককে শিশুর মনে প্রতিভাত করবার উপায়। "প্রকৃতি ভগবানের সৃষ্টি, ভগবানের প্রকাশ"—ছোট শিশুও এ কথা বিশ্বাস করে। প্রকৃতি রহস্যময়, ইঙ্গিতময়; তাই তার মন প্রাকৃতিক দ্রব্য ও ঘটনার প্রতি স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয়। প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনের শ্রেষ্ঠ উপায় বিজ্ঞান আলোচনা। আর সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান হচ্ছে অঙ্কশাস্ত্র, যা বিশুদ্ধ প্রতীকের বিজ্ঞান, যেখানে ঈশ্বরের সুশৃঙ্খল নিয়মিততা সবচেয়ে নির্ভুল ভাবে প্রকট। "যেমন আত্মা ও ধর্ম অবিচ্ছেদ্য, তেমনি অবিচ্ছেদ্য মানুষের মন ও অঙ্কবিজ্ঞান"…"ভগবান্ হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ অঙ্কশাস্ত্রবিদ্"—"অঙ্কই হচ্ছে জীবনের নিয়মের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।"[৩২]

শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতীকের ব্যবহার (symbolism) ফ্রোএবেল্এর শিক্ষানীতির আর একটি বৈশিষ্ট্য। তাঁর মনে প্রকৃতির সমস্ত দ্রব্য ও ঘটনাই অন্তর্নিহিত ও সর্বব্যাপী ঐশীশক্তির প্রতীক। শিশুর মন সহজেই এ কথা জানে। ফুল শুধু কয়টি পাপড়ি, পরাগ, কেশর, বর্ণ ও গন্ধের সমষ্টি মাত্র নয়—তার গূঢ়তর তাৎপর্য আছে। ফুল ভগবানের বিশেষ একটি বাণী বহন করে এনেছে,—সে বাণী শোনবার কান থাকা চাই। সে কান, সে বোধ, সে সহজ অনুভূতি শিশুর থাকে, যদি না তাকে কুশিক্ষার দ্বারা বিকৃত করে তুলি। শিশুর জগৎ কল্পনার জগৎ,

---

৩১ Froebel, *Education of Man*, § 94.

৩২ F. Eby, *The Development of Modern Education*, pp. 522-23.

—প্রতীকের জগৎ। তার কাছে একটি লাঠি হচ্ছে ঘোড়া, কয়েকটি কাঠের চৌকো টুকরো হচ্ছে রেলগাড়ী। ফ্রোএবেল্‌এর বিশেষ অবদান হোল শিশুমনের এই ইঙ্গিতপ্রিয়তাকে নানা খেলনা, নানা খেলা, নানা গল্প ও গানে কাজে লাগানো। অন্য কোন কারণে না হোক, এ মৌলিক ও আনন্দময় আবিষ্কারের জন্যই অন্ততঃ, ফ্রোএবেল্ শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

তিনি শিশুর মানসিক বিকাশের স্তর অনুযায়ী এবং জগতের মৌলিক নিয়মগুলির প্রতীক হিসাবে, ছয়টি উপহার (gifts) ও বহুসংখ্যক শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ আকর্ষণকারী হাতের কাজ (occupations) আবিষ্কার করেছেন।

প্রথম উপহার হচ্ছে ছটি নানা রংএর উলের গোলক বা বল (ball)। গোলক হচ্ছে ঐক্য ও সুসামঞ্জস্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। গোলক তাই ঈশ্বরের প্রতীক—যিনি সমস্ত ঐক্য ও সমস্ত নিয়মিততার কেন্দ্র। গোলক বা ball হচ্ছে—"b—All"।[৩৩] তাই বল হচ্ছে সর্বদেশে সর্বকালে শিশুর সর্বাধিক প্রিয় খেলনা। শিশু এর মধ্যেই বিশ্বের ঐক্যের নিয়ম ও গতির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে। ফ্রোএবেল্ তাঁর উপহারগুলি যথেচ্ছ ব্যবহার করতে দেন না। উপযুক্ত ঔৎসুক্য, উপযুক্ত শ্রদ্ধা, উপযুক্ত পরিণতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে এগুলি ব্যবহার করতে হবে। এ খেলা নিতান্ত খেলা নয়, এ যেন গোপন মন্ত্রোচ্চারণ (esoteric rite)। ফ্রোএবেল্‌এর খেলা, খেলনার এই রহস্যঘনতা (mysticism) নিয়ে অনেকে কঠিন সমালোচনা করেছেন। অবশ্য এ খেলা, খেলনার মনস্তাত্ত্বিক দিকও আছে। সে দিক থেকে বলা যায় নানা বর্ণের ও আকারের গোলক নানা দিকে গড়িয়ে খেলা করে, আনন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, শিশুর মনে আকার, বর্ণ, উপাদান, গতি, দিক ও পেশীসঞ্চালনবোধ জাগ্রত হয়, তার মন দ্রব্যের এসব গুণপরীক্ষায় উৎসুক হয়। দ্বিতীয় উপহার হচ্ছে কাঠের তৈরি গোলক, কিউব (cube) ও সিলিণ্ডার। এখানে শিশু তার পূর্বপরিচিত গোলকের সঙ্গে তুলনা করে নতুন ছটি আকারের পার্থক্য ও মিল বুঝতে পারে। বল গড়ায়, কিউব স্থিতিশীল, বলের একটি মাত্র তল (surface), কিউবের তল ছটি। কিন্তু ছটিই ঘনত্ব গুণসম্পন্ন (solids)। আবার সিলিণ্ডারে বল ও কিউবের সমন্বয়। এখানে পূর্বোল্লিখিত বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে সমন্বয় (law of opposites) ক্রিয়া করছে।

তৃতীয় 'উপহার' হচ্ছে একটি কাঠের ঘনক (cube)কে আটটি সমান ছোট

[৩৩] F. Eby, *The Development of Modern Education*, p. 526.

ঘনকে খণ্ডিত করা। এগুলি দিয়ে চেয়ার, সিংহাসন, দরজা, সিঁড়ি ইত্যাদি তৈরি করতে পারা যায়। শেষ তিনটি 'উপহারে'ও ঘনককে নানাভাবে ভাগ করে ঘনবস্তুর নানা রূপ, বিভাগ ও পরস্পর সম্বন্ধের জ্ঞান শিশুর মনে জন্মাতে সাহায্য করে। এর থেকেই জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি ও নানা রূপগঠনে শিশু উৎসাহিত হয়। ফ্রোএবেল্ পরবর্তী কালে তল (surfaces), রেখা (lines), বিন্দুর (points) ধারণা জন্মানোর সহায়ক আরো তিনটি উপহারও আবিষ্কার করেছিলেন।[৩৪]

হাতের কাজগুলি (occupations) উপহারগুলির মধ্য দিয়ে যে ধারণা শিশুর মনে জন্মাল তাদের রূপায়ণ ও বাস্তব ব্যবহার। এই দুই জাতীয় উপাদান ও ক্রিয়া এমনি অচ্ছেদ্যবন্ধনে যুক্ত যে, তাদের মধ্যে পার্থক্যটা অনেক সময় অযৌক্তিক। উপহারগুলিতে নির্দিষ্ট রূপ বা আকারগুলিকে বিভিন্নভাবে সাজানো হয়, কিন্তু 'হাতের কাজ'গুলিতে উপাদানগুলিকে হাতের নিপুণ ক্রিয়ার দ্বারা রূপান্তরিত, পরিবর্তিত করা হয়। কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতিতে উপহারগুলির সঙ্গে পরিচিতির চেয়ে ক্রমশঃ হাতের কাজের উপর বেশী জোর দেওয়া হচ্ছে। এ হাতের কাজগুলি হচ্ছে—কাদা, বালি, কাঠ, করাতের গুঁড়ো দিয়ে নানা জিনিস গড়ে তোলা, এতে ঘনবস্তুর সঙ্গে পরিচয় নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ হয়। আবার কাগজের কাজ, মাদুর বোনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে 'তল' সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হয়। এতে শিশুর উদ্ভাবনী শক্তি উৎসারিত হয়, হস্তসঞ্চালনে দক্ষতা বাড়ে, গঠনক্রিয়ার আনন্দের মধ্য দিয়ে শিশু নিজ শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং বহুর সঙ্গে মিলে কাজ করবার শিক্ষাও লাভ করে। আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি এই ক্রিয়া ও গঠনের মধ্য দিয়ে শিক্ষাকে ক্রমশঃই অধিকতর মর্যাদা দিচ্ছে। এ সব কৃত্রিম হাতের কাজ ছাড়া বাগান তৈরি, পশুপালন, ছোট ঘরবাড়ী তৈরি বা মেরামত ইত্যাদি সত্যিকারের কাজও কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতির অঙ্গ।[৩৫]

ফ্রোএবেল্এর আর একটি নূতন আবিষ্কার হচ্ছে শিশুদের মনোলোভন ছড়া, ছবি ও গান। তিনি সাতটি মায়ের গান (Mother Songs), আর পঞ্চাশটি খেলার গান (Play Songs) তাঁর কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বলে মনে

---

৩৪ Wiggin & Smith, *Froebel's Gifts.*
Froebel, *Pedagogies of the Kindergarten*, Tr. Jarvis.
Kraus Bolte, *Kindergarten Guide*, Vol. I.

৩৫ Wiggin & Smith, *Froebel's Occupations.*

করেন। এই গানগুলির সঙ্গে আছে ছবি, আর এগুলি গাইবার কালে উপযুক্ত নাচ বা অন্যপ্রকার সুদৃশ্য অঙ্গসঞ্চালন আছে। এই গান ও খেলাগুলি সযত্নে শিশুর বিকাশের স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি। মায়ের গানগুলি হচ্ছে একেবারে শিশুকালের জন্যে। এতে মায়ের আশা, আকাঙ্ক্ষা, শিশুর প্রতি ভালবাসার প্রকাশ আছে। শিশু মার সঙ্গে সঙ্গে এ সব গানের সুরে গা দোলাবে, নাচবে, হাততালি দেবে—তাতে মায়ের আনন্দ ও শিশুর আনন্দ এক হয়ে স্বর্গীয় শোভার সৃষ্টি করবে —শিশু ও মায়ের মধ্যে গভীর বন্ধন গভীরতর হবে। খেলার গানগুলির মধ্যে তিনটি অঙ্গ আছে—(১) মায়ের জন্য একটি নীতিবাক্য (motto); (২) ছড়া ও সুর—এ গানটি শিশুর কাছে গাইতে হবে; (৩) ছড়াটিকে ছবিতে প্রকাশ। প্রত্যেক গানের সঙ্গেই সহজ ও সুদৃশ্য অঙ্গসঞ্চালন আছে এবং তা শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের স্তর অনুযায়ী।

বিষয়বস্তু অনুযায়ী খেলার গানগুলিকে চারটি দলে ভাগ করা যায়—(১) একেবারে শিশুকালের উপযোগী, এগুলিতে আছে শিশুর যথেচ্ছ অঙ্গসঞ্চালন; (২) আর একটু বড়দের জন্য—এখানে বিভিন্ন দ্রব্যের সঙ্গে পরিচয়, দ্রব্যগুলি তাদের সংখ্যা, রূপ ও আয়তন অনুযায়ী শ্রেণীবিভক্ত; (৩) আকাশের জ্যোতিষ্ক—রবি-শশী-তারা নিয়ে লিখিত, তাদের সঙ্গে শিশুকে পরিচিত করানো এবং শিশুর কল্পনা, বিস্ময় ও ঐক্যবোধ উদ্বুদ্ধ করা এ গানগুলির উদ্দেশ্য। এগুলি আরো বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের জন্যে; (৪) নীতিবোধ জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক গান—এ গানগুলি সবচেয়ে বড় ছেলেমেয়েদের জন্যে।[৩৬]

প্রাচীনপন্থীদের কাছে খেলা আর পড়া হচ্ছে পরস্পরবিরোধী। কিন্তু ফ্রোএবেল্‌এর সময় থেকে নব্য শিক্ষকেরা এ অদ্ভুত কথা বলতে সুরু করেছেন—খেলার মধ্য দিয়েই পড়াটা শেখা হয় ভাল। ফ্রোএবেল্ খেলাকে শেখার কাজে কি করে সুশৃঙ্খলভাবে ব্যবহার করতে হয়, তার পথ দেখালেন। খেলা সম্পর্কে তাঁর মত তাঁর শিক্ষাদর্শ অনুসারী। শিক্ষার প্রধান উপায় শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও ক্রিয়া, আর খেলার চেয়ে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দময় স্বাভাবিক ক্রিয়া শিশুর পক্ষে আর কি আছে? ফ্রোএবেল্ বলছেন, "খেলা হচ্ছে শিশুর বিকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ দিক—এই স্তর মানবমনের বিকাশের শ্রেষ্ঠ দিক; কারণ অন্তরের নিজস্ব প্রয়োজন ও আবেগ অনুযায়ী, অন্তর-জগতের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশই হচ্ছে শিশুর খেলা। শৈশবে

৩৬ Graves, *Great Educators of Three Centuries*, p. 217.

খেলাই হচ্ছে সবচেয়ে নির্মল, সবচেয়ে আত্মিক ক্রিয়া····· খেলার থেকে শিশু পায় আনন্দ, মুক্তি, সন্তুষ্টি, অন্তর ও বাহিরের সম্পূর্ণ শান্তি, সমস্ত জগতের সঙ্গে প্রীতি। যে শিশু স্বভাবের ধারা অনুযায়ী—স্বতঃক্রিয় সংকল্প নিয়ে দৈহিক ক্লান্তি না আসা পর্যন্ত নিজেকে সম্পূর্ণ করে খেলার মধ্যে বিস্তার করে দিতে পারে—সে শিশু ভবিষ্যতে দৃঢ়সংকল্প মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে, নিজের ও পরের কল্যাণার্থ সে চূড়ান্ত স্বার্থত্যাগে সমর্থ হবে। শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত খেলার মধ্যেই ভবিষ্যৎ মানুষটির অন্তরের প্রকৃত পরিচয় মেলে। শিশুকালের খেলা হচ্ছে মানব-বৃক্ষের কচি কিশলয় যা ভবিষ্যতে বিশাল মহীরূহের রূপটি নির্মাণ করে দেবে।”[৩৭]

চিত্রাঙ্কনকেও ফ্রোএবেল্ শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়ার সুন্দর উদাহরণ বলে মনে করেন এবং শিক্ষার কাজে এ আগ্রহকে সুশৃঙ্খলভাবে ব্যবহারের পন্থাও তিনি নির্দেশ করে দিয়েছেন। “মানুষ যা আঁকতে পারে বা যা করতে পারে, তাকে সে বুঝতে পারে।” এতে শুধু রেখা ও বর্ণের জ্ঞানই হয় না, এতে প্রতীক-সাহায্যে বিশুদ্ধ চিন্তার (reflection) অভ্যাস গঠিত হয়।[৩৮]

নৃত্য ও ছন্দ অনুরূপ কারণেই শিশুশিক্ষার সহায়ক, “শিশু হচ্ছে ছন্দোময় দেহে ছন্দোময় আত্মা, যা জন্ম নিয়েছে ছন্দোময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে।” ছন্দ হচ্ছে ভাষা ও সঙ্গীতের প্রাণ। এর মধ্য দিয়ে দৃঢ়তা, সুসমতা, সংযম, সৌন্দর্যবোধ ইত্যাদি নৈতিক গুণের বিকাশ ঘটে। ছন্দোময় নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গীতের সম্বন্ধ অত্যন্ত নিকট।[৩৯]

ফ্রোএবেল্‌এর শিক্ষাপ্রণালীতে গল্প বলার মূল্যও সামান্য নয়। শিশুর শুধু বুদ্ধিরই প্রয়োজন নয়, তার কল্পনা ও অনুভূতিরও সুষম বিকাশ চাই। শিশুর জীবনে নানা রূপকথা, কাহিনীর দাম যথেষ্ট। এতে অতীতের ঔৎসুক্য জাগ্রত হয়, ইতিহাস-পাঠে উৎসাহ বাড়ে। দেহের পক্ষে যেমন খেলা, মনের পক্ষে তেমনি গল্প। অবগাহন স্নানে দেহের যেমন তৃপ্তি, মনের পক্ষে গল্পেও তেমনি তৃপ্তি। এতে বুদ্ধিও তার শক্তি অনুভব করে; অনুভূতি ও ধারণা দুইএরই পরীক্ষা হয় গল্পে।[৪০]

---

৩৭ Froebel, *Education of Man*, pp. 54-55.
৩৮ ,, ,, ,, ,, p. 79.
৩৯ F. Eby, *The Development of Modern Education*, p. 519.
৪০ Froebel, *Education of Man*, p. 307.

রুশোর মত ফ্রোএবেল্‌ও বিশ্বাস করেন যে শিশু স্বভাবতঃ সৎ, নীতিপরায়ণ ও জ্ঞানলাভেচ্ছু, তার কারণ ভগবানের ঐশী নৈতিক শক্তি অবিকৃতভাবে শিশুর মধ্যে ক্রিয়া করে। সুতরাং শৈশবে জোর করে শেখানোর তিনি সম্পূর্ণ বিপক্ষে। সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে শিশুকে গড়ে উঠতে দিলে, তার বিকাশের স্বাভাবিক ধারা অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করলে, শিশু সুষম, সুন্দর মানুষে পরিণত হয়। মানুষের দোষগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার স্বাভাবিক সদ্‌গুণেরই বিকার। উপযুক্ত সময়ে, উপযুক্ত সুযোগের অভাবে, উপযুক্ত শিক্ষার ত্রুটিতে, সেই সদ্‌গুণের বিকার ঘটে। কাজেই তার সংশোধন করতে হলে, শিশুর সেই স্বভাবজ সদ্‌গুণগুলির সন্ধান করতে হবে এবং উপযুক্ত শিক্ষাদ্বারা তাদের সহজ বিকাশের রুদ্ধপথ উন্মুক্ত করে দিতে হবে।[৪১] এখানেই শিক্ষকের মস্ত দায়িত্ব, এখানেই তাঁর প্রধান কৃতিত্ব। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ বিকৃতির মূল কারণ হচ্ছে মাতার অবহেলা ও কুশাসন। তাই শিক্ষাসংস্কারের প্রধান কাজ হচ্ছে সুমাতা সৃষ্টি করা। ফ্রোএবেল্ তাঁর পরিণত বয়সে মা ও শিক্ষিকাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়াই তাঁর প্রধান কাজ মনে করেছিলেন।

ফ্রোএবেল্‌এর এ মত থেকে এটা সহজেই অনুসরণ করে যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে শারীরিক পীড়ন, শাস্তি ও তাড়নার স্থান অত্যন্ত সংকীর্ণ। নির্দয় শিক্ষকের মমতাশূন্য তাড়না শিশুর আত্মসম্মানকে আহত করে, তাকে ভীরু ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ করে তোলে—তার স্বাভাবিক সহজ বিকাশের পথ রুদ্ধ করে। শিশুর প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা অবাঞ্ছিত পথে ধাবিত হলে, শিক্ষক সে শক্তিকে মঙ্গলময় পথে পরিচালিত করবেন—তাড়না দ্বারা, বাইরের দৈহিক শক্তি দ্বারা তার প্রকাশের পথ সবলে রুদ্ধ করলে সুফলের পরিবর্তে কুফলেরই সম্ভাবনা। শিক্ষকের সহৃদয় সতর্ক দৃষ্টি, তাঁর চরিত্রের মহৎ দৃষ্টান্ত শিশুকে সংশোধনের শ্রেষ্ঠ উপায়।[৪২]

এ কথাই কি তবে মানতে হবে যে শিশুর বিকাশের ধারা পূর্বনির্দিষ্ট? অদৃষ্টবাদীর মত তবে এ কথাই কি বলতে হবে,—"যা হবার তাই হবে।" জড়জগতে যেমন অমোঘ কার্যকারণের নীতি, মানুষের বেলায়ও কি তাই? অর্থাৎ তা'হলে মানুষের চেষ্টা, উদ্যম, শিক্ষাপরিচালনা সম্পূর্ণই অর্থহীন? শিক্ষকের কাজ "শুধু চেয়ে থাকা, শুধু ঢেউ গোনা?" ফ্রোএবেল্ কিন্তু তাঁর শিক্ষাদর্শের এ রকম ব্যাখ্যা

---

৪১ Froebel, *Education of Man*, pp. 121-22.
৪২ Graves, *Great Educators of Three Centuries*, p. 222.

সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তাঁর মতে মানুষের শ্রেষ্ঠ বিকাশ তার স্বাধীন ইচ্ছায়। মানুষ ভগবানের প্রতিকৃতি। স্বাধীন ইচ্ছা, মূল্যবিচার, দায়িত্ববোধ সুগঠিত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার শেষ উদ্দেশ্য হবে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ ও সুসমঞ্জস বিকাশ। শিশুকে এমনি করেই স্বভাবের পথে চালিত করতে হবে যাতে সে স্বাধীন ব্যক্তিত্ব লাভ করতে পারে। তাই শিক্ষকের কাজ সম্পূর্ণ নেতিবাচক নয়। শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের ধারার দিকে। যখন শিশুর দেহমন বিশেষ একটি ক্রিয়ার উপযুক্ত পরিণতি লাভ করেছে তখন তার সামনে উপযুক্ত শিক্ষার বিষয়টি ধরে দেওয়া, তার স্বাভাবিক আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে তাকে আরো অগ্রসর করে দেওয়া, তার সামাজিক প্রকৃতি ও রুচির গতি পরিবর্তন করিয়ে দেওয়া, শিশুর ইচ্ছা, আকাজ্ক্ষা, বুদ্ধি, অনুভূতির সামঞ্জস্য বিধান করা, ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে বৃহত্তর সমাজ-জীবনের স্বাঙ্গীকরণ, অর্থাৎ সহানুভূতি ও দূরদৃষ্টি, ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে চারাগাছের প্রতিটি স্তর লক্ষ্য করা, তাকে বিদ্যারূপ জলসেচনা করা, তাকে আলোর পথে, বৃদ্ধির পথে—স্বাধীনতার পথে পরিচালনা—এ সমস্তই শিক্ষকের কর্তব্য ও দায়িত্ব। এ শুধু নেতিবাচক ক্রিয়া নয়—রচনাত্মক ক্রিয়া।[৪৩]

য়ুরোপে শিক্ষার নবযুগ সুরু রুশোর থেকে। তাঁর পরে যত সংস্কারক এসেছেন সকলেই রুশোর কাছে ঋণী। শিক্ষার কেন্দ্র শিক্ষক নন,—শিশু, এই নতুন কথাটি তিনিই প্রথম জোর দিয়ে বললেন। তাই শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষকের বিদ্যা ও নৈপুণ্যের চেয়েও বড় কথা শিশুর নিজস্ব আগ্রহ, রুচি, উদ্যম। ফ্রোএবেল্‌ও রুশোর অনুবর্তী,—তিনিও বলেছেন শিক্ষা মানে স্বতঃবিকাশ—বাইরের থেকে শুধু চাপিয়ে দেওয়া নয়, ভিতরের শক্তি দ্বারাই আহরণ—পরিপুষ্টি—সম্পূর্ণ বিকাশ।

রুশোর সাথে ফ্রোএবেল্‌এর মিল যেমন আছে, প্রভেদও আছে। রুশো মূলতঃ বিপ্লবী, ধ্বংসপন্থী। কিন্তু ফ্রোএবেল্‌এর দৃষ্টি ইতিবাচক—গঠনাত্মক।

রুশোর কাছে সমাজ পৃথিবীর সমস্ত কৃত্রিমতা, সমস্ত বিকার, সমস্ত পাপের মূল। তাই শিশুকে সমাজ থেকে, সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে গড়তে হবে। ফ্রোএবেল্ এখানে সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেন। পেস্তালৎসীর মত তিনিও মনে করেন সংসার ও সমাজই শিশুর শিক্ষার সবচেয়ে স্বাভাবিক এবং সবচেয়ে

৪৩ F. Eby, *The Development of Modern Education*, pp. 511-12.

প্রয়োজনীয় পটভূমিকা। তাই মাতাই শিশুর সর্বপ্রথম এবং সর্বোত্তম শিক্ষিকা। শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য সমাজ-জীবনের সঙ্গে শিশুকে যুক্ত করা।

রুশোর মতে শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ নীতিশিক্ষার ক্ষেত্রে, শিক্ষকের ভূমিকা নেতিবাচক—তিনি শুধু দর্শক, শুধুই সাক্ষী। ফ্রোএবেল্, পেস্তালৎসী এবং আরো বেশী করে ডিউই, শিক্ষকের সুবিবেচনা, সুপরিচালনার ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি শুধু শিশুর অবাঞ্ছিত প্রবৃত্তি, ইচ্ছা ও ক্রিয়াকে বাধা দেবেন না,—তিনি সেগুলিকে সমাজকল্যাণের কাজে দিকপরিবর্তন করিয়ে দেবেন। ফ্রোএবেল্ ডিউইর মত শিক্ষাব্যাপারকে একটি সামাজিক ক্রিয়া এবং বিদ্যালয়কে একটি সামাজিক জীবনের কেন্দ্র হিসাবে দেখেছেন।

পেস্তালৎসী ফ্রোএবেল্‌কে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবান্বিত করেছিলেন তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তবে পেস্তালৎসীর প্রণালীতে শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি—তার উদ্দেশ্য এবং তার স্তরবিভাগ ইত্যাদির মধ্যে অস্পষ্টতা আছে—ফ্রোএবেল্ সে ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করেছেন। পেস্তালৎসীই প্রথম সচেতনভাবে শিশু-শিক্ষাকে মনস্তত্ত্বের ভিত্তিতে স্থাপন করতে চেয়েছেন, কিন্তু তাঁর নূতন নূতন পরীক্ষার দিকে উৎসাহ থাকলেও, মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ ছিল। এ বিষয়ে ফ্রোএবেল্, এবং এর চেয়েও বেশী সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন মন্তেসরী।

হারবার্ট এবং ফ্রোএবেল্ দু'জনেই দার্শনিক—দু'জনেই সমগ্রতার আদর্শে বিশ্বাসী ; কিন্তু হারবার্ট সমগ্রতাকে খুঁজেছেন বুদ্ধি দিয়ে, ফ্রোএবেল্ খুঁজেছেন অন্তরের অনুভূতি ও বিশ্বাসের মধ্যে। হারবার্টএর দৃষ্টি ছিল শিক্ষকের দিকে,—শিক্ষক শিক্ষার ক্ষেত্রে কিভাবে অগ্রসর হবেন—এ ছিল তাঁর সমস্যা। ফ্রোএবেল্‌এর দৃষ্টি শিশুর দিকে,—তার বিকাশের ধারা নির্দেশ করে, শিক্ষার বিষয় ও প্রণালী কি করে চালনা করতে হবে, সেই ছিল তাঁর চিন্তা। [৪৪]

ফ্রোএবেল্ ও মন্তেসরীর মধ্যে মিল অনেক বেশী নিবিড়। দু'জনেই এ কথার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন যে, শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহকে শিক্ষার কাজে লাগানোর উপরে। দু'জনেই শিশুর বিকাশের স্তর অনুযায়ী শিক্ষার বিষয় ও প্রণালী নির্ধারণের উপর খুব গুরুত্ব দান করেছেন। শিশুর দেহ ও মন যখন প্রস্তুত হবে, যখন তার স্বাভাবিক আগ্রহ জাগ্রত হবে, তখনই সে উপযুক্ত বিষয়

[৪৪] Monroe, *A Short History of Education*, p. 329

সত্যি করে গ্রহণ করে লাভবান হবে। দু'জনেই নানা খেলা, খেলনা, হাতের কাজকে শিশুশিক্ষার কাজে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। মন্তেসরীর উপাদানগুলি ফ্রোএবেল্‌এর 'উপহার'গুলির তুলনায় সুদৃশ্যতর—অধিকতর তাদের বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব। সংখ্যায়ও তারা বেশী। কিন্তু ফ্রোএবেল্ এ খেলা ও খেলনাকে ধর্মের রহস্যের সঙ্গে যুক্ত করে, তাদের ব্যবহার সংকীর্ণতর করেছেন। আবার মন্তেসরী খেলা ও শিশুর নানা কাজের মধ্যে কল্পনাকে স্থান দিতে ইচ্ছুক নন, তাই নানা কাহিনী ও রূপকথার তিনি পক্ষপাতী নন। কিন্তু ফ্রোএবেল্ শিশুর কল্পনার ও অনুভূতির বিকাশ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন। এ বিষয়ে আধুনিক শিশু-মনোবিজ্ঞানের রায় ফ্রোএবেল্‌এর পক্ষে।

ফ্রোএবেল্-এর ঐক্যের সূত্র অনুসরণ ও আধ্যাত্মিক রহস্যময়তার সঙ্গে রবীন্দ্র-নাথের শিক্ষানীতির যথেষ্ট মিল আছে। তবে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কেজো ফললাভের (practical result) দিকে ফ্রোএবেল্ অধিকতর আগ্রহশীল বলে মনে হয়।

ফ্রোএবেল্‌এর শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে কতকগুলি সমালোচনা প্রায়ই শোনা যায়। তাঁর জীবদ্দশায় জার্মানীর গোঁড়া পুরোহিত ও শাসক-সম্প্রদায় তাঁর শিক্ষানীতি ধর্মবিরোধী ও বিপজ্জনক মনে করে, সমস্ত কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা জার্মানীতে বন্ধ করে দিয়েছিলেন সে কথা উল্লেখ করেছি। সেই গোঁড়াদের বিরুদ্ধতা ছাড়াও অন্যান্য কারণেও বর্তমানে কিণ্ডারগার্টেন রীতির বিরুদ্ধ আলোচনা হয়েছে। সবচেয়ে বেশী আপত্তি হয়েছে ফ্রোএবেল্‌এর রহস্যময় আধ্যাত্মিকতা ও প্রতীক ব্যবহার সম্বন্ধে। তাঁর আধ্যাত্মিক দর্শন ও ঐক্যসূত্রের অনুসরণ তাঁর শিক্ষাদর্শকে অনেক সময় দুর্বোধ্য করে তুলেছে। ফ্রোএবেল্ অস্বীকার করলেও খ্রীষ্টানরা অনেকে মনে করেন, তিনি খ্রীষ্টানধর্মের বিরোধী পেগানিজ্‌ম্ (Paganism) প্রচারক, সমস্ত সৃষ্টি বিশ্বস্রষ্টার প্রতীক মাত্র, এক অতীন্দ্রিয় সত্তা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে ক্রিয়া করছে—এ মত অনুসারে এ পৃথিবীর নিজস্ব অস্তিত্ব নেই, তা মায়া মাত্র এমন ধারণা জন্মে। তিনি তাঁর 'উপহার', অঙ্কশিক্ষা, খেলাধূলা ইত্যাদির মধ্যে তাঁর রহস্যময় প্রতীকবাদ নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করেছেন যে, তাতে শিক্ষা-ব্যাপারটাই যেন ম্যাজিকে পরিণত হয়েছে! ১ সংখ্যা হচ্ছে ঈশ্বর—সর্বসৃষ্টিমূল, ২ সংখ্যা হচ্ছে জগৎ ও মন, ৩ সংখ্যা হচ্ছে জগৎ ও মনের সুষ্ঠু সমন্বয়, ball হচ্ছে 'b—All'—এ ধরণের শিক্ষা শিশুর পক্ষে

কৌতূহলোদ্দীপক হলেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি গঠনের সহায়ক নয়। তাঁর শিক্ষা বিজ্ঞান ও ধর্মবিশ্বাসের এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ী।

খেলা ও হাতের কাজের উপর বেশী জোর দেওয়াতে শিক্ষার ক্ষেত্রে বুদ্ধির চর্চাকে লঘু করা হয়েছে। শিক্ষাকে শিশুর কাছে লোভনীয় করতে গিয়ে শিক্ষার আদর্শকেই খাটো করা হয়েছে।[৪৫]

তাঁর ছবিগুলি অপটু ও শিল্পগুণবর্জিত, ছড়াগুলিও অনেক সময় হাস্যকর ছেলেমানুষিতে ভরা, নয়-তো ধর্মোপদেশ কুইনিনে ঠাসা, ছড়ার ভাষা ও ভাব শিশুর পক্ষে দুর্বোধ্য।

এ সমস্ত সমালোচনা সবটাই সত্য নয়, সবটাই নিরর্থকও নয়। কিন্তু সমস্ত বিরুদ্ধ আলোচনা সত্ত্বেও এ কথা স্বীকার্য, বর্তমান কালের অগ্রসর শিক্ষানীতির প্রধান আদর্শ ও প্রণালীর মূল কাঠামো ফ্রোএবেল্‌এর কিণ্ডারগার্টেনে বিদ্যমান। ফ্রোএবেল্‌এর নিম্নলিখিত মতগুলি আধুনিক শিক্ষানীতিতে স্থায়িভাবে গৃহীত হয়েছে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়ঃ—

(১) শিশুর সমস্ত শিক্ষার মূল হচ্ছে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও ক্রিয়া। তার স্বাভাবিক বিকাশের ধারার সঙ্গে শিক্ষার ধারা তাল রেখে চলবে।

(২) সমস্ত স্বাভাবিক বিকাশ ভিতর থেকে নিজস্ব নিয়মে অগ্রসর হবে।

(৩) শৈশবের শিক্ষার একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপায় হচ্ছে খেলা।

(৪) হাতে গঠনাত্মক কাজের মধ্য দিয়ে শিশুর দৈহিক, মানসিক, নৈতিক সমস্ত শক্তির সমন্বয় ঘটে।

(৫) শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ ও সামাজিক শাসন, এ দুইএর সমন্বয় এই খেলা ও গঠনাত্মক কাজের মধ্য দিয়েই সম্ভব।

(৬) শিশুর জীবনের প্রত্যেক স্তরের স্বাভাবিক সুপ্ত আগ্রহের উপর ভিত্তি করেই শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে।

(৭) ক্রমবিকাশের ধারা নিরন্তর বয়ে চলেছে। শিক্ষা ভবিষ্যৎ উন্নততর বিকাশের শ্রেষ্ঠ উপায়।

(৮) মানব-সমাজের উন্নতি মাতৃজাতির সুশিক্ষার উপর নির্ভরশীল।

---

৪৫ Graves, *Great Educators of Three Centuries*, pp. 223-25.

(৯) জ্ঞানের নিজস্ব মূল্য নেই—তা ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ, ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে সামঞ্জস্য বিধানের উপায়।[৪৬]

বর্তমানের সমস্ত শিশুশিক্ষা ফ্রোএবেল্এর কিণ্ডারগার্টেনএর মূলনীতির উপর ভিত্তি করেই অগ্রসর হচ্ছে এবং বর্তমান যুগের সমস্ত শিক্ষাবিদ্ (যেমন ষ্ট্যান্লি হল, ডিউই) তাঁর চিন্তার দ্বারা প্রভাবান্বিত। যদিও ফ্রোএবেল্ তাঁর কিণ্ডারগার্টেনে প্রাক্-বিদ্যালয় শিশুশিক্ষার সমস্যা-সমাধানেই ব্যস্ত ছিলেন তথাপি তাঁর শিক্ষানীতিতে এমন কতকগুলি সূত্র আছে যা সমগ্র শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

মন্তেসরীর শিক্ষানীতি

১৯০৫ সালের কাছাকাছি সময়ের কথা। বড় বড় শহরে যেমন হয়ে থাকে, ইতালীর রাজধানী রোমেও গরীব শ্রমিকরা থাকত নোংরা বস্তিতে। এগুলি সমাজের নরককুণ্ড বললেও হয়। সমাজ-সচেতন কতক ধনী ব্যক্তি বুঝলেন শ্রমিকদের কাছ থেকে ভাল কাজ পেতে হলে, সবচেয়ে প্রথম দরকার তাদের জন্যে সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের ব্যবস্থা। এ কাজের জন্যে একটি সমিতি গঠিত হোল,—"দি রোমান্ অ্যাসোসিয়েশন্ ফর্ গুড্ বিল্ডিং"। এ সমিতির কাজ হোল বস্তিগুলো কিনে নিয়ে, সেখানে সুন্দর স্বাস্থ্যকর বাড়ী তৈরি করে, শ্রমিকদের পরিবারের জন্য সস্তায় সেগুলি ভাড়া দেওয়া। এ শর্ত থাকল যে, শ্রমিকেরা এ সব বাড়ীঘর সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন করে রক্ষা করার দায়িত্ব নেবে। শ্রমিকেরা এ শর্ত খুশী হয়ে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু গোল বাধল তাদের বাচ্চাদের নিয়ে। শ্রমিকেরা অনেকেই স্ত্রী-পুরুষ কাজে বেরিয়ে যায় সকালে উঠেই, কাজেই সারাদিন বাচ্চাগুলো স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। এ বাচ্চার দল ঘরবাড়ীর দেয়াল নোংরা করতে লাগল, আসবাবপত্রের ক্ষতি করতে লাগল। সমিতির ডাইরেক্টার্ জেনারেল্ চিন্তিত হয়ে পড়লেন, কারণ এ সব মেরামতের খরচও সামান্য নয়। তখন তিনি স্থির করলেন, এ সব বাড়ীর শ্রমিকদের ৩ বছর থেকে ৭ বছর পর্যন্ত বয়সের বাচ্চাদের একটা বড় হল্ ঘরে একত্র করে, তাদের খেলাধূলা পড়াশোনার ব্যবস্থা করে, আটকে রাখতে হবে। একজন

৪৬ F. Eby, *The Development of Modern Education*, p. 528.

অভিজ্ঞ শিক্ষয়িত্রীর উপর এ ভার থাকবে, এবং তিনি এই বস্তির ঘরেই বাস করবেন। এর খরচ সমিতিই বহন করবে। যে টাকাটা মেরামত ইত্যাদিতে খরচ হত, সে টাকাটা যখন বাঁচবে, তাই দিয়েই শিক্ষয়িত্রীর বা ডিরেক্‌ট্রেস্‌এর ব্যয় সংকুলান হবে। বস্তির ছোট বাচ্চাদের এই শিশু-বিত্থালয়ে পাঠাতে হবে। তাদের কোন মাইনে লাগবে না। কিন্তু বাচ্চাদের বাবা-মার দেখতে হবে যাতে তাদের শিশুরা পরিচ্ছন্ন পোষাকে যথাসময়ে আসে। বাবা-মারা ডিরেক্‌ট্রেস্‌কে যথাযোগ্য সম্মান দেখাবেন এবং তাদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। প্রথম বালমন্দির (ক্যাসা ডি ব্যাম্বিনি) স্থাপিত হোল ১৯০৭ সালের জানুয়ারী মাসে। ডাঃ মারিয়া মন্তেসরী (১৮৭০-১৯৫২) নিযুক্ত হলেন প্রথম ডিরেক্‌ট্রেস্‌। সুরু হোল মন্তেসরী-প্রবর্তিত নূতন শিক্ষাপদ্ধতির সফল পরীক্ষা।[১]

অবশ্য মন্তেসরী এ অভিনব পরীক্ষার জন্যে অনেকদিন থেকে তৈরি হচ্ছিলেন। তিনি ডাক্তারী পরীক্ষা পাশ করে রোম বিশ্ববিত্থালয়ের অধীন সাইকিয়াট্রিক্‌ ক্লিনিকে সহকারী চিকিৎসক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এ সময় চিকিৎসাগারে স্বল্পবুদ্ধি শিশুদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ফরাসী ডাক্তার এডোয়ার্ড সেগুঁইর চিকিৎসা-প্রণালীর প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ইতিপূর্বে মানসিক বিকারের চিকিৎসা অন্যান্য রোগের মত ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা হত। সেগুঁইর পদ্ধতি হোল এ সব শিশুদের সযত্নে ইন্দ্রিয় ও পেশী ইত্যাদির পরিচালনা শিক্ষাদান। এ পদ্ধতিতে দেখা যায় স্বল্পবুদ্ধি শিশুরাও সুস্থ শিশুদের মত শিক্ষাগ্রহণে সমর্থ। পরবর্তী কালে এই ইন্দ্রিয়-পরিচালনার মধ্য দিয়ে শিক্ষারীতি মন্তেসরী-পদ্ধতির একটি মৌলিক উপাদান হয়েছিল। এরপর তিনি রোমের অর্‌থোফ্রেনিক্‌ স্কুলের ডিরেক্‌ট্রেস্‌ হন। সেখানে স্বল্পবুদ্ধি শিশুদের পর্যবেক্ষণ ও নূতন পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষার অধিকতর সুযোগ লাভ করেন। ব্যাপকতর পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সেগুঁইর পদ্ধতির তিনি প্রভূত উন্নতি সাধন এবং এ নূতন চিকিৎসা-পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করেন। এরপর তিনি দর্শন, পরীক্ষাগত মনোবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি পাঠ করেন এবং তখনই শিক্ষা সম্বন্ধে নূতন তত্ত্ব ও শিক্ষায় নূতন পদ্ধতির ধারণা তাঁর মনে জাগে। তিনি রোমের কয়েকটি বিত্থালয়ে তাঁর পরীক্ষা কাজে লাগিয়ে আশাতীত সাফল্য লাভ করেন। তাঁর নূতন পদ্ধতি অনুযায়ী

১ Montessori, *The Montessori Method*, Eng. Trans., pp. 43-46.

শিক্ষিত স্বল্পবুদ্ধি ছেলেমেয়েরা সুস্থ ছেলেমেয়েদের সমান পারদর্শিতাই দেখাল সাধারণ পরীক্ষার ক্ষেত্রে। এ থেকেই তাঁর মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হোল যে স্বল্পবুদ্ধিদের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি সফল হয়েছে, সুস্থ ছেলেমেয়েদের বেলায় সে পদ্ধতি অধিকতর সাফল্য লাভ করবে।[২] মন্তেসরীর পূর্বেও কোন কোন মনোবিজ্ঞানবিদ্ শিক্ষাব্রতী এ ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে নির্বোধ বা অল্পবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের প্রকৃতি জানতে পারলে সমগ্র শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে নূতন পথ পাওয়া যাবে। সেগুঁই ১৮৩৬ সালে তাঁর পুস্তক 'ইডিয়সি'তে এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ইঙ্গিত করেছিলেন।[৩] সুষ্ঠু ইন্দ্রিয় পরিচালনা ও অঙ্গ সঞ্চালন শিক্ষা দ্বারা, বিশেষ করে স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে, লরা ব্রিজ্‌ম্যান্ ও হেলেন কেলারের শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অসামান্য সাফল্য লাভ হয়েছিল তা মন্তেসরীকে উৎসাহিত করেছিল। তাঁর "হ্যাণ্ড বুক"এর মুখবন্ধে তিনি বলেছেন, "যদি কেবলমাত্র একটি ইন্দ্রিয়ের (স্পর্শেন্দ্রিয়) শিক্ষা হেলেন কেলারকে অসামান্য সংস্কৃতিসম্পন্ন নারী ও লেখিকাতে পরিণত করবার পক্ষে যথেষ্ট হয়ে থাকে, তবে যে শিক্ষা ইন্দ্রিয়-পরিচালনার উপর ভিত্তি করে গঠিত, তার উপযোগিতা প্রমাণের পক্ষে হেলেন কেলারের কৃতিত্ব অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রমাণ আর কি হতে পারে?"[৪]

মন্তেসরী দেখেছিলেন বিকলেন্দ্রিয় ও স্বল্পবুদ্ধি শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম কাজ হচ্ছে সেই শিশুদের জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজগুলি সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হতে শেখানো; তারা নিজে নিজে যাতে খেতে, মুখ ধুতে, জামা জুতো পরতে, ঘর পরিষ্কার রাখতে শেখে, তা করা দরকার। এ সব কাজে যে জটিল পেশী-সঞ্চালন প্রয়োজন, যা স্বাভাবিক শিশুর কাছে নিতান্ত সহজ, তা হয়তো তারা প্রথম প্রথম পারবে না। তাই গোড়াতে এই জটিল পেশীক্রিয়ার সহজতম উপাদানগুলো শেখানো দরকার, যেটা সেই স্বল্পবুদ্ধি বা বিকলেন্দ্রিয় শিশুদের ক্ষমতার বাইরে নয়। যেমন, জামায় বোতাম লাগানো, জুতোর ফিতে বাঁধা—এ সব সহজ কাজে প্রথমে তারা অভ্যস্ত হলে, জটিলতর পেশীর কাজ করতে তাদের শেখানো যায়। তা ছাড়া যাদের কোন একটা ইন্দ্রিয় নেই (যেমন চক্ষুহীন) তাদের অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কি করে বিকলেন্দ্রিয়ের কাজ করতে হয়, তা শেখাতে

---

২ Montessori, *The Montessori Method*, p. 45.

৩ E. Seguin, *Idiocy and its Treatment by the Physiological Method*.

৪ Dr. Montessori's *Own Handbook*, Preface.

হয়। এ বিষয়ে স্পর্শেন্দ্রিয়ের যোগ্যতা শ্রেষ্ঠতম। তাই মন্তেসরীর শিক্ষাপদ্ধতিতে স্পর্শেন্দ্রিয় খুব বড় স্থান অধিকার করে আছে। কোন কোন শিক্ষাব্রতী মন্তেসরীর শিক্ষানীতিকে স্পর্শেন্দ্রিয়-ভিত্তিক শিক্ষা বলে অভিহিত করেছেন।[৫]

শিক্ষার মূল হচ্ছে ইন্দ্রিয় ব্যবহারের দ্বারা জ্ঞানের উপাদান সংগ্রহ, ও পেশী-সঞ্চালন দ্বারা দৈহিক ক্রিয়া সম্পাদন। এ দুটি ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক পরিচালনার অভাবে বহু শক্তির অপচয় হয়। মন্তেসরী বলেন বৈজ্ঞানিক লালন-পালনের পদ্ধতি দ্বারা বর্তমানকালে শিশুদের স্বাস্থ্য ও গঠন পূর্বাপেক্ষা সুন্দর ও সরলতর হয়েছে কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পরিচালনা বাস্তবিকপক্ষে এখনও সুরু হয় নি।

বৈজ্ঞানিক শিক্ষা শিশুর প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। পেস্‌তালৎসী তাই শিক্ষাকে শিশুর মনোবিজ্ঞানের উপর স্থাপনের কথা সজোরে প্রচার করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাঁর প্রচার অনুযায়ী শিক্ষানীতি কমই প্রভাবিত হয়েছে। এখনও শিক্ষা প্রকৃত পক্ষে শিক্ষক-কেন্দ্রিক। শিক্ষকের বিদ্যা ও নিপুণতাই শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। শিক্ষক নানা বয়সের, নানা রুচির, নানা নিপুণতাসম্পন্ন শিশুদের একত্রে এক ক্লাশে পড়িয়ে যান। কোন্ ছেলে কতটা গ্রহণ করে, কতটা অগ্রসর হতে পারে, সে দিকে সামান্যই দৃষ্টি থাকে।

মন্তেসরী কিন্তু এ কথা মনে-প্রাণেই বিশ্বাস করেন যে, শিক্ষা হবে শিশুকেন্দ্রিক। প্রত্যেক শিশু তার নিজস্ব শক্তি, প্রয়োজন ও শারীরিক-মানসিক বিকাশে স্তর অনুযায়ী স্বেচ্ছায় শিক্ষার পথে অগ্রসর হবে। বৈজ্ঞানিক শিক্ষা হচ্ছে প্রত্যেক শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের কোন্ স্তরে সে পৌঁছেচে, কি তার স্বাভাবিক প্রয়োজন ও গতি, তা লক্ষ্য করে শিক্ষার বিষয়বস্তু, পদ্ধতি ও গতি নির্ধারণ করা। আমরা গোড়াতেই শিশুদের বর্ণশিক্ষা দিয়ে থাকি, নামতা মুখস্থ করাই। কিন্তু অনেক সময়ই শিশুর মনের পরিণতি এ শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয় নি; তার কাছে এ শিক্ষা অর্থহীন পীড়ন, এতে শিশুর মনের উপর অযথা অতিরিক্ত চাপ পড়ে, তাতে তার ক্ষতিই হয়। শিক্ষকেরও এতে অনেক শক্তির অপচয় হয়। রুশো বলেছিলেন, বাল্যকালে শিশুকে বার থেকে বিদ্যা গিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা না করে ভিতর থেকে স্বভাবের ধর্মে তাকে পরিণত হবার অবসর দিতে হবে। এ

[৫] Rusk, *Doctrines of the Great Educators*. p. 266.

কথাটা মন্তেসরী খুব মানেন। তাঁর মতে প্রত্যেক শিক্ষারই একটা উপযুক্ত সময় আছে। সে শুভ মুহূর্ত যখন আসে তখন শিশুর মধ্যে সে শিক্ষার জন্যে স্বভাবতঃই আগ্রহ দেখা যায়। কমেনিয়াস্ বলেছিলেন, "শিক্ষা হচ্ছে শিশুরূপ চারা গাছের উদ্যান রচনা। মাছের কাছে সাঁতার কাটা যেমন, পাখীর কাছে আকাশে ওড়া যেমন, পশুর পক্ষে দৌড়ানো যেমন স্বাভাবিক, মানবশিশুর পক্ষে শিক্ষাও তেমনি স্বাভাবিক।" শিক্ষিকার কাজ হচ্ছে শ্রদ্ধা ও ধৈর্যের সঙ্গে তাঁর সামনে শিশুমন-রূপ তরুর বিস্ময়কর আত্মবিকাশ লক্ষ্য করা, এবং তার গতি নির্দেশ করা। শিক্ষা মানে কৃত্রিম চেষ্টায় গড়ে পিটে তোলা নয়—শিশু-মনকে তার স্বাভাবিক ধর্ম অনুযায়ী গড়ে উঠতে সাহায্য করা। কাজেই মন্তেসরী তাঁর শিশু বালমন্দিরে শিক্ষিকার পরিবর্তে 'পরিচালিকা' (ডাইরেক্‌ট্রেস্) নাম প্রবর্তন করলেন। মন্তেসরী শিক্ষার সংজ্ঞা দিলেন, "শিশুর জীবনের স্বাভাবিক বিস্তারের কাজে সক্রিয় সাহায্যদান।" শিশুর জীবনের বিকাশের কোন্ স্তরে কোন্ শুভ মুহূর্তে (সাইকোলজিক্যাল্ মোমেণ্ট্) কোন্ শিক্ষা শিশু গ্রহণ করতে স্বেচ্ছায় উৎসুক হবে, সেটি জানা এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষাপদ্ধতি নির্দেশ করাই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা। বহু পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা মন্তেসরী ধীরে ধীরে এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন এবং আমৃত্যু শিশুর বিভিন্ন ক্ষেত্রে নূতনতর ও সফলতর পদ্ধতি আবিষ্কারে রত ছিলেন। মন্তেসরীর মতে উপযুক্ত পরিচালিকা হতে গেলে, এ মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষা অপরিহার্য। "পরিচালিকাকে নির্ভুলভাবে জানতে হবে শিশুর ক্রিয়ার গতিতে কখন হস্তক্ষেপ করতে হবে, কিন্তু তার চেয়েও বেশী জানতে হবে কখন ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে হবে এবং হস্তক্ষেপ করবার স্বাভাবিক আগ্রহ থেকে বিরত থাকতে হবে।[৬] এ জন্যে রাস্ক্ মন্তেসরীর শিক্ষাকে বিশেষ করে "মনস্তত্ত্ব-কেন্দ্রিক শিক্ষা" বলে অভিহিত করেছেন।[৭] মন্তেসরী তাঁর বালমন্দিরে তিন বছর থেকে সাত বছরের ছাত্রদের নেওয়া উচিত মনে করেন। কারণ তাঁর মতে তিন বছর বয়সে কতকগুলি ক্রিয়া আয়ত্ত করবার স্বাভাবিক আগ্রহ ও প্রয়োজন শিশুর মধ্যে দেখা যায়। সেই "মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্ত" একবার পার হয়ে গেলে শিশুর ইন্দ্রিয় ও পেশীর স্বাভাবিক সজীবতা ও উন্মুখতা আর তেমন করে কাজে লাগানো যায় না। আবার সেই মুহূর্ত আগত হওয়ার পূর্বেও সে বিশেষ শিক্ষা

৬ Rusk, *Doctrines of Great Educators*, p. 288.

৭ " " " " p. 267.

বাস্তবিক গৃহীত হয় না। শিক্ষক ছাত্রের ভুল সংশোধন করে, বারে বারে মুখস্থ করিয়ে তাকে শেখাবেন, এটা নিতান্তই ভুল পথ। শিক্ষা মানেই হচ্ছে—স্বয়ংকৃত আগ্রহে, স্বাভাবিক প্রয়োজন মেটাবার তাগিদ্।[৮] কাজেই মন্তেসরীর বালমন্দিরে ক্লাশে বসিয়ে বক্তৃতা দিয়ে শেখানোর পদ্ধতি নেই। নূতন শিক্ষানীতির এই কথা: ছাত্রেরা শিখবে নিজের আগ্রহে, নিজের স্বাভাবিক প্রয়োজন মেটাবার আনন্দে। তাই হয়তো দেখা যাবে, বালমন্দিরে বিভিন্ন শিশু, কেউ বা ছোট ছোট টেবিল চেয়ারে বসে, কেউ বা মাটিতে রঙীন পরিচ্ছন্ন মাদুরে বসে, নিজ নিজ কাজের পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত। কোথাও তারা কাজ করছে একসঙ্গে সকলে মিলে, কোথাও বা একা একা। ডিরেক্ট্রেস্ তাদের লক্ষ্য করছেন, উৎসাহ দিচ্ছেন, চালনা করছেন, কিন্তু কোথাও তাড়না নেই, জবরদস্তি নেই। হয়তো এক খেলা (আর খেলাই হচ্ছে সেখানে শিক্ষার বাহন) নিয়ে একটি শিশু ঘণ্টার পর ঘণ্টা মগ্ন আছে, তাকে ক্লাশের অন্যদের সমান করে তুলবার ব্যস্ততা নেই, নতুন পড়া ধরিয়ে দেবার জন্যও কোন দুর্ভাবনা নেই।[৯]

এখানে তিরস্কারের ও পীড়নের স্থান নেই, তেমনি পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে কাজ আদায়ের ফন্দি নেই। শিশু তার আত্মবিকাশ ও নতুন নৈপুণ্য আহরণে যে আনন্দ লাভ করে, তাই তার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।[১০] মন্তেসরী বলেছেন, পুরানো ইস্কুলে শিক্ষকদের অধিকাংশ সময় কাটে চীৎকার, তাড়না, উপদেশ, প্রলোভন ইত্যাদি দিয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে, বালমন্দিরে সে শক্তির অপচয় ঘটে না।[১২]

ক্লাশে দল করে একই ধরাবাঁধা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পড়াবার প্রাচীন রীতি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও মনস্তত্ত্ববিরোধী। প্রত্যেক শিশুর বিকাশের গতি বিভিন্ন; প্রত্যেকের নিজস্ব স্বাভাবিক বিকাশের গতি ও ধারা অনুযায়ীই হবে তার শিক্ষা। ডিরেক্ট্রেস্এর কাজ এক দিকে যেমন সহজ, আরেক দিকে তেমনি কঠিন। তাঁর কাজ সহজ, কারণ পদে পদে ছাত্রদের চাঞ্চল্য ও চপলতা দমন করে শক্তি ক্ষয় করতে হয় না। কিন্তু তাঁর কাজ বিষম কঠিন, কারণ তাঁকে মনস্তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ হতে হবে—স্নেহশীল, যত্নবান্, সতর্ক ও সাবধান হতে হবে। প্রত্যেক শিশুর দিকে তাঁর দৃষ্টি রাখতে হবে, "মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্ত" উপনীত হলে স্বাভাবিক আগ্রহকে

---

৮ Montessori, *The Montessori Method*, p. 358.

৯ Tozier, *An Educational Wonder Worker*, p. 10.

১০ Montessori, *The Montessori Method*, p. 352.

১১ " " " " p. 371.

বৈজ্ঞানিক রীতি অনুযায়ী কাজে লাগাতে হবে,—শিশুর স্বভাবধর্মকে উদ্দেশ্যাভিমুখী ও বস্তুনিষ্ঠ করে তুলতে হবে।

মন্তেসরী-শিক্ষার মূলমন্ত্র হচ্ছে স্বাধীনতা। শিশুরা স্বভাবতঃই উৎসুক, গতিশীল, চঞ্চল। তারা দৌড়বে, খেলবে, প্রশ্ন করবে—এটাই তাদের জীবনধর্ম। প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক, সুতরাং হানিকর। প্রাচীন শিক্ষিকারা চান ছাত্রেরা ক্লাশে চুপচাপ বসে পড়া নেবে—"যেন সারি সারি পিনে গাঁথা সব প্রজাপতির দল।" মন্তেসরী বলেন, যখন শিশু স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে চঞ্চল ও সক্রিয় হতে চাচ্ছে তখন সর্বদা তাকে বাধা দিলে যে কুফল উৎপন্ন হয়, তা আমরা বুঝি না। এতে প্রাণের গতিকেই রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। প্রাতঃসূর্য যেমন প্রথম প্রভাতে তার সমগ্র ঐশ্বর্য নিয়ে দেখা দেয়, সদ্যবিকশিত পুষ্প যেমন অম্লান শোভায় উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে, তেমনি মানবশিশুর কৈশোর বুদ্ধি-বিকাশের শ্রেষ্ঠ কাল।

মন্তেসরী আর এক জায়গায় বলেছেন, "সাধারণতঃ একথা বলা যায় যে শিশুদের আমরা শ্রদ্ধার চোখে দেখি না। তাদের বিশেষ প্রয়োজন ও আগ্রহকে উপেক্ষা করে আমরা তাদের বাধ্য করি আমাদের ইচ্ছা ও সুবিধা অনুযায়ী চলতে। তাদের সঙ্গে ব্যবহারে আমরা অসহিষ্ণু, বরং তার চেয়েও বেশী—আমরা অভদ্র, এবং এর পরে আমরা আশা করি তারা বাধ্য ও ভদ্র হবে, যদিও এটা আমরা জানি তাদের মধ্যে অনুকরণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কত প্রবল এবং আমাদের প্রতি তাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা কত গভীর ও কত হৃদয়স্পর্শী।"[১২]

শিক্ষায় সাফল্যের মূল হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ। যেখানে শিশুর ব্যক্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা থাকে সেখানে এ আগ্রহকে বাড়িয়ে তোলা ও উদ্দেশ্যাভিমুখী করা সহজ। মন্তেসরী লিখেছেন, "To keep alive that enthusiasm is the secret of real guidance and it will not prove a difficult task, provided that the attitude toward the child's acts be that of respect, calm and waiting, and provided that he be left free in his movement and his experience." [১৩]

আধুনিক শিক্ষানীতিতে বিদ্যার্থীদের স্বাধীনতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃত। এ বিষয়ে প্রাচীন ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে মৌলিক প্রভেদ রয়েছে। প্রাচীন শিক্ষারীতির সমালোচনা করে আধুনিক শিক্ষাব্রতী জন্‌ ডিউই বলেছেন—

১২ Montessori, *Dr. Montessori's Own Handbook.*
১৩ Montessori, *Dr. Montessori's Own Handbook*, pp. 87-88.

(১) এ রীতিতে বিদ্যা উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়। (২) বয়স্কদের ধারণা, আদর্শ ইত্যাদি অর্ধপরিণত শিশুদের উপর চাপানো হয়। (৩) যারা বিদ্যালাভ করছে তাদের প্রয়োজন, শক্তি, রুচি সম্বন্ধে কোন বিবেচনা করা হয় না। শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিক্ষার পদ্ধতি সবই শিশুর বুদ্ধি ও আগ্রহের সঙ্গে সামঞ্জস্যশূন্য, কাজেই শিক্ষাগ্রহণ ছাত্রদের কাছে নিরানন্দ ও বিরক্তিকর। শিক্ষা ব্যাপারটাই তাই তাদের কাছে স্বভাব-বিরোধী। (৪) অনিচ্ছুক ছাত্রদের উপর শিক্ষাটা জোর করে চাপাতে হয় বলে, তাতে জুলুম-জবরদস্তি থাকেই। (৫) শিক্ষাটা প্রাণহীন ও একঘেয়ে হয়, কারণ তা পুস্তকের নির্দিষ্ট গণ্ডীদ্বারা সীমাবদ্ধ। প্রাচীন সঞ্চিত জ্ঞান নূতন শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়। নূতন যুগের নূতন প্রয়োজনের সঙ্গে শিক্ষা সংযুক্ত থাকবে, সুতরাং তা গতিশীল ও জীবন্ত হবে—এ কথাটি তাঁরা জানেন না বা মানেন না। কাজেই এই শিক্ষা পুস্তকঘেঁষা। (৬) বিদ্যালয় যে সমাজ-জীবনের অঙ্গ এবং শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ যে ব্যক্তিকে সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে সুসঙ্গতভাবে যুক্ত করবার জীবন্ত পরীক্ষা—এ কথাটি প্রাচীন শিক্ষানীতিতে অজ্ঞাত। এ শিক্ষা তাই অবাস্তব।[১৪]

প্রাচীন পদ্ধতি সম্বন্ধে ডিউইর এ সমালোচনা মন্তেসরীর মুখেও বেমানান হত না। বাস্তবিকপক্ষে প্রাচীন শিক্ষাদর্শ থেকে নতুন শিক্ষানীতির প্রভেদ করতে হলে এই স্বাধীনতার লক্ষণটি স্মরণীয়। রুশোর সময় থেকেই সচেতন ভাবে এ আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষারীতি পরিবর্তন করবার প্রয়াস চলছে। রুশো 'এমিল'-এ বলেছিলেন, "শিক্ষক উপদেশ দিয়ে শেখাবেন না—শিক্ষার্থীকে নিজের চেষ্টায় সত্যকে জানতে দেবেন।"[১৫] ফিক্‌টে বলেছিলেন, "শিক্ষকের নৈপুণ্যের প্রধান চিহ্ন হচ্ছে তিনি উপযুক্তক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর (বিদ্যার্জনে) আগ্রহ ও চেষ্টা উদ্বুদ্ধ করবেন······বিদ্যা এ ঔৎসুক্য ও চেষ্টার গৌণফল, এবং তা অনিবার্যভাবেই আসবে।"[১৬]

শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নতুন শিক্ষাবিদেরা একমত। কিন্তু স্বাধীনতা মানে কি শুধুমাত্র গতি ও শরীর সঞ্চালনের স্বাধীনতা? প্রাচীন

---

১৪ John Dewey, *Experience and Education.*

১৫ Rousseau, Emile, Bk. II.

১৬ Fichte, *Address to the German Nation.*

পদ্ধতির বিদ্যালয়ে ক্লাশ চলবে চুপচাপ, ছেলেরা নড়বে না, চড়বে না, কথা বলবে না, এটাই মস্ত কথা মনে করা হয়। ডিউই ও মন্তেসরী দু'জনেই বললেন, যে স্কুলে ছেলেরা "নট্ নড়ন্, নট্ চড়ন্, নট্ কিছু" তারাই 'সুশিক্ষিত', একথা বলা চলে না। বাইরের এ নিষ্ক্রিয়তা একটা নিতান্ত অর্থহীন 'মুখোস' হতে পারে। আসল কথা, ছাত্ররা আত্মসংযমে অভ্যস্ত হচ্ছে কি না? তাদের দৈহিক স্বাধীনতা অত্যাবশ্যক। কিন্তু সেটাই আদর্শ নয়, সেটা উপায়। প্রকৃত স্বাধীনতা হচ্ছে চিন্তা, পরীক্ষা, উদ্দেশ্যমুখী আগ্রহ প্রকাশের স্বাধীনতা। ডিউই বলছেন, "দৈহিক ক্রিয়ার স্বাধীনতা মূল্যবান, কারণ এ হচ্ছে স্বাধীন চিন্তা ও বিচারের সহায়ক। দৈহিক স্বাধীনতা না থাকলে স্ব-নির্বাচিত শুভ উদ্দেশ্য অনুযায়ী চেষ্টা বা উদ্যম সম্ভব হয় না।[১৭] এ কথার সঙ্গেও মন্তেসরীর মতের মিল আছে।

মন্তেসরী আরো বলেন, স্বাধীনতা মানে অসংযম নয়। স্বাধীনতার প্রকৃত ব্যবহারের মধ্য দিয়েই জন্মে আত্মমর্যাদা ও দায়িত্ববোধ। মন্তেসরী-প্রবর্তিত বালমন্দিরে শিশুরা নিজের দৈহিক প্রয়োজনীয় কাজ নিজেরা করছে, নিজ আগ্রহ অনুযায়ী শিখছে, জানছে, প্রশ্ন করছে। নিজেরা একত্র হয়ে পরস্পরের সহযোগিতা করছে, নিজেরা জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখছে, খেলাধূলা, গড়া, পড়া, কাজ করা, সব করছে; শিক্ষিকা বা ডিরেক্‌ট্রেস্ আছেন তাদের সঙ্গিনী, সহায়িকা, পরিচালিকা। সেখানে তারা যে সুশৃঙ্খলতা, ভদ্রতা, সুরুচির পরিচয় দেয় তা যে কোন উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ের ছাত্রদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। স্বাধীনতার আবহাওয়াতেই তাদের ব্যক্তিত্বের সর্বোত্তম বিকাশ সম্ভব। মন্তেসরীর মতে ছাত্রেরা যখন তাদের শক্তি ও আগ্রহের অনুরূপ কাজ পায় তখন তাতে তারা মগ্ন হয়ে যায়। ছাত্রেরা অযথা গোলমাল ও দুষ্টুমি করে যখন তারা তাদের কাজ ও পড়ায় কোন আনন্দ পায় না, যখন তাদের বিদ্যালয় তাদের সমগ্র মন আকর্ষণ করতে পারে না। তাদের স্বাভাবিক শক্তি তাই প্রকাশের জন্য অন্য পথ খোঁজে। তাই তিনি দাবি করেন মন্তেসরী-পদ্ধতিতে শিক্ষিত ছাত্রছাত্রীরা অনেক বেশী মনোযোগী, সংযত ও ভদ্র। ইন্দ্রিয়-ব্যবহার ও অঙ্গসঞ্চালনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষার ফলে তাদের চলন ধরণ সুন্দর হয়, তারা নিঃশব্দে ও নিপুণভাবে জিনিসপত্র ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়। নিজের কাজ নিজে করতে শেখে বলে তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে। আর দশ-

১৭ John Dewey, *Experience and Education* : the Nature of Freedom.

জনের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে শেখে বলে, শিশুকাল থেকেই তাদের ভদ্রতা, সহযোগিতা ও অপরের সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার সদভ্যাস জন্মে। বাস্তবিকপক্ষে, মন্তেসরী-শিক্ষার সচেতন উদ্দেশ্য হচ্ছে—ভদ্র, নিপুণ, আত্মনির্ভর, উৎসাহী ও সহযোগিতার মনোবৃত্তিসম্পন্ন হয়ে ছাত্রদের গড়ে উঠতে সাহায্য করা। প্রাচীন পদ্ধতিতে ছাত্রদের ভদ্র, শান্ত করতে চেষ্টা করা হয় নিষেধ দ্বারা, শাসন দ্বারা। এ পথ স্বভাব-বিরুদ্ধ, তাই নিষ্ফল। মন্তেসরী বলেন, শিশুর ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্তি তার জীবন-বিকাশের মূলশক্তি। এদের রুদ্ধ করে, নেতিবাচক পদ্ধতিতে শিক্ষা সুফলদায়ক হতেই পারে না। প্রয়োজন হচ্ছে শিশুর ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, গতিকে নির্দিষ্ট শুভ-উদ্দেশ্যমুখী করা; স্বাভাবিক প্রাণ-শক্তিকে রুদ্ধ করা নয়,—সুবিন্যস্ত করা, আত্মবশ করা। যে ক্রিয়াগুলি ছিল এলোমেলো, তাদের সুশৃঙ্খল করা।[১৮] এখানেই হচ্ছে পরিচালিকার দায়িত্ব —এতেই তাঁর নৈপুণ্যের পরিচয়। ছাত্রেরা স্বাধীনভাবে কাজ করবে, খেলা করবে, বাগান করবে, কিন্তু সে স্বাধীনতা অবাধ নয়। কোন শিশুর স্বাধীন ক্রিয়া যদি অন্য কারো কাজে বাধা বা বিরক্তি সৃষ্টি করে, ডিরেক্ট্রেস্ সেখানে হস্তক্ষেপ করবেন। যে কাজ অন্যের কাজে বাধা সৃষ্টি করে তা অন্যায়, এ সামাজিক বোধ শিশু বালমন্দিরের সুশৃঙ্খল জীবনে সহজেই আয়ত্ত করে। এটা উপদেশ বা শাস্তির দ্বারা জন্মানো যায় না। এটা অন্য দশজন ছাত্রের ও পরিচালিকার ব্যবহারের অনুকরণ থেকে আপনিই আয়ত্ত হয়। রুশো বলেছিলেন, শিশুর নৈতিক শিক্ষা ফললাভের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবেই ঘটে (লারনিং বাই কন্‌সিকোয়েন্সেস্)। রুশোর এ নীতি মন্তেসরী আরো অনেক ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন।

মন্তেসরী-প্রণালীতে নীরবতা বা নিস্তব্ধতা-শিক্ষা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। এটা শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যবহার শিক্ষার একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ। শিশুরা প্রথম থেকেই শিক্ষিকা ও অন্যান্য ছাত্রদের দেখাদেখি নিঃশব্দে হাঁটতে, জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করতে শেখে। তারা দেখে এতে কাজ সুন্দরভাবে হয়, সহজে হয়। স্বেচ্ছায়ই তখন তারা এ অভ্যাস আয়ত্ত করে। বিশেষ করে সঙ্গীত ও স্বরশিক্ষার কালে নিস্তব্ধ পটভূমিকার মূল্য তারা নিজে থেকেই বুঝতে শেখে। তা ছাড়া, প্রতিদিন শিক্ষিকার সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ ও আরামে সমস্ত দেহ, অঙ্গ-

[১৮] Montessori, *Dr. Montessori's Own Handbook*, p. 98.

প্রত্যঙ্গ সুষম বিশ্রাম-ভঙ্গীতে বিন্যস্ত করে নিস্তব্ধ হয়ে কিছু সময়ক্ষেপ করা তারা অভ্যাস করে। এ স্তব্ধ প্রশান্তির শিক্ষাকে মন্তেসরী অত্যন্ত মূল্যবান্ মনে করেন।[১৯] আমাদের প্রাচীন হিন্দু শিক্ষা-পদ্ধতিতে ছাত্রদের ধ্যান, আহ্নিকের শিক্ষা এ শিক্ষারই অনুরূপ। যোগদর্শনে আসন, প্রাণায়াম শিক্ষার তাৎপর্য গভীরতর। আসনের সংজ্ঞা হচ্ছে—'স্থিরসুখমাসনম্'। মন্তেসরীর নিস্তব্ধতা শিক্ষার পদ্ধতিও হচ্ছে—আসন গ্রহণের শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমেও তিনি পূর্বে প্রাতঃকালে গায়ত্রীধ্যান প্রবর্তন করেছিলেন।

মন্তেসরী-শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুদের সমগ্র সত্তার সুষম ও সম্পূর্ণ বিকাশ। তাই তিনি শুধু বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের কথাই ভাবেন নি। শিশু সবল, সুস্থ, নিপুণ, ভদ্র, নীতিবান ও বিশ্বাসী মানুষ হয়ে বিকশিত হয়ে উঠবে—এ হচ্ছে তাঁর বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উদ্দেশ্য। তাঁর শিক্ষারীতিতে তাই (১) গৃহকর্ম ও আত্মবশ্যতা শিক্ষা, (২) জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির পরিচালনা শিক্ষা, (৩) পেশী ও অঙ্গ সঞ্চালন শিক্ষা, (৪) ভাষার গঠন লেখন শিক্ষা, (৫) সঙ্গীত, অঙ্কন, শিক্ষাকর্ম ও উদ্যান কর্মের মাধ্যমে রুচি শিক্ষা ও প্রকৃতি পরিচয়, (৬) নৈতিক শিক্ষা ও (৭) ধর্মশিক্ষা—এই কয় ভাগে ভাগ করা যায়।

মন্তেসরী দেখেছিলেন যারা অল্পবুদ্ধি বা বিকলেন্দ্রিয় তাদের প্রথম নিজের অত্যাবশ্যক দৈনিক কাজগুলি শেখানো দরকার। এতে তারা স্বাবলম্বী হয় ও তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে। সুস্থ শিশুদের বেলায় এ কাজটি একেবারে বাল্যাবস্থা থেকে শেখানো যেতে পারে। তিন বৎসর বয়স এ বিষয়ে উপযুক্ত সময়। এ বয়সেই বালমন্দিরে ভর্তি করা হয়।

বালমন্দির শিশুদের নিজস্ব গৃহ। এখানে শিশুরাই নিজেদের প্রয়োজনীয় সব কাজ করে। হাতমুখ ধোওয়া, খাদ্য বিতরণ করা, টেবিল চেয়ার সাজানো, খাওয়া হয়ে গেলে বাসনপত্র সরিয়ে ধুয়ে মুছে রাখা, বিছানা করা, জুতো জামা পরা, কাপড় জামা পরিষ্কার করা, বাগান করা, ঘর সাজানো, এ সব কাজ ছেলেরা দল বেঁধে, নিজের কর্তৃত্বাধীনে, শিক্ষিকার সহযোগিতায় ও পরিচালনায় নিজেরাই আনন্দের সঙ্গে করতে শেখে।

বালমন্দিরের গৃহটি হবে সুপ্রশস্ত, পরিচ্ছন্ন, সুন্দর অথচ বাহুল্যবর্জিত। এর চারপাশে বাগান ও মাঝে মাঝে আচ্ছাদন থাকলে ভাল হয়—যাতে খোলা আলো-

[১৯] Montessori, *Montessori's Own Handbook*, p. 75.

বাতাসে শিশুরা দিনের বেশির ভাগ সময় কাটাতে পারে অথচ রৌদ্র, বৃষ্টি থেকে তারা রক্ষিত হয়। এর চেহারা আমাদের পরিচিত স্কুলঘর থেকে আলাদা। এটা শিশুদের জন্যে সত্যিকারের গৃহ। মাঝখানের হল্‌-ঘরটিতেই তাদের লেখাপড়া কাজ ইত্যাদি হয়। এর আসবাব, সরঞ্জাম সব শিশুদের মাপের। চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ সব নীচু, হাল্কা ও সুন্দর রংকরা। এগুলি সবই ছোট ছোট, যাতে শিশুরা নিজেরাই এগুলি নাড়তে-চাড়তে, যেখানে খুশি বহন করে বসাতে পারে। এগুলি শিশুরাই সাবান দিয়ে ধুয়ে মুছে পরিচ্ছন্ন রাখে। এই ঘরে থাকবে একটি বড় দরজাওয়ালা নীচু ঢাকা কাব্যর্ড বা ঢাকা দেওয়া আলমারী, তাতে সাজানো থাকে তাদের শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য উপাদান—যাকে মন্তেসরী বলেন, "ডিড্যাক্‌টিক ম্যাটিরিয়াল্‌"। এতে আছে নানা মাপের ও নানা আকারের কাঠের ও ধাতুর রঙীন লাঠি, সিলিণ্ডার, চতুষ্কোণ, ত্রিকোণ ইত্যাদি। আরো আছে বড় বড় হরফে লেখা অক্ষর, চিত্রাঙ্কন, বিভিন্ন শব্দযন্ত্র ইত্যাদি। মন্তেসরী-পদ্ধতিতে বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়াদির শিক্ষার এগুলি হচ্ছে উপাদান। এগুলি বালমন্দিরের ছাত্রদের সাধারণ সম্পত্তি। আর একটি নীচু আলমারী থাকবে অনেক ড্রয়ারওয়ালা—এক একটি ড্রয়ারেরগায়ে এক এক ছেলের নাম লেখা কার্ড আঁটা। সুন্দর রঙীন হাতল। এ ড্রয়ারে থাকে প্রত্যেকটি ছেলের নিজস্ব সঞ্চয়। আলমারীর সব জিনিসই সুবিন্যস্ত, পালিশ বা রং করা। আলমারীর উপর ছেলেরাই সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে ফুলদানীতে ফুল, নিজেদের হাতের নানা কাজ, রঙীন মাদুর ইত্যাদি যা বিছিয়ে তারা মেঝেতেই বসে খেলা বা কাজ, পড়াশুনা (মন্তেসরী-রীতিতে এ সবই সমান মূল্যবান্‌ শিক্ষার অঙ্গ) বা গল্পগুজব করতে পারে। দেয়ালের গায়ে নীচুতে সাজানো আছে নানা রঙীন সুন্দর ছবি, যা মাঝে মাঝে প্রয়োজন মত তারা বদলে দেয়। দেয়ালে ব্ল্যাক-বোর্ডও টাঙানো আছে যা শিশুরা নাগাল পায় এবং যেখানে তারা লিখতে পারে ও ছবি আঁকতে পারে। এখানে নানা পাতাবাহার ও রঙীন ফুলের গাছ টবে করে সুন্দর সাজানো থাকবে।

বালমন্দিরে আর একটা ঘর থাকবে, সেটা শিশুদের ক্লাবঘর বা বৈঠকখানা। এ ঘরে বসে ছেলেরা নানা গল্প, গানবাজনা করবে, নানা হাল্কা খেলাধূলা করবে। হল্‌-ঘরটি বিশেষ রুচির সঙ্গে সুন্দর করে সাজানো থাকবে। নানা মাপের টেবিল, সোফা, হেলান-দেওয়া চেয়ার এ ঘরে থাকবে। নানা আকারের শেল্‌ফ ও ব্র্যাকেটের উপর সুন্দর রঙীন খেলনা, মূর্তি, ফুলদানী, ছবি, ফটোগ্রাফ সাজানো থাকবে।

প্রত্যেক ছেলের জন্যে ছোট একটি ফুলের টব নির্দিষ্ট থাকবে, তাতে প্রত্যেক ছেলে নিজের খুশিমত ফুলগাছ লাগাবে ও তার যত্ন করবে। সে ঘরে টেবিলের উপর ছেলেদের মাপের ছোট ছোট বাদ্যযন্ত্র থাকবে। প্রত্যেক ছেলেই কোন না কোন বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শিখবে। এ ঘরের মেঝেতে বিছানোর জন্যে নানা রঙীন গালিচা থাকবে।

খাওয়ার ঘরে টেবিল চেয়ারও ছোটদের মাপের, খাবার রাখবার কাব্যর্ড নীচু, তাতে খাবার রাখা হয়। প্লেট, কাপ চীনা মাটির। কাঁটা, চামচ, ছুরি, খাওয়ার সব সরঞ্জামই তাদের উপযুক্ত করে তৈরি। খাবার তারা নিজেরা পরিবেশন করতে। খাবার পর নিঃশব্দে বাসনপত্র তুলে ধুয়ে মুছে আলমারীতে তুলে রাখে।

ড্রেসিংরুমে প্রত্যেক ছেলের কাপড়-জামা রাখবার আলাদা ছোট ছোট কাব্যর্ড বা শেলফ আছে। তাদের হাত মুখ ধোবার জন্যে সারি সারি নীচু জলের কল আছে। হাত মুখ ধোবার জন্যে সাবান, গামছা সব জায়গামত গুছানো আছে। ছেলেরা নিজেরা স্নান করে, কাপড়-জামা ধুয়ে দেয়, পরিচ্ছন্ন থাকে। প্রথম প্রথম ছোটরা বড়দের ও শিক্ষিকাদের দেখে দেখে নিজেই উৎসাহের সঙ্গে এ সব কাজে এগিয়ে আসে। একে অন্যকে সাহায্যও করে।

তাদের ওজন নেবার ও বসে দাঁড়িয়ে উচ্চতা মাপবার যন্ত্র থাকে। নিজেরাই সেখানে পরস্পরের মাপ ও ওজন দেখে। চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ডিরেক্ট্রেস্ প্রত্যেক ছাত্রের দৈহিক পরিণতির আলাদা আলাদা হিসাব রাখেন। প্রয়োজন হলে উপযুক্ত খাদ্যের বা চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।[২০]

নিজেদের প্রয়োজনীয় কাজ নিজেরা করার মধ্য দিয়েই তাদের বৈজ্ঞানিক পেশী সঞ্চালন শিক্ষা হয়। তারা নিপুণভাবে অঙ্গ সঞ্চালন করতে শেখে—জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করতে শেখে। সকলের থেকে বড় কথা, তারা স্বাবলম্বী হয় এবং এতে তাদের আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হয়। এ সব নিজেদের অত্যাবশ্যক প্রাত্যহিক কাজ ছাড়া তারা বাগানে তরিতরকারী, ফুলগাছ প্রভৃতি উৎপন্ন করতে ও যত্ন নিতে শেখে। এতে একদিকে যেমন প্রকৃতির সঙ্গে তাদের প্রত্যহ পরিচয় ঘটে, তেমনি স্বাভাবিক আগ্রহ স্থষ্টির ফলে শেখাটা আনন্দের ব্যাপারই হয়। এখানে সমস্ত শিক্ষার মূলই হচ্ছে স্বতঃশিক্ষা—'অটো-এডুকেশন্'। ডিরেক্ট্রেস্ বা শিক্ষিকা শুধু পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন—প্রথম পদক্ষেপটি দেখিয়ে দিচ্ছেন। এখানে জোর-জবরদস্তি

২০ Montessori, *Dr. Montessori's Own Handbook*, pp. 9-18.

নেই—বারে বারে মুখস্থ করে শেখানোর চেষ্টা নেই, ভুল সংশোধন করে দেওয়া নেই। নিজেদের কাজের মধ্য দিয়েই তাদের নিজেদের ভুল তাদের কাছে ধরা পড়বে, তারা নিজেরাই নিজেদের সংশোধন করবে।

তাদের ব্যায়ামাগারেও যন্ত্রপাতি ঠিক তাদের উপযোগী। মন্তেসরী বলেন—শিশুরা কেবলমাত্র অপরিণত ছোট মানুষ নয়। তাদের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব, নিজস্ব প্রয়োজন আছে। কাজেই বড়দের জন্য যে ব্যায়াম তা ছোটদের জন্যে উপযুক্ত হতে পারে না।[২১] তাই তাদের উপযুক্ত ব্যায়ামের ব্যবস্থা। এ ব্যায়ামও খেলাচ্ছলে। যদিও এ ব্যায়াম সচেতন উদ্দেশ্য-চালিত, শিশুদের কাছে এটা স্বেচ্ছায় খুশির খেলা। সব ব্যায়ামগুলিই তাদের স্বাভাবিক উৎসাহকে ভিত্তি করে গঠিত এবং সবগুলি ব্যায়ামই তাদের দৈহিক, মানসিক সুস্থ পরিণতির উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক ভাবে পরিচালিত। একটি ব্যায়াম হচ্ছে লাইন করে চলা। মাঠের মধ্যে মোটা সাদা রেখা প্রকাণ্ড একটি ডিম্বাকারে আঁকা আছে—তার ভেতরেও অপরূপ একটি সমান্তরাল ডিম্বাকৃতি রেখা। শিক্ষিকা হাসতে হাসতে সেই বাইরের রেখায় গিয়ে দাঁড়ালেন। একটি পার পিছনে আর একটি পা—দুটিই রেখাটির উপরে। তালে তালে চলতে আরম্ভ করলেন। ছেলেরা দেখাদেখি তাঁর পিছনে লাইন করে দাঁড়িয়ে চলতে আরম্ভ করল। ছাত্রসংখ্যা বেশী হলে ভেতরের লাইনটিও ভরে উঠল। প্রথমে ধীরে, পরে দ্রুত চলা, পা দুটিই কিন্তু থাকবে লাইনের উপর। হয়তো সঙ্গে সঙ্গে গান বা আবৃত্তি সুরু করলেন শিক্ষিকা। কখনো বা সঙ্গে বাজনাও থাকছে—তালে তালে ছোট ছোট পাগুলি পড়ছে,—মুখে তাদের হাসি, চরণে তাদের গতি, সমস্ত দেহে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গী। এতে করে শেখা হোল দেহের ভারসাম্য রক্ষা। স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে চলার আর একটি ব্যায়াম, গোল সিঁড়ি বেয়ে ওঠা—এ সিঁড়ির একদিকে রেলিং, আর একদিকে খোলা। সিঁড়ির ধাপগুলো অবশ্য তাদের মাপেই ছোট ছোট। রেলিং না ধরেই সিঁড়ি বেয়ে ঘুরে ঘুরে উপরে উঠতে শেখার মধ্য দিয়েও দেহের ভারসাম্য রক্ষা ও স্বচ্ছন্দ গতিভঙ্গী আয়ত্ত হোল। মন্তেসরী দাবী করেন এ সব স্বাভাবিক ও বৈজ্ঞানিক অঙ্গসঞ্চালনের ফলে তাঁর পদ্ধতিতে শিক্ষিত ছাত্রদের চলন ও ক্রিয়ার ভঙ্গী অনেক বেশী সাবলীল, সুশৃঙ্খল ও সুনিপুণ হয়।[২২]

---

২১ Montessori, *The Montessori Method*, pp. 139-40.
২২ Rusk, *Doctrines of Great Educators*, pp. 270-71.

মন্তেসরীর রীতিতে সবচেয়ে তিনি বেশী সাফল্য অর্জন করেছেন ইন্দ্রিয়-লব্ধ-জ্ঞান-শিক্ষায়। এ শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক ভাবে পরিচালনার জন্যে তিনি কতকগুলি উপাদান আবিষ্কার করেছেন। এই 'ডিড্যাক্‌টিক্ ম্যাটিরিয়াল্'গুলি তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতির অত্যাবশ্যক অঙ্গ। এ উপাদানগুলি হচ্ছে—

(ক) তিন প্রস্ত ঘন ইন্‌সেট্।

(খ) তিন প্রস্ত ক্রমবর্ধমান আকারের ঘন কাষ্ঠফলক—যথা (১) গোলাপী রংএর ফলক (কিউব), (২) বাদামী রংএর প্রিজম্ (তেফলা কাঠ), (৩) কতকগুলি বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের রড্ (কাঠি), কতক সবুজ রংএর, কতক লাল আর নীল রং করা।

(গ) বিভিন্ন জ্যামিতিক ঘন আকারের কাষ্ঠফলক (প্রিজম্, পিরামিড, গোলক, বেলন ইত্যাদি)।

(ঘ) চতুষ্কোণ কাঠের খণ্ড, তাদের কতকগুলির পৃষ্ঠ মসৃণ, কতকগুলির অমসৃণ।

(ঙ) বিভিন্ন জাতীয় কাপড়ের সংগ্রহ।

(চ) বিভিন্ন ওজনের ছোট ছোট কাঠের টুকরা।

(ছ) দুটি-বাক্স—প্রত্যেকটিতে ৬৪টি বিভিন্ন রংএর কাঠের টুকরা।

(জ) একটি ড্রয়ারওয়ালা ছোট আলমারী, যাতে আছে নানা রকমের সমতল জ্যামিতিক আকার।

(ঝ) তিন প্রস্ত কার্ড যার উপর বিভিন্ন জ্যামিতিক আকারের রঙীন কাগজ কেটে আঁটা আছে।

(ঞ) বিভিন্ন জাতীয় শব্দ উৎপাদনের জন্য কয়েকটি গোলাকৃতি বন্ধ বাক্স।

(ট) বিভিন্ন স্বর উৎপাদনকারী দু'সারি ঘণ্টা ; কাঠের ফলক যাতে সঙ্গীতের স্বরলিপি-প্রকাশক রেখা অঙ্কিত আছে, স্বর প্রকাশক চিহ্নসমন্বিত ছোট ছোট গোল কাঠের টুকরা।

হাতের লেখা ও অঙ্ক শেখাবার জন্যও এরকম কতকগুলি উপাদান আছে। সেগুলি হচ্ছে—

(ঠ) দুটি হেলানো-ডালা ডেস্ক ও নানা আকারের লোহার জ্যামিতিক আকৃতি।

(ড) কার্ডের উপর শিরীষ কাগজের বড় বড় অক্ষর আঠা দিয়ে আঁটা।

(ঢ) কাঠের বিভিন্ন আকারের রঙীন বর্ণমালা (ক, খ, গ ইত্যাদি) কার্ড-বোর্ডের বাক্সে।

(ণ) কতকগুলি কার্ড তার উপর বিভিন্ন অঙ্ক (১, ২, ৩ ইত্যাদি) শিরীষ কাগজে লিখে আঠা দিয়ে আঁটা।

(ত) কতকগুলি কার্ড তার উপর আগের মত বিভিন্ন বর্ণ বা অঙ্ক মসৃণ কাগজে লিখে আঠা দিয়ে আঁটা।

(থ) গণনা শিক্ষার জন্যে রঙীন কাঠের ছুটি বাক্স।

(দ) এই পদ্ধতি অনুযায়ী কতকগুলি রেখাঙ্কন এবং রঙীন পেন্সিল।

(ধ) কাঠের ফ্রেমে কাপড়, চামড়া ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে আটকানো (যেমন, বোতাম, ফিতা, হুক্ ইত্যাদি)।[২৩]

ইন্দ্রিয় জ্ঞানলাভ শিক্ষার এই উপাদানগুলি সহজেই শিশুর আগ্রহ আকর্ষণ করে। শিশুর মানসিক পরিণতির দিকে লক্ষ্য রেখে এই উপাদানগুলি তৈরি করা হয়েছে। এগুলি শিশুরা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে ব্যবহার করে নিজস্ব চেষ্টাতেই জ্ঞান আহরণ করে। এই উপাদানগুলির মধ্য দিয়ে যে জ্ঞানলাভ হয় তা সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ এবং নির্ভুল। এ শিক্ষা স্বয়ং-শিক্ষা (অটো-এডুকেশান্), এবং ভুল সংশোধনের উপায় এ উপাদানগুলির মধ্যেই আছে। রুশো নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, শিশু নীতিজ্ঞান লাভ করবে উপদেশ ও শাসনের মধ্য দিয়ে নয়, নিজ কর্মের ফলভোগের মধ্য দিয়ে (লারনিং বাই কন্‌সিকোয়েন্সেস্)। মন্তেসরী এ নীতি ব্যাপকতর ক্ষেত্রে ব্যবহার করলেন। তিনি বললেন, বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য। শিশু নিজের ভুল নিজেই সংশোধন করবে। শিক্ষক কোন বিষয় মুখস্থ করে শেখাবেন না, শিশু নিজ আগ্রহ ও নিজ প্রয়োজনে পুনঃ পুনঃ কোন একটি ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাতে স্বাভাবিক নিপুণতা লাভ করবে। আর এ উপাদানগুলি এমন ভাবেই তৈরী যে ভুল করলে আপনিই তা ধরা পড়বে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

তিনটি ঘন লম্বা কাঠের টুকরায় দশটি ফুটো করা আছে। সেই ফুটোগুলোতে ঠিক ঠিক ঢুকে যাবে এমন দশটি লম্বা গোলাকৃতি (সিলিণ্ডার) কাঠের টুকরো বসানো আছে। সেই টুকরোগুলোর মাথায় রঙীন বোতাম বা রিং লাগানো আছে, তা ধরে সেগুলিকে উঠানো বসানো যায়। প্রথমটিতে সবগুলি টুকরো (এবং তাদের গর্তগুলিও) উচ্চতায় সমান, কিন্তু তাদের বেড় ক্রমশঃ সরু হয়ে

[২৩] Montessori, *Dr. Montessori's Own Handbook*, pp. 18-20.

গেছে। দ্বিতীয়টিতে টুকরোগুলির (এবং গর্তগুলিরও) উচ্চতা ও বেড় ক্রমশঃ কমে গেছে। তৃতীয়টিতে টুকরোগুলির (এবং গর্তগুলির) বেড় সমান কিন্তু উচ্চতা ক্রমশঃ কমে গেছে। নিতান্ত আড়াই বা তিন বছরের শিশুও এই উপাদানগুলির সাহায্যে আয়তনের পার্থক্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে শিখবে। প্রথমে শিক্ষিকা শিশুর সামনে এ রকম একটি উপাদান রেখে এগুলি কি করে গর্ত থেকে উঠানো যায় আবার ঠিক ঠিক গর্তে বসানো যায় তা দেখালেন। এতে সহজেই শিশু আকৃষ্ট হবে। শিশুও চাইবে এগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে। তাকে আরাম করে ছোট চেয়ারে বসিয়ে তার সামনে ছোট টেবিলে উপাদানটি রেখে দেওয়া হোল। সে একে একে সবগুলো গোল কাঠের টুকরো খুলবে, আবার বসাবে। যেহেতু প্রত্যেক গর্তটিই একটি বিশেষ আয়তনের টুকরোর জন্যে নির্দিষ্ট, তাই মোটা সিলিণ্ডার সরু গর্তে ঢোকানোই যাবে না আর মোটা গর্তে সরু কাঠের টুকরোটি ঢুকালে জায়গা থেকে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত সবগুলি টুকরো গর্তে ঢুকাতে গেলে ভুলটি ধরা পড়বেই। এতে করে শিশু স্পর্শ ও দৃষ্টি, এই দুই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই আয়তনের পার্থক্য ক্রমেই বুঝতে শিখবে। এভাবে ক্রমে ক্রমে তিনটি উপাদান নিয়ে খেলা করতে করতে শিশু নিজ স্বাভাবিক আগ্রহেই তিনটি আয়তনের পার্থক্য অজান্তেই নিজ থেকেই শিখবে।[২৪] এই সঙ্গে শিক্ষিকার দেখাদেখি কাঠের টুকরোগুলি নিঃশব্দে ও নিপুণভাবে তুলতে, বসাতে, টেবিলের উপর রাখতে, নীচে যাতে গড়িয়ে না পড়ে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে অভ্যস্ত হবে। এ শিক্ষায় শিক্ষিকার চীৎকার করবার অবকাশ নেই। নিঃশব্দে কাজ করতেই এখানে সকলে অভ্যস্ত।

অনুরূপ ভাবে ক্রমশঃ ছোট হাল্কা কাঠের দশটি চৌকা ফলক (কিউব্‌স্‌) একটির উপর একটি সাজিয়ে বেশ একটি মন্দির (টাওয়ার) তৈরি করতে শিশু ভালবাসে। এর মধ্যে সবচেয়ে নীচের ফলকটি হচ্ছে সবচেয়ে বড়, আর সবচেয়ে মাথারটি হচ্ছে সবচেয়ে ছোট। শিশু মনের আনন্দে নিজে নিজেই এভাবে একটির উপর একটি সাজিয়ে মন্দিরটি গড়ে তুলবে। এতে আনন্দের মধ্য দিয়েই নিজের থেকে শিক্ষা হচ্ছে। সে বড় ও ছোট আয়তন স্পর্শ ও দৃষ্টি দ্বারা পার্থক্য করতে শিখছে। এখানে শিশুকে বাইর থেকে তাড়া দিয়ে মুখস্থ করিয়ে, ভুল সংশোধন করে শেখানো হচ্ছে না। শিশুরা নিজেরা তুলনা করছে, বিচার করছে,

২৪ Montessori, *Dr. Montessori's Own Handbook*, pp. 30-35.

ঠিক পথটি খুঁজে নিচ্ছে। উৎসাহ পাচ্ছে বলেই পুনঃ পুনঃ একটি কাজ করছে, মনোযোগ ও বুদ্ধির ক্রিয়া স্বভাবতঃই এতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।[২৫]

যত তার বয়স ও বুদ্ধি বাড়বে ততই ক্রমশঃ কঠিনতর ও জটিলতর জ্যামিতিক আকার বা বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের সঙ্গে তার পরিচয় হবে। যেমন দশটি কাঠের রড্ একটির পর একটি এক ইঞ্চি করে বড়, আর লাল ও নীল রং দিয়ে পর পর ইঞ্চিগুলি চিহ্নিত করা। এগুলি শিশু নাড়বে চাড়বে, বিভিন্ন রংয়ের ভাগগুলি তার আগ্রহ সৃষ্টি করবে। সে রড্গুলো একটার পর একটা ঠিকমত সাজালে লম্বা সিঁড়ির মত সুন্দর দেখাবে। হয়তো শিশু প্রথম প্রথম ভুল করবে। করুক না। এ ভুলের মধ্য দিয়েই তার চোখ অভ্যস্ত হবে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের পার্থক্য বুঝতে। যেদিন সে প্রথম রড্গুলোকে একেবারে ঠিক সাজাতে পারবে সেদিন সাফল্যের আনন্দে সে শিক্ষিকাকে ডেকে দেখাবে এবং তাঁর প্রশংসা পেয়ে তার শিখবার আগ্রহ ও ঠিক ঠিক করে সাজানোর আগ্রহ বেড়ে যাবে।[২৬]

রুশোর মত মন্তেসরীও প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের যতটা সম্ভব আলাদা করে শিক্ষাদানের পক্ষপাতী। যাদের কোন একটি ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য আছে, অথবা যারা ক্ষীণবুদ্ধি তাদের বেলায় এ পদ্ধতি ব্যবহারে অধিকতর সুফল পাওয়া যায়। এটা মন্তেসরী দেখেছিলেন। সুস্থ ছেলেদের বেলায়ও তাই তিনি এ পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। অন্ধদের স্পর্শেন্দ্রিয় খুব তীক্ষ্ণ হয়। হেলেন কেলারের বেলায় এর আশ্চর্যকর তাৎপর্য দেখা গিয়েছে। বিভিন্ন জ্যামিতিক আকার শিক্ষা দেওয়ার সময় ধাতুনির্মিত বিভিন্ন আকারের ধারগুলি শিশু চক্ষু বন্ধ করে দুই আঙুল দিয়ে ধীরে ধীরে স্পর্শ করবে আর ধাতু-আকারগুলি কাঠের মধ্যে গর্ত করা যে ফ্রেমে আটকানো তাও অনুরূপ ভাবে স্পর্শ করবে মন্তেসরী এ নির্দেশ দিয়েছেন। এতে শিশুরা সহজেই আমোদ বোধ করে, আর স্পর্শদ্বারা আকারবোধের ক্ষমতা বিকশিত হয়। এমন কি, এমন ভাবে আঙুল বুলানো অভ্যস্ত হলে শিশুরা খুব সামান্য ও সূক্ষ্ম প্রভেদও বুঝতে শেখে। এই স্পর্শানুভূতির সাহায্যে শিক্ষাকে মন্তেসরী খুবই প্রয়োজনীয় মনে করেন এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্পর্শ করতে যাতে শিশুরা শেখে সে বিষয়ে শিক্ষিকা বিশেষ যত্ন নিয়ে থাকেন। এতে শিশুরা ভবিষ্যৎ চিত্রাঙ্কন শিক্ষার জন্যও প্রস্তুত হয়।[২৭] স্পর্শানুভূতির আরও শিক্ষা আছে।

---

[২৫] Montessori, *Dr. Montessori's Own Handbook*, p. 36.

[২৬] Montessori, *Dr. Montessori's Own Handbook*, p. 40.

[২৭] Runton, *Montessori School.*

একটা কাঠের বোর্ড সমান দুটি ভাগে বিভক্ত, একটির তল অত্যন্ত মসৃণ, অন্যটি অমসৃণ। খুব হালকাভাবে স্পর্শ করার কায়দা শিক্ষিকা শিশুদের শেখান, কখনো বা তাঁর হাত ধরে ঠিক ঠিক কেমন করে স্পর্শ করতে হবে সেটা শিক্ষিকা দেখিয়ে দেন।

ওজনের পার্থক্য বুঝবার শিক্ষা হচ্ছে—একই সমান আকারের কিন্তু বিভিন্ন ওজনের চ্যাপ্টা কতকগুলি কাঠের চৌকো খণ্ড খোলা কয়েকটি কাঠের বাক্সে রক্ষিত আছে; শিশুরা একটির পর একটি খণ্ড নিয়ে তাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব বুঝতে শেখে। প্রথম এ শিক্ষা হয় চক্ষু খুলে, শেষে চক্ষু বন্ধ করে। এতে খুব শিশুকাল থেকেই ছাত্ররা ওজনের সূক্ষ্ম তফাৎ বুঝতে শেখে।

জ্যামিতিক আকার ও ওজনের পার্থক্য বুঝতে শেখবার অনেক আগে তারা রং চিনতে শেখে। এ খেলাতে শিশুরা খুব আনন্দ পায়। দু'টি কাঠের বাক্সে ৬৪টি করে রঙীন সিল্কে জড়ানো কাঠের গোল চাক্‌তি থাকে।

এই চাক্‌তিগুলি আটটি রংএর এবং প্রত্যেক রংএর আটটি করে সেড আছে। প্রথম খেলা হচ্ছে রং মেলানো। প্রথম প্রথম শিক্ষিকা এক বাক্স থেকে প্রধান তিন চারটি রংএর (যেমন—লাল, নীল, সবুজ, হলদে) চাক্‌তি নিয়ে টেবিলে সাজিয়ে রাখেন। অন্য বাক্সের চাক্‌তিগুলিও ঢেলে টেবিলের আর এক পাশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ছোটরা সেই চাক্‌তিগুলি থেকে বেছে, আগের চাক্‌তিগুলির সঙ্গে রং মিলিয়ে জোড়া করে রাখে। সঙ্গে সঙ্গে রংএর নামগুলিও শিশুরা শেখে। শিক্ষিকা লাল চাক্‌তিটি টেবিলে রেখে বলেন, "এটি লাল"; নীলটি রেখে বলেন, "এটি নীল"। শিশু এগুলি নিয়ে খেলা করে, আর নিজের উৎসাহেই বলে, "এটি নীল"। এ চেনা হয়ে গেলে, শিক্ষিকা বললেন, "আমাকে নীলটি দাও", "আমাকে লালটি দাও"। শিশু খুশী হয়ে নীল বা লাল চাক্‌তিটি তাঁকে দেবে। এর পরের স্তর হচ্ছে শিক্ষিকা একটি চাক্‌তি তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, "বল এটি কি?" শিশু স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে ঠিক ঠিক উত্তর দেয়, এটি নীল, বা এটি লাল।[২৮] এর পরে অনুরূপভাবেই শিশু শিখবে একই রংএর সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলি (সেড্)। শিক্ষিকা কোন একই রংএর সবচেয়ে গাঢ় চাক্‌তিটি প্রথম বেছে নিয়ে তারই ঠিক নীচে রাখলেন তার চেয়ে সামান্য হাল্‌কা রংএর চাক্‌তিটি। শিশু তাঁর দেখাদেখি পর পর ক্রমশঃ হাল্‌কা রংএর চাক্‌তিগুলি

২৮ Rusk, *Doctrines of Great Educators*, p. 273.

সাজিয়ে যাবে। হয়তো শিশু ভুল করবে। তার জন্যে উদ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন নেই। বুঝতে হবে তার এই বোধের শুভ মুহূর্তটি এখনও আসেনি। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলে দেখা যাবে শিশু শীগগিরই সবগুলি রংএর চাকৃতিগুলোকেই রংএর সূক্ষ্ম পার্থক্য অনুযায়ী পরিচ্ছন্ন সারিতে সাজিয়ে খেলা করতে আনন্দ পাচ্ছে। শুধু তাই নয়, তার আশেপাশে জিনিসগুলোর রং এ চাকৃতিগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখে শিখবে। এতে আছে আবিষ্কারের আনন্দ। "একটি ছোট ছেলে একদিন খোলা ছাতে একা বেড়াচ্ছিল, আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে গম্ভীরভাবে নিজে নিজে বলতে লাগল, "আকাশের রং নীল, আকাশের রং নীল।" শিশুটির জীবনে কি গৌরবময় মুহূর্ত! তেমনি, মন্তেসরীর 'কোন এক' বালমন্দিরের শিশুদের খুশী করবার জন্যে একজন কার্ডিনাল্ (উঁচু দরের ধর্মযাজক) কিছু ভাল বিস্কুট তৈরি করে আনলেন। তিনি ভেবেছিলেন লুব্ধ শিশুরা বিস্কুটগুলি কাড়াকাড়ি করে খাবে। কিন্তু হোল কি ? তারা এই বিস্কুটগুলি পাওয়ামাত্র মুখে না পূরে, চীৎকার করে একজন বললে, "আরে এটা একটা চতুষ্কোণ," আর একজন বললে, "এটা ত্রিভুজ," আর একজন বললে, "আমারটা বৃত্ত"। কার্ডিনাল্ অবাক্ হয়ে গেলেন। খাওয়ার আনন্দের চেয়েও শিশুদের কাছে বড় আনন্দ হয়েছিল আবিষ্কারের আনন্দ। এই আবিষ্কারের আগ্রহ সৃষ্টি করা শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ।[২৯]

শিশুরা বছর পাঁচেক বড় হলে শব্দ ও স্বর চিনতে শেখে। কার্ডবোর্ডের মুখ-বন্ধ গোল কৌটার মধ্যে নানা জাতীয় বিভিন্ন জিনিসের টুকরো পোরা থাকে। কৌটাগুলি ঝাঁকালে, কোনটা জোরে, কোনটা বা আস্তে শব্দ হয়। প্রত্যেক কৌটারই আর একটি জোড়া থাকে। শিশু ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে রংএর বেলায় যেমন, তেমনি জোড়া মিলিয়ে মিলিয়ে তারপর আবার কৌটোগুলিকে সাজায় শব্দের ক্রম উচ্চতা অনুসারে। তেমনি আবার স্বর শেখবারও ব্যবস্থা আছে। আটটি ঘণ্টা পর পর সাজানো আছে। ছোট কাঠের হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলে ঘণ্টাগুলিতে যথাক্রমে সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা, স্বর বাজে। অন্য আরো অনেকগুলি ঘণ্টা আলাদা আলাদা ছড়ানো। এখানেও আগের মত শিশু প্রথম ঘণ্টাগুলি বাজিয়ে স্বর উৎপন্ন করে আর আলাদা ঘণ্টাগুলিকে আঘাত করে করে প্রথম ঘণ্টাগুলির সঙ্গে জোড় মিলিয়ে রাখে। এর পরে শিশুর বিভিন্ন স্বরের কড়ি ও

[২৯] Montessori, *Dr. Montessori's Own Handbook*, p. 64.

কোমলের প্রভেদটা কান দিয়ে বুঝতে শেখে। এখানেও তারা চোখ বুজে পরীক্ষাগুলি করে যাতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্ষমতা তীক্ষ্ণতর হয়। সঙ্গে সঙ্গে স্বরের নামগুলোও তারা শিখে ফেলে। শিক্ষিকা 'সা' ঘণ্টাটিকে আঘাত করে বলেন, "এটি সা"। তারপর "রে" ঘণ্টাটি বাজিয়ে বলেন, "এটি রে"। এ শেখা হলে শিক্ষিকা বলেন, "সা ঘণ্টাটি বাজাও," "রে টি বাজাও।" এরপর শিশুরা সা, রে, গা, মা করে ঘণ্টাগুলিকে পর পর বাজায়। শুধু ঘণ্টা দিয়েই তারা স্বর শেখে না। বিভিন্ন স্বরযন্ত্র, যেমন—পিয়ানো, বীণা ইত্যাদি তারা বাজাতে শেখে। এখানেও যন্ত্রগুলি ছোট ছোট, শিশুদের উপযুক্ত আকারের। তাদের সহজ ও সুন্দর সুরের গান শোনানো হয়। তারা আগ্রহ করেই সে গানগুলি শেখে, তার তালে তালে নাচতে ও পদক্ষেপ করতেও ভালবাসে। এতে তাদের কানই তৈরি হয় না, গতিভঙ্গীও স্বচ্ছন্দ হয় আর রুচি শিক্ষা হয়। সুর শিক্ষার উপযুক্ত পশ্চাৎপট সৃষ্টি হিসাবে তিনি নীরব স্তব্ধতা ও শান্তিময় পরিবেশের তাৎপর্য বোধের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব স্থাপন করেন। এ অভ্যাসকে তিনি সুশিক্ষার একটি প্রধান কারণ বলে মনে করেন।[৩০]

আগেই দেখিয়েছি, ইন্দ্রিয়-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাষা-শিক্ষাও চলতে থাকে। স্পষ্ট ও নির্ভুল উচ্চারণ শিক্ষা আর প্রত্যেক বস্তু বা গুণের প্রকৃত নামকরণ-শিক্ষা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অপরিহার্য অঙ্গ। তাই শিশুকে প্রথম থেকেই শুদ্ধ উচ্চারণ এবং ঠিক নামটি ব্যবহার করতে অভ্যস্ত করা হয়। যেমন কতকগুলি কাঠের সিলিণ্ডার যেগুলি ক্রমশঃ মোটা হয়ে সাজিয়ে রাখা আছে। শিক্ষিকা সবচেয়ে মোটাটি হাতে তুলে ধীরে ধীরে অত্যন্ত স্পষ্ট করে বললেন, "এটি মোটা—মোটা—মোটা।" এর পরই সবচেয়ে সরুটি তুলে বললেন, "এটা সরু—সরু—সরু"। শিশু মোটা সিলিণ্ডারটিকে মোটা কাঠের গর্তে রাখল, সরুটিকে সরু গর্তে। এর পরে শিক্ষিকা বলেন, "আমাকে মোটাটি দাও" বা "আমাকে সরুটি দাও।" এ শেখা হলে শিক্ষিকা একটি তুলে নিয়ে প্রশ্ন করেন, "এটি?" শিশু উত্তর দেবে "সরু" বা "মোটা"।[৩১] তার উচ্চারণ ভুল হলেও শিক্ষিকা শুধরে দেবেন না। আবার কয়েকবার সিলিণ্ডারগুলি হাতে নিয়ে ধীরে পুনরাবৃত্তি করেন, "এটি মোটা", "এটি সরু"। অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে ঠিক নামটি ও ঠিক উদাহরণটি শিশু আয়ত্ত করে নেয়। এসব খেলার মধ্য দিয়ে শিশু নিজ স্বাভাবিক শক্তিকে বাড়িয়ে তুলছে,

---

৩০ Montessori, *Dr. Montessori's Own Handbook*, p. 75.

৩১ Montessori, *Dr. Montessori's Own Handbook*, p. 80.

সূক্ষ্মতর করে তুলছে। সে মন দিয়ে দেখছে, শুনছে, বিচার করছে, তুলনা করছে, ঠিক ঠিক নামটি ব্যবহার করতে শিখছে, নিজ মনের ভাবটি নির্ভুলভাবে প্রকাশ করতে শিখছে। সে নিজেই নিজের শিক্ষক। বাস্তবিকই এ শিক্ষা আত্মশিক্ষা।[৩২] তার ভবিষ্যৎ ভাষা-শিক্ষা ও ভাষায় প্রকাশের বৈজ্ঞানিক প্রস্তুতি হচ্ছে বাল্যের এ বৈজ্ঞানিক শিক্ষার মাধ্যমে।

মন্তেসরী-রীতি অনুযায়ী হস্তলিপি ও বই পড়া যথেষ্ট জটিল ক্রিয়া, এর জন্য যেমন পেশীগুলির প্রস্তুতি চাই, তেমনই চাই মনেরও পরিণতি। তাঁর মতে পড়া শেখাটা আসবে লেখা শিখবারও পরে।[৩৩] মন্তেসরী লক্ষ্য করেছেন যে অতি শৈশবেই শিশুরা পেশীসঞ্চালনে প্রবৃত্ত হয়, সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে এই স্বাভাবিক পরিণতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। কিন্তু পড়তে গেলে, বর্ণগুলি যে শব্দের চিহ্ন সে বোধ আসা চাই, এবং বিভিন্ন বর্ণের উচ্চারণের সূক্ষ্ম ও নির্ভুল পার্থক্যগুলি বোধ করবার ক্ষমতা জাগ্রত হওয়া চাই। লেখাটা পেশী চালনার ক্রিয়া, তাতে যে মানসিক ক্রিয়া প্রয়োজন তা পড়ার চেয়ে অনেক কম জটিল, আর পেশীক্রিয়াতে শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ আছে। তাই লেখার মধ্য দিয়েই পড়াতে আসতে হবে।[৩৪] কিন্তু লেখা ব্যাপারটাও কতকগুলি সহজতর পেশীসঞ্চালন এবং তাদের যথোপযুক্ত শাসনসাপেক্ষ। লেখাকে যে কতকগুলি প্রাথমিক পেশীক্রিয়াতে বিশ্লেষণ করা যায়, এটা আমরা যে কোন ব্যক্তির লেখার সময় লক্ষ্য করে দেখলেই বুঝতে পারি। মন্তেসরী একটি স্বল্পবুদ্ধি মেয়েকে সেলাই শেখাবার বেলায় দেখলেন—সোজাসুজি সেলাই সে শিখতে পারল না। কিন্তু কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে মাদুর বুনবার সহজ কাজটা তাকে শেখানো কঠিন হোল না। এ বিষয়ে দক্ষতা লাভের পর দেখা গেল সহজ সেলাইয়ের কায়দাটা সে আয়ত্ত করতে পারল। এর থেকে তিনি এই সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করলেন যে, কোন জটিল ক্রিয়া শেখাতে গেলে গোড়াতে তার সহায়ক প্রাথমিক সহজতর ক্রিয়াগুলো শিখিয়ে নিলে, শেখানোটা অনেক সহজ হয়।[৩৫]

লেখার মধ্যে বর্ণটির চেহারা অনুকরণ করা, আর লেখনীটি চালনা করা— এই দু'টি ক্রিয়া বর্তমান। তা ছাড়া শ্রুতলিপি লিখতে গেলে কথাগুলিকে শব্দে বিশ্লেষণ

---

৩২ Montessori, *Dr. Montessori's Own Handbook*, p. 8.

৩৩ Rusk, *Doctrines of Great Educators*, p. 277.

৩৪ Montessori, *The Montessori Method*, pp. 226-27.

৩৫ Montessori, *The Montessori Method*, p. 261.

করবার ক্ষমতাটিও আয়ত্ত করা চাই। এর জন্যে প্রাথমিক প্রস্তুতি প্রয়োজন। বর্ণের চেহারা অনুসরণ করবার প্রস্তুতি ইতিপূর্বে নানা জ্যামিতিক আকৃতির ধাতব ইনসেট্ আঙুল দিয়ে চারধার বুলিয়ে শিশুর হয়েছে। সে পদ্ধতির বিস্তার করে এবার কাঠের বোর্ডে আঠা দিয়ে শিরীষ কাগজের বড় বড় অক্ষর সে আঙুল দিয়ে দাগা বুলাতে শেখে। সঙ্গে সঙ্গে বর্ণটির উচ্চারণও শিক্ষিকার অনুকরণ করে শিশু শিখবে। লেখনী চালনা ও প্রাথমিক ক্রিয়াগুলি সে শিখবে,—ধাতব ইন্‌সেট্‌গুলি কাগজে পেতে তার চারধার রঙীন চক্ দিয়ে শিশু আঁকবে, আর তার ভিতরের সাদা অংশ উপরে নীচে অন্য রংএর চক্ চালিয়ে সে পরিচ্ছন্ন ভাবে ভরিয়ে তুলতে শিখবে। এই রংএর অঙ্কনক্রিয়া স্বভাবতঃই তাকে আগ্রহান্বিত করবে, আর সীমারেখার বাইরে যাতে চক্ না যায় সে শিক্ষাও তার হবে। এর পর ক খ গ ঘ বর্ণ লিখতে শেখা তার কাছে কঠিন হবে না। আর যা সে আঁকছে তা যে বিভিন্ন শব্দের অ্যাবষ্ট্রাক্ট্ প্রতীক, এ বোধও তার কিছুটা জাগবে। এ শব্দের প্রতীকগুলো একবার তার মোটামুটি আয়ত্ত হলে, হঠাৎ একদিন শিশু আবিষ্কার করবে সে বিভিন্ন কথা লিখতে শিখে গেছে। সেদিন হয়তো বহু পাতা বা শ্লেট সে রঙীন চক্ বা পেন্সিলে নানা শব্দ লিখে ভরিয়ে ফেলবে। সে লিখবে জল, কল, মজা ইত্যাদি, আর কৃতিত্বের গৌরব সে সবাইকে ডেকে দেখাবে।[৩৬]

পড়াটা মন্তেসরীর মতে অর্থবোধহীন ধ্বনি-উচ্চারণ মাত্র নয়—Reading is not a mere "barking at print." লিখিত অক্ষরগুলিকে কোন দ্রব্য বা ভাবের প্রতীক হিসাবে বুঝতে শিখলে, তবেই সেটা পড়া হয়। মন্তেসরী বলেছেন, —"What I understand by reading is the interpretation of an idea from the written signs...Until the child reads a transmission of ideas from the written words, he does not read."[৩৭] পড়া শেখানোর পদ্ধতিটা কেমন? যে সমস্ত দ্রব্যের নামের সঙ্গে শিশু পরিচিত সেই সেই নামগুলি কার্ডে লিখে শিশুর সামনে দেওয়া হয়। লেখার মধ্য দিয়ে পূর্বেই অক্ষরগুলি ও তাদের উচ্চারণের সঙ্গে শিশুর পরিচয় হয়েছে। এবার সে ধীরে ধীরে অক্ষরগুলির ধ্বনি মিলিয়ে শব্দটি উচ্চারণ করবে। ঠিক ঠিক উচ্চারণটি হলে শিক্ষিকা বলবেন, "আরো দ্রুত পড়।" শিশু দ্বিতীয়বার দ্রুততর কথাটি উচ্চারণ করবে কিন্তু তখনও

---

৩৬ Montessori, *The Montessori Method*, pp. 287-89

৩৭ " " " , p. 296

হয়তো তার বোধ জাগে নি। ক্রমশঃ দ্রুততর উচ্চারণ করতে করতে কথাটি শিশুর কাছে অভ্যস্ত হবে এবং এই উচ্চারণটি যে একটি দ্রব্য, গুণ বা অবস্থা অর্থাৎ একটা ভাবের প্রতীক, এটা শিশু বুঝতে শিখবে। পূর্বের প্রস্তুতির জন্যে এই পড়ার কাজটায় শিশু দ্রুত অগ্রসর হয়। এর পর সম্পূর্ণ বাক্য কাগজের টুকরোয় লিখে শিশুর সামনে ধরা হয়, তাতে হয়তো কোন ক্রিয়া সম্পাদনের উপায় বা কোন আদেশ লেখা আছে, যেমন—"ডান দিকে বলটা আছে", বা "আমাকে বলটা দাও"। শিশু এ লেখাটা মন দিয়ে পড়ে, যখন ঠিক ঠিক কাজটি করতে পারল, তখন বোঝা গেল তার 'পড়া'টা সার্থক হয়েছে—সে বুঝেছে। কাজেই মন্তেসরীর পদ্ধতিতে বর্ণশিক্ষা আর হস্তলিপির পুরানো সময়-ক্ষয়কারী ব্যবস্থার অবসান ঘটানো হয়েছে, এটা দাবী করা হয়।[৩৮] শিশু যখন ঠিক ঠিক ক্রিয়াটি বা আদেশটি সম্পাদন করতে সক্ষম হয়, তখন সাফল্যের আনন্দে সে অস্থির হয়ে আরো পড়তে চায়, তাকে আরো আরো বাক্য দেওয়া হোক, এ দাবী করে। তার আত্মশক্তির উদ্বোধন হয়,—সাফল্য তাকে আত্মবিশ্বাসী করে। মন্তেসরীর মতে ঠিক ঠিক ভাবে শিক্ষা দেওয়া হলে, লেখা-শেখা শুরু করার এক পক্ষকাল পরেই পড়া-শেখা শুরু হতে পারে। ইতালী ভাষাটা সম্পূর্ণ ধ্বন্যাত্মক, সেখানে এ কাজটা সহজতর। কিন্তু হোম্‌স্ বলেছেন যে, মন্তেসরী প্রণালীতে শিক্ষিত ইংরেজ শিশুও ইতালিয়ান ছেলেমেয়েদের মত দ্রুত লিখতে ও পড়তে শিখেছে।[৩৯] টোজিয়ার সাড়ে তিন বছর মাত্র বয়সের একটি ছোট ছেলের কথা লিখেছেন। সে মন্তেসরী পদ্ধতিতে ইংরেজী ও ইতালিয়ান এই দুই ভাষায় লিখতে ও পড়তে শিখেছে।[৪০]

ইতিপূর্বে যে সব উপাদানের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্য দিয়ে শিশুর অংশ বা পরিমাণ বোধেরও শিক্ষা আপনিই হচ্ছে। ছোট-বড়, সরু-মোটা, উঁচু-নীচু—এ প্রভেদগুলি সংখ্যার প্রতীক দিয়ে প্রকাশই তো অঙ্ক। প্রত্যেকটি পরিমাণগত প্রভেদের যে একটি একক (ইউনিট) আছে সে বোধ শিশুর মনে জন্মাবার ব্যবস্থা ডিড্যাক্‌টিক্ মেটিরিয়ালের মধ্যেই আছে। কাঠের চৌকা বা তেকোণা ফলকগুলি যে একটা নির্দিষ্ট হারে বেড়ে গেছে তার অনুভূতি দেখা ও ছোঁয়া—এই দুইএর মধ্য দিয়েই শিশুর মনে জাগে। বিশেষ করে সংখ্যাগণনার শিক্ষা হয় ক্রমশঃ

৩৮ Montessori, *The Montessori System of Education*, p. 298

৩৯ Holmes, *The Montessori System of Education*, p. 16

৪০ Tozier, *An Educational Wonder Worker*, p. 13

বেড়ে যাওয়া দশটি রঙীন রডের সাহায্যে। প্রথম রড্ বা লাঠিটি লাল, সেটি দশ সেন্টিমিটার লম্বা। দ্বিতীয় কুড়ি সেন্টিমিটার, প্রথম দশ সেন্টিমিটার লাল, তার পরের দশ সেন্টিমিটার নীল। এমনি করে বেড়ে বেড়ে শেষ রড্‌টি একশত সেন্টিমিটার লম্বা—লালে নীলে দশটি সমান ভাগে বিভক্ত। এ লাঠিগুলি একটার পর একটা ঠিক ঠিক সাজিয়ে রাখলে লম্বা সিঁড়ির (লং ষ্টেয়ার্) মত দেখায়। সমান ভাগগুলি যে ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে, শিশু সেটা চোখ দিয়েও দেখে, স্পর্শ করেও বোঝে। এখানেও সংখ্যা দেখার পদ্ধতি পূর্ববৎ। এটি মন্তেসরী নিয়েছেন সেগুঁইর কাছ থেকে। প্রথমে শিক্ষিকা সব থেকে ছোট রড্‌টি নিয়ে বললেন, "এটি হোল এক।" তারপর তার বড়টি নিয়ে শিশুর হাতে দিয়ে বললেন, "এটি দুই।" শিশু দেখল এতে লাল আর নীলে বিভক্ত প্রথমটির সমান দুটি ভাগ। এরপর তিন ইত্যাদি। এ প্রথম স্তর। দ্বিতীয় স্তরে শিশুকে শিক্ষিকা বললেন, "দুই-এর রড্ দাও, তিনের রড্ দাও" ইত্যাদি। তৃতীয় স্তরে শিক্ষিকা একটি রড্ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটি কতর রড্?" ইত্যাদি। যে শিশু বিভাগের তাৎপর্য বুঝেছে আর সংখ্যার নামগুলি শিখেছে তার পক্ষে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন নয়। দশ পর্যন্ত শেখা হলে, তার পর আসে এক শত পর্যন্ত শেখা। প্রথম সবচেয়ে ছোট, দশ সেন্টিমিটার রডে দশটি সমান ছোট ছোট ভাগ করে দাগ কাটা আছে। প্রথম রডে আছে একবার দশ, দ্বিতীয় রডে আছে দু'বার দশ, তৃতীয়টিতে তিনবার দশ। এমনি করে সবচেয়ে বড়টিতে আছে দশবার দশ বা একশ'। এ কাঠের রডগুলির সাহায্যেই যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ শেখানো যায়। এ সংখ্যাগুলি শেখবার জন্যেও কার্ডবোর্ডের উপর আঠা দিয়ে শিরীষ কাগজের লেখা সংখ্যা আছে। তার উপর আঙুল বুলিয়ে সে সংখ্যাগুলি শিশু লিখতে শেখে।

এ পদ্ধতির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আছে বস্তুনিষ্ঠতা এবং যুক্তিগত ও মনোবিজ্ঞান-রীতিসম্মত ক্রমবিকাশ। শিশুদের কল্পনাশক্তি ও আবেগের সুস্থ বিকাশের জন্য মন্তেসরী রূপকথা ও কাহিনীর প্রশ্রয় দেওয়ার পক্ষপাতী নন। যা অলীক ও অবাস্তব, তা মূল্যহীন। মিথ্যা কল্পনা মানসিক শক্তির অপচয় ও অস্বাস্থ্যকর। মন্তেসরীর শিক্ষানীতিতে যা বাহুল্য, যা অপরিমিত, তার কোন স্থান নেই।

মন্তেসরী প্রণালীতে আলাদা করে ধর্ম ও নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা নেই। বাস্তবিক পক্ষে উপদেশ ও নির্দেশের স্থান এ শিক্ষাব্যবস্থায় অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ; কিন্তু মন্তেসরী বিশ্বাস করেন, যেখানে স্বাভাবিক শক্তি ও আগ্রহের সুস্থ বিকাশ ঘটে সেখানে তা-ই

গভীর নৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ। জীবনের স্বাভাবিক ক্রিয়া থেকে নীতি ও ধর্ম পৃথক নয়। নীতি ও ধর্ম বাইরে থেকে আমদানী করা বা উপর থেকে চাপানো বস্তু নয়। সে সমাজ-ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ যেখানে মানুষের প্রাথমিক স্বাভাবিক অভাবগুলি সুশৃঙ্খলভাবে মেটাবার ব্যবস্থা আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের অনৈতিক ব্যবহারের মূল হচ্ছে তার স্বাভাবিক অভাব সুস্থ ও সুশৃঙ্খল ভাবে মেটাবার অব্যবস্থা। শিক্ষার কাজই হচ্ছে স্বাভাবিক শক্তি ও আগ্রহকে যথাসময়ে সুশৃঙ্খল করা ও তৃপ্ত করা। এই তো নীতি-শিক্ষা। যা অপরিমিত, যা অসময়োচিত তার ফল দুঃখ ও নৈরাশ্য। এ পথ থেকে এবং নিষ্ফলতা ও অপচয় থেকে শিশুকে রক্ষা করবার ক্ষেত্রেই শিক্ষিকা তাঁর শাসন-ক্ষমতা ব্যবহার করবেন। মন্তেসরী নীতি গভীরভাবে নৈতিক, কারণ এ শিক্ষায় রাগ, ভয়, লোভ ইত্যাদি অনৈতিক অনুভূতির কারণ যাতে না ঘটে তারই ব্যবস্থা আছে। আর ব্যবস্থা আছে আনন্দ, প্রীতি, সহপ্রচেষ্টা সমূহকে সুশৃঙ্খল ও উদ্দেশ্যমুখী করার। এর মধ্য দিয়ে শিশু শান্ত ও সানন্দ প্রচেষ্টাতে অভ্যস্ত হয়; সে বিদ্রোহ করে না, বিরক্ত হয় না, ফাঁকি দিতে উৎসাহ বোধ করে না। প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি অনবরত নিষেধ ও বাধা দ্বারা তার স্বাভাবিক উৎসাহকে রুদ্ধ করে তাকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। মন্তেসরী পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিপরীত। শিক্ষা এখানে সমগ্রভাবে শিশুর চরিত্রকে শান্ত, সন্তুষ্ট ও ক্রিয়াশীল করে তোলে। এই সমগ্র ফল দিয়েই এ শিক্ষানীতির বিচার। শিশুদের দুষ্টামী বা নষ্টামী বলে যা আমরা উল্লেখ করি তা অনেক সময় কি? তা হচ্ছে তাদের স্বাভাবিক ঔৎসুক্য ও নূতন পরীক্ষা দ্বারা নূতন অভিজ্ঞতা লাভের সুস্থ আগ্রহ। আমাদের কাছে তা হয়তো অসুবিধাজনক ও অপ্রীতিকর, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলি তাদের স্বাভাবিক অনৈতিকতা প্রমাণ করে না। বাস্তবিকই এ কথা সত্য নয় যে, শিশু অলস, অবাধ্য, মিথ্যাবাদী ও হিংসুক। সত্য কথা এই যে, ভুল শিক্ষাপদ্ধতি তাদের আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে বিশৃঙ্খল প্রকাশে অভ্যস্ত করে তুলছে। শিশুর অধঃপতনের কারণ স্বাধীনতা নয়, তার কারণ তার স্বাভাবিক আগ্রহ, প্রবৃত্তি ও ক্রিয়াকে সমন্বয় ও সুশৃঙ্খল করে তুলে তাদের সার্থক তৃপ্তির পথ দেখিয়ে দেওয়া হয় নি। তাই মন্তেসরী বলছেন—"Freedom without organisation of work would be useless. The child *left free* without means of work would go to waste, just as a new-born baby. if

left free without nourishment, would die of starvation. The *organisation of work*, therefore, is the cornerstone of this new structure of goodness; but even that organisation would be in vain without the *liberty* to make use of it, and without freedom for the expansion of all those energies which spring from the satisfaction of the child's highest activities.[৪১]

রুশো ও মন্তেসরী

য়ুরোপের সমস্ত নূতন শিক্ষানীতির মূল উৎস হচ্ছে রুশোর 'এমিল্'। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, মন্তেসরী এ উৎস থেকে শক্তি সংগ্রহ করেছেন। রুশো স্বভাব অনুযায়ী শিক্ষার পক্ষপাতী, তিনি প্রত্যেক ছাত্রের একক শিক্ষায় বিশ্বাসী। তাঁর শিক্ষানীতিতে পীড়ন ও শাসনের স্থান নেই। ছাত্রই শিক্ষার কেন্দ্র। তার স্বাভাবিক উদ্যমই শিক্ষার প্রাণ। সংসারের আবিল পরিবেশ শিক্ষারম্ভের উপযুক্ত স্থান নয়। তাই শিশুকে সেই আবিল পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করেই শিক্ষা দিতে হবে। তিনি মানুষের স্বাভাবিক সততায় বিশ্বাসী, তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাধীনতাকে তিনি অত্যাবশ্যক মনে করেন। এ সব মূলনীতি মন্তেসরীর শিক্ষা-প্রণালীরও ভিত্তি। কিন্তু রুশোর সঙ্গে তাঁর প্রভেদও আছে। রুশোর মত প্রত্যেক ছাত্রকে তার নিজস্ব শক্তি ও আগ্রহ অনুযায়ী শিক্ষার কথা মন্তেসরীও বলেছেন, কিন্তু ছাত্রদের এমিলের মত সমস্ত সামাজিক পরিবেশ ও সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করবার তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী। মন্তেসরীর শিক্ষার কেন্দ্র হচ্ছে বালমন্দিরের প্রীতি, উৎসাহ, আনন্দ ও সহযোগিতাপূর্ণ সামাজিক আবেষ্টনী। যা কিছু কৃত্রিম তাই বিকৃত ও ত্যাজ্য—রুশোর এ মত মন্তেসরী গ্রহণ করেন নি। বরঞ্চ তাঁর শিক্ষার উপাদানগুলি অধিকাংশই কৃত্রিম সৃষ্টি।

মন্তেসরী ও অন্যান্য মনোবিজ্ঞানী

পেস্তালৎসীই প্রথম সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করেছিলেন মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে শিক্ষারীতিকে গড়তে। কিন্তু তাঁর মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান অনেকটা অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ ছিল বলে তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষারীতি অনেক ক্ষেত্রে হাস্যকর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এ বিষয়ে মন্তেসরীর রীতি অনেক বেশী বৈজ্ঞানিক। তিনি আধুনিক ফলিত মনোবিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্বগুলিকে সফলভাবে কাজে লাগিয়েছেন। তিনি

[৪১] Montessori, *Dr. Montessori's Own Handbook*, pp. 134-35

পূর্ববর্তী মনোবিজ্ঞানীদের পরীক্ষাগুলির ত্রুটি অনেকটা এড়িয়ে চলতে পেরেছেন। প্রেয়ার (Preyer) ও বল্ডুইন (Baldwin) প্রমুখ মনোবিজ্ঞানী ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মতা ও নির্ভুলতা পরিমাপের (measurement of sense acuity) যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন সেটাকে তিনি শিক্ষার উপায় হিসাবে ব্যবহার করে আশ্চর্য সাফল্য অর্জন করেছেন। সেগুঁই ও ফ্রোএবেল্এর কাছ থেকেই তাঁর ডিড্যাক্টিক্ মেটিরিয়াল্-এর ধারণা তিনি গ্রহণ করেছেন। তবে তাঁদের থেকে তিনি আরো অগ্রসর হয়েছেন এবং তাঁদের ত্রুটিগুলোও অনেকক্ষেত্রে এড়াতে পেরেছেন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সেগুঁই হস্তলিপি শেখাটা জ্যামিতি শিক্ষার উপর স্থাপিত করেছিলেন। এ ভুল মন্তেসরী করেন নি।[৪২] ফ্রোএবেল্-এর উপহার (Gifts)-গুলির চেয়ে মন্তেসরীর ডিড্যাক্টিক মেটিরিয়াল্গুলি আকারে বড়, সংখ্যাতেও বেশী এবং ফ্রোএবেল্এর উপহারগুলিতে কল্পনাবিস্তারের যে স্থান আছে মন্তেসরীর মেটিরিয়ালস্-এ তা নেই। ফ্রোএবেল্ শিশুর কল্পনা বিকাশের বিরোধী নন। মন্তেসরী কল্পনাকে বস্তু ও ঘটনার শাসনে শৃঙ্খলিত ও স্থমিত করবার পক্ষপাতী। ফ্রোএবেল-এ বহিঃপ্রকৃতি যতটা স্থান অধিকার করে আছে, মন্তেসরীতে তা নেই। ফ্রোএবেল্এর শিক্ষানীতির পেছনে এই একটি সুস্পষ্ট দার্শনিক মতবাদ বর্তমান যে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক জ্ঞানময়, করুণাময় ঈশ্বরের প্রকাশ। সর্বত্র তাই আছে নিয়মিততা, সুশৃঙ্খলা, সৌন্দর্য ও আনন্দ। তাঁর শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত দ্রব্য ও ঘটনার নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে একতার সূত্রটি আবিষ্কার করে সেই পরম-পুরুষকে অনুভব করা। মন্তেসরীর প্রণালীর পেছনে এমন সুস্পষ্ট ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদ নেই। তিনি তাঁর শিক্ষার উদ্দেশ্যকে আরো অনেকটা সঙ্কীর্ণ করে দেখেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী অনেক বেশী প্র্যাক্টিক্যাল্। তিনি চেয়েছেন শিশুর স্বাভাবিক ক্ষমতাকে তার স্বাভাবিক বিকাশের পথ ধরে পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে।

মন্তেসরীর শিক্ষাপদ্ধতির স্থান ও মূল্য

মন্তেসরীর শিক্ষাপদ্ধতি এখনও নূতন নূতন পরীক্ষার পথ ধরে অগ্রসর হয়ে চলেছে। মন্তেসরী একে চূড়ান্ত বলে কখনই মনে করেন নি। নাচ ও কাদার কাজকে তাঁর শিক্ষার সহায়ক বলে তিনি গ্রহণ করে নিয়েছেন। ধর্মশিক্ষার অভিনব পদ্ধতি নিয়েও পরীক্ষা চলছে। পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে মন্তেসরী-

৪২ Montessori, *The Montessori Method*, p. 256

প্রণালীতে শিক্ষাদানকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। মন্তেসরী বিশ্বাস করেন প্রত্যেক দেশের প্রয়োজন, রুচি, দৃষ্টিভঙ্গী ও ঐতিহ্য অনুযায়ী এ শিক্ষাপদ্ধতিরও পরিবর্তন, পরিবর্ধন, গ্রহণ ও বর্জন প্রয়োজন। তিনি ভারতবর্ষেও এসেছেন ও শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছেন। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস যদি তিনি এ দেশের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হতেন, তা হলে এ দরিদ্র দেশের শিশুদের সম্পূর্ণ উপযোগী সফল শিক্ষাপদ্ধতিও তিনি আবিষ্কার করতে পারতেন। তাঁর শিক্ষারীতি দরিদ্রদের জন্যই প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল, এ কথাটি তিনি স্মরণ রাখতে বললেও তাঁর অনুগামীদের অনেকে ভুলে যান। তার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে মন্তেসরী শিক্ষাকেন্দ্র ধনীর সন্তানদের ফ্যাশানেবল্ ইস্কুল'বলে গণ্য হচ্ছে। তাঁর ইন্দ্রিয়-শিক্ষার পদ্ধতি যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এবং ফলাফল দিয়েই শিক্ষাপদ্ধতির প্রকৃত বিচার হয়ে থাকে।

মন্তেসরী রীতির সমালোচনা হিসাবে বলা যায়—সম্ভবতঃ তিনি ইন্দ্রিয়-শিক্ষার উপর বড় বেশী জোর দেন। কল্পনা ও অনুভূতির বিকাশের দিকে তাঁর উপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কোন এক বিশেষ ইন্দ্রিয়ের পারদর্শিতা অন্য সমস্ত ক্ষেত্রেই শিক্ষার সহায়ক তাঁর এ বিশ্বাসের পেছনে রয়েছে শিক্ষার সংক্রামতা (Transfer of Training) নামক বিতর্কমূলক মতবাদ। তাঁর শিক্ষায় সাহিত্য-চর্চার স্থান অতি সঙ্কীর্ণ। শিক্ষার সামাজিক মূল্য সম্বন্ধে তিনি যেন যথেষ্ট সচেতন নন। এ বিষয়ে ডিউইর মতবাদ সম্ভবতঃ অধিকতর সত্য। মন্তেসরীর শিক্ষানীতির আবিষ্কারের মূলে ছিল অল্পবুদ্ধি ও বিকলাঙ্গদের শিক্ষা সম্বন্ধে পরীক্ষা। তাই মন্তেসরীর শিক্ষা-নীতিতে সহজতা এবং কার্যকারিতার দিকে ঝোঁক বেশী। কেউ কেউ মনে করেন মন্তেসরী স্বল্পবুদ্ধি ও স্বাভাবিক শিশুর মধ্যে প্রভেদটা সব সময় স্মরণ রাখেন না। মন্তেসরী মনে করেন মানব-সভ্যতা ক্রমে ক্রমে যেমন কতকগুলি স্তর ও অবস্থা অতিক্রম করে এসেছে, শিশুর শিক্ষাও অনুরূপ অবস্থা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে। তাই তাঁর শিশুশিক্ষায় প্রাথমিক পেশীক্রিয়া ও ইন্দ্রিয় শিক্ষার উপর জোর। এ মতবাদ সম্পূর্ণ সত্য কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা যেতে পারে।[৪৩] তবে এ সমস্ত সমালোচনা সত্ত্বেও এ কথা স্বীকার করতেই হবে—বর্তমান যুগে শিক্ষা সম্বন্ধে যত পরীক্ষা হয়েছে তার মধ্যে মন্তেসরীর পরীক্ষা একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে।

---

৪৩ Rusk, *Doctrines of Great Educators*, p. 236

জন ডিউই—দার্শনিক ও শিক্ষাব্রতী (১৮৫৯-১৯৫২)

পুরাতন পৃথিবীর নূতন আবিষ্কৃত গোলার্ধ অ্যামেরিকা স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, নূতন পরীক্ষায় উদ্যোগী, বিজ্ঞানের শিক্ষায় অগ্রসর, ফলাফল দ্বারা সত্যনির্ণয়ে অভ্যস্ত। সেই গণতন্ত্রে ও প্রগতিতে বিশ্বাসী অ্যামেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক জন ডিউই। তাঁর শিক্ষানীতি তাঁর জীবন-দর্শনের সুদৃঢ় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। শিক্ষাব্রতী ডিউইর প্রভাব শুধু অ্যামেরিকায় নয়, দূর-প্রাচ্য এমন কি রাশিয়াতেও অসামান্য।[১] ডিউই আশাবাদী, প্রগতিতে বিশ্বাসী, জীবনধর্মী ও তাঁর দর্শন ও শিক্ষানীতি সমাজ-জীবনের আদর্শ ও প্রয়োজনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। বর্তমান যুগে যে কয়জন দরদী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষাব্রতী শিক্ষার নিরানন্দ, নিষ্ঠুর ও প্রাচীন অ-মনোবৈজ্ঞানিক রীতি পরিবর্তন করে প্রাণচঞ্চল শিশুর আগ্রহ, ঔৎসুক্য ও ক্রিয়াশীলতাকে শিক্ষারীতির কেন্দ্র বলে স্বীকার করে নূতন প্রাণবন্ত শিক্ষারীতির প্রবর্তনে সাহায্য করেছেন ডিউই তাঁদের মধ্যে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত।

জন ডিউই ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা-ভারমণ্ট-এর অন্তর্গত বার্লিন্টনে গ্রাম্য পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল ও কৈশোরে বিদ্যালয়ে তাঁর প্রতিভার কোন স্ফুরণ লক্ষিত হয়নি। বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে তিনি ভারমণ্ট বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। সেখানে থাকতে জীববিজ্ঞান সম্বন্ধে ডারুইনের ক্রম-বিবর্তনবাদ টি. এইচ. হাক্সলের বিজ্ঞান-বিষয়ক একটি পাঠ্যপুস্তকে পাঠ করে তাঁর ঔৎসুক্য জাগ্রত হয়। ডারুইনের সাবধান পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার পদ্ধতি তাঁকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে। ধার্মিক খ্রীষ্টান পরিবারে তাঁর জন্ম। বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব ও ডারুইনের বিবর্তনবাদের মধ্যে যে বিষম অসামঞ্জস্য আছে, তা তাঁর চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করে। জীবনের গতি কোন ঐশী বুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, না উহা জড়শক্তি দ্বারাই চালিত এ প্রশ্নের মীমাংসার জন্য তরুণ ডিউই জীববিদ্যা ও দর্শন সম্বন্ধে পুস্তকাদি গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করতে শুরু করেন। এর ফলে উনিশ বছর বয়সেই দার্শনিক বলে তাঁর কিছু খ্যাতি লাভ হয়।

তিনি কিছুদিন এক গ্রাম্যস্কুলে মাষ্টারী করেন। কিন্তু তাঁর জাগ্রত জ্ঞানস্পৃহা

---

১ G. H. Thompson, *A Modern Philosophy of Education*, p. 77

তাঁকে বাল্টিমোরের নতুন গবেষণামূলক বিশ্ববিদ্যালয় জন্‌স্ হপ্‌কিন্‌সে আকর্ষণ করে। এখানে তিনি প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ্ ষ্ট্যান্‌লী হল্ ও খ্যাতিমান্ দার্শনিক চার্লস্ পিয়ার্স-এর সংস্পর্শে আসেন। ষ্ট্যান্‌লী হলের সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী ও পিয়ার্সের প্র্যাগ্‌ম্যাটিক্ মতবাদ তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। জি. এস্. মরিসন্ নামে আর একজন দার্শনিকের সংসর্গ তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে এবং তিনি হেগেলের জড় ও জীবন, অচেতন ও চেতন একই মূলীভূত চিৎশক্তির প্রকাশ (Absolute Idealism) এই মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁর মনে যে সংশয় ও দ্বন্দ্ব জেগেছিল তার সমাধান এতে খুঁজে পান। কিন্তু এই ভাববাদী মতবাদ তিনি স্থায়িভাবে গ্রহণ করেন নি। বরং এ মতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী প্র্যাগ্‌ম্যাটিজ্‌ম্‌ই তিনি পরবর্তীকালে তাঁর দর্শনের মূল ভিত্তি বলে গ্রহণ করেন। ভাববাদীরা (idealist) বলেন, সত্য স্থির, সনাতন, অপরিবর্তনীয়। প্র্যাগ্‌-ম্যাটিজ্‌ম্ বলে, সত্য জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে সংযুক্ত। যন্ত্র জীবনের সমস্যা-সমাধানের অনুকূল তাই সত্য,—তাই তা পরিবর্তনশীল, গতিশীল ও পরীক্ষা দ্বারা আবিষ্কার-সাপেক্ষ (Experimentalism)। জীবনের পরিবর্তনশীল প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য জ্ঞানের কোন মূল্য নাই।

জনস্ হপ্‌কিন্‌স্ থেকে ডিউই মিশিগান্ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষক হয়ে যান। সেখান থেকে যান মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আবার মিশিগান ফিরে আসেন। সেখান থেকে শিকাগোতে যান। এ সময় তাঁর মনোবিজ্ঞান-মূলক প্রথম গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়—তখনও ভাববাদী প্রভাব তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

কিন্তু এ সময় উইলিয়ম্ জেমস্-এর মতবাদ তাঁর মনে পরিবর্তন আনতে শুরু করে। উইলিয়ম্ জেমস্ হেগেলের তীক্ষ্ণ সমালোচক। হেগেলের মতে এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পরিবর্তনই ভগবানের চিন্তার মধ্যে সম্পূর্ণ। তাই বাস্তবিকপক্ষে নূতন কিছুই ঘটে না। কিন্তু এ সময় অ্যামেরিকায়, বিশেষ করে মধ্যপশ্চিম রাজ্য-গুলিতে বিপুল পরিবর্তন চলছিল। দেশের উদ্যোগী ও সাহসী লোকদের কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা দেশের অভূতপূর্ব সমৃদ্ধিসাধন ঘটছিল, সমাজজীবনেও বিপুল আলোড়ন দেখা দিয়েছিল। ডিউইর মত তীক্ষ্ণধী মানুষের মনে এ বিপুল পরিবর্তনের তাৎপর্য সহজেই প্রতিভাত হোল। তিনি বুঝলেন এ সৃষ্টি ভগবানের চিন্তার মধ্যেই সম্পূর্ণ, এ মতবাদ একটি ভাবাবেগ মাত্র। মানুষ নিজ উদ্যমের

দ্বারা নিত্যই নূতন সৃষ্টি করে। মানুষের সৃষ্টির সচলতা নির্ভর করে পরীক্ষার উপরে। সামাজিক জীবনের মধ্যেই মানুষের প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতায় সৃষ্টি নূতন উন্নতির পথে এগিয়ে চলে। এই উদ্যম ও সাফল্যের আশায় অগ্রগতির কুফলটাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি দেখেছিলেন যে বহু ব্যর্থতা ও অশ্রুজলের মূল্য দিয়ে এ সাফল্য ক্রয় করতে হয়। যারা এ সংগ্রামে হেরে গেল, যারা নিষ্পেষিত হয়ে গেল, তাদের কথা তিনি চিন্তা করতে লাগলেন। যারা নীচে পড়ে রইল, শিক্ষাদ্বারা তাদের জীবনকে কি করে সার্থক করে তুলতে হবে তাদের জীবন-বিকাশের সুযোগ কি করে বাড়াতে হবে, এ সব কথা তিনি ভাবতে শুরু করলেন। বাস্তবিক পক্ষে তখন থেকে তাঁর মনে এই কথাই স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে দর্শন বিশুদ্ধ আকাশবিহার নয়—মানুষের ও সমাজের সমস্যা থেকেই দর্শনের সৃষ্টি ও সামাজিক ও সাংসারিক সমস্যা ও সংঘর্ষের মীমাংসাই দর্শন তথা সমস্ত জ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য। যে তিনটি শক্তি থেকে সামাজিক সংঘর্ষের উদ্ভব তা হচ্ছে বিজ্ঞান, শ্রম ও গণতন্ত্র (science, industry, and democracy). এই শক্তিত্রয়ের সামঞ্জসীকরণই সমস্ত দর্শনের উদ্দেশ্য।

শিকাগোতে থাকা কালে সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারেই তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় ক্লোরা কুকের নতুন ধরণের বিদ্যালয়ের প্রতি। ১৯০১ সালে তিনি তাঁর স্ত্রীর সহযোগিতায় নতুন একটি বিদ্যালয় খোলেন, তার নাম দিলেন ল্যাবরেটরী স্কুল। এটিই বাস্তবিক পক্ষে প্রথম আধুনিক গবেষণামূলক বিদ্যালয়। এখানেই তাঁর শিক্ষাদর্শ ও পদ্ধতিগুলির বাস্তব পরীক্ষার সুযোগ তিনি পান। প্রথম মাত্র ১৬টি ছাত্র ও দুজন শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়ে বিদ্যালয় শুরু হয়। প্রথম সাত বৎসর বহু ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে স্বামী-স্ত্রী এ বিদ্যালয়টিকে বাঁচিয়ে রাখেন ও সযত্নে একে পোষণ করেন। পরে আর একজন উৎসাহী শিক্ষিকা এলা ফ্ল্যাগের সহায়তা তিনি পান। তিনিই বহু বৎসর এ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা (Principal) ছিলেন। ডিউই ছিলেন সঞ্চালক (Director), ডিউই-পত্নী ১৯০১ সাল থেকে ভাষাশিক্ষা বিভাগের প্রধানা ছিলেন। ১৯০২ সালেই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বেড়ে হয় ১৪০ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট দশজনকে সহকারী শিক্ষক হিসাবে পাওয়া যায়। এ বিদ্যালয় এখন সমস্ত অ্যামেরিকায় খ্যাতিলাভ করেছে, এবং এর নাম এখন ডিউই বিদ্যালয়।

এখানে বিদ্যার্থীদের বয়স চার থেকে চৌদ্দ। হার্বার্টের নিতান্ত বাঁধাধরা

পদ্ধতি এখানে অনুসৃত হয় না। ছাত্রছাত্রীরা এখানে বিভিন্ন কাজ ও পরীক্ষার মধ্য দিয়েই শিক্ষালাভ করে (activity programme)। পড়া, লেখা, অঙ্ক সব শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ (interest) অনুসরণ করে তার জীবনের সমস্যা সমাধানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, কাজেই আগের-থেকেই-নির্দিষ্ট করা, অপরিবর্তনীয় পাঠ্যসূচী এখানে অনুসৃত হয় না। বিদ্যালয়টি একটি সজীব সামাজিক সংস্থা, শিক্ষক ছাত্র সকলেই যেন একটি বৃহৎ সংসারের অঙ্গ। শিক্ষাটা সেই জীবন্ত গোষ্ঠী-জীবনেরই অঙ্গ, ভবিষ্যৎ অনির্দিষ্ট জীবনের জন্য প্রস্তুতি নয়। এখানে শিশু নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা মাত্র নয়—শিক্ষক এখানে উঁচু থেকে বিদ্যা বর্ষণ করেন না—ছাত্র শিক্ষক মিলে জীবনের বাস্তব সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে আগ্রহ ও ক্রিয়ার ভিত্তিতে শিক্ষা এগিয়ে চলে। ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয় ভাগ করে ক্লাশ নেওয়া হয় না। সেখানে শিশুর শিক্ষা হচ্ছে কি করে সমাজ-জীবনের কুশল কর্মী হওয়া যায়। এখানে প্রতিযোগিতা ও ব্যক্তিগত উৎকর্ষ লাভের চেষ্টা গৌণ, গোষ্ঠী-জীবনে সহযোগিতা দ্বারা সমস্যার সমাধান বাস্তবের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ঘনিষ্ঠ পরিচয়, এ শিক্ষার বৈশিষ্ট্য। বিদ্যালয় এখানে সমাজ-জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। গঠনমূলক ক্রিয়া ও আলোচনাতে শিশুকে উৎসাহ দেওয়া হয়—এবং সমাজের ঐতিহ্য ও ধারাকে অস্বীকার না করে তাকে বর্তমানের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করবার শিক্ষাই তারা সমষ্টি-গত উদ্যমের মধ্য দিয়ে লাভ করে। এ বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়েই নীতিও গণতন্ত্রের শিক্ষায় শিশুরা বিশ্বাসী হবে, ব্যক্তি ও সমাজ, শ্রম ও সৃষ্টি, শিশুর মনোবৃত্তি ও পাঠ্য বস্তুর মধ্যে সমন্বয় ঘটবে ডিউই আন্তরিক ভাবে এ আশা পোষণ করেন। শুধু মাত্র শিক্ষাতত্ত্বে ডিউইর আগ্রহ নেই। তিনি এ বিদ্যালয়ের পরীক্ষার মধ্য দিয়েই প্রকৃত শিক্ষাপ্রণালীর অনুসন্ধান করেছেন। মানুষের মর্যাদায় বিশ্বাসী, গোষ্ঠীজীবনে বিশ্বাসী, মানুষের শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কুশলী স্বাধীন মানুষ সৃষ্টিই তাঁর শিক্ষা-নীতির উদ্দেশ্য।

বহু পুস্তক তিনি রচনা করেছেন। তাঁর নূতন শিক্ষানীতি দেশে ও বিদেশে বহু শিক্ষাব্রতীকে নূতন পরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

ডিউইর দৃষ্টিভঙ্গী সামগ্রিক। তিনি বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বিচ্ছিন্ন সঞ্চয় মাত্র মনে করেন না। এ বিষয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের সমগোত্রীয়। তাঁর মতে দর্শন এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর শ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন করে। অতীতে দর্শন সম্বন্ধে মিথ্যা

ধারণাই বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে বিভেদসৃষ্টির জন্য দায়ী। তাই তিনি নূতনতর দর্শনের ইঙ্গিত দিয়েছেন তাঁর "রি-কনস্ট্রাক্‌শন্ ইন ফিলজফি" গ্রন্থে। প্রাচীনদের ধারণা—দর্শন হোল সত্যে স্থিতি। সত্য অচলপ্রতিষ্ঠম্, অচলম্, ধ্রুবম্। তা এক ও অপরিবর্তনীয়। যা সত্য তা আমাদের জীবনের হাসি-কান্নার ঊর্ধ্বে, আমাদের বাসনা-কামনার মালিন্য তাকে স্পর্শ করে না। এ সত্যকে লাভ করা যায় ইন্দ্রিয় দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে নয়, পরীক্ষা দিয়ে নয়। সত্যলাভের পথ হচ্ছে ঋষি-দৃষ্টি, মিস্‌টিক্ ইনট্যুইশান্। প্রাচ্যের এ দৃষ্টিভঙ্গীর ঘোরতর বিরোধী অ্যামেরিকান্ ডিউই। এখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রভেদ দুস্তর।

তাঁর মতে সত্য পরিবর্তনীয়, তা জীবনের সুখদুঃখ সমস্যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দর্শনকে মনে রাখতে হবে তার এই সমস্যা ও তার বিষয়বস্তু সবের মূলে আছে গোষ্ঠীগত জীবনের সংঘর্ষ সংঘাত। কাজেই মানব-জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দর্শনের বিশেষ বিশেষ সমস্যাগুলির পরিবর্তন ঘটবেই।[২] আজ দর্শন যদি তার প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে থাকে, যদি তা পূর্বের ন্যায় শ্রদ্ধা আকর্ষণে অসমর্থ হয়, তার কারণ তা আর 'জীবন্ত' নয়। দর্শনের বিষয়বস্তু স্থান ও কালের সম্পর্ক বর্জিত এ দাবী দর্শনকে অবাস্তব করে তুলেছে। প্রাচীন দার্শনিক মতগুলি প্রাচীন বলেই তাদের বিশেষ মাহাত্ম্য নেই, আবার প্রাচীন বলেই যে তাদের অস্বীকার করতে হবে এ কথারও মানে নেই। তারা যদি মানুষকে আজ আকর্ষণ না করে, তার কারণ বর্তমান যুগের মানুষের সমস্যা সমাধানে তারা অসমর্থ। যতদিন তারা জীবনের সমস্যা সামাধানে সহায় ততদিনই তারা জীবন্ত।

"সত্যের নিকষ-পাথর হচ্ছে যে তাকে কাজে লাগানো যায়" কি না তার বিচার। এতেই তার কার্যকারিতা।[৩] উইলিয়ম জেমসের এই প্র্যাগম্যাটিক্ মতবাদ ডিউইরও বটে। সত্য হচ্ছে কার্যসিদ্ধির হাতিয়ার। তাই ডিউইর মতবাদকে 'ইন্‌স্ট্রুমেণ্টালিজম্'ও বলা হয়। এ মতবাদের দৃষ্টি মানুষেরজীবন-সমস্যা সমাধানের দিকে। তাই একে হিউম্যানিজমও বলা হয়। বর্তমান যুগ

---

২ John Dewey, *Reconstruction in Philosophy*—Introduction (Mentor Rook), P. 8.

৩ William James. *Pragmatism*

বিশুদ্ধ বুদ্ধির কস্‌রতে আগ্রহশীল নয়। বিংশ শতকের নূতন দর্শন চাইছে বুদ্ধিকে মানব-কল্যাণে নিয়োগ করতে। যে নতুন সংস্কারে হাত দিতে হবে, তার কাজ বুদ্ধিকে একদম তৈরী ছাঁচ বলে গ্রহণ করা নয়। এর কাজ হচ্ছে বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান পূর্ণতর জ্ঞান যে পদ্ধতির দ্বারা সম্ভব হয়েছে, যথা—পরীক্ষা, নিরীক্ষা, বাস্তবের সাথে মিলিয়ে সব ধারণাটাকে গ্রহণ,—সমস্ত মানসিক ও নৈতিক বিষয়ের আলোচনার ক্ষেত্রেও সেই সকল পদ্ধতির সম্প্রসারণ করা।"[৪]

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বিজ্ঞান ও দর্শন এবং বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে তার কারণ বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে কৃত্রিম বিভেদ। কখনো কখনো এ কথা মনে করা হয়ে থাকে যে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নিম্নস্তরের। তা বাস্তব জীবনের পরিবর্তনশীল বিষয়ের পরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করে থাকে। কিন্তু দর্শন ও নৈতিক আদর্শের জগৎ উচ্চতর। তার সত্য অপরিবর্তনীয়। বিজ্ঞানের পরীক্ষা নিরীক্ষার পদ্ধতি সে রাজ্যে অচল। এই বিশ্বাসের ফল হয়েছে এক অদ্ভুত জোড়াতালি। বর্তমান যুগের মানুষ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সত্যকে অস্বীকার করতে পারছে না। এ সব আবিষ্কারের ফলে তার জীবনে যে নানা সুবিধা ও আরাম এসেছে তা সে খুশী হয়েই মেনে নিয়ে বিজ্ঞানের জয়গান করছে। আবার তার ভীরু মন ঈশ্বর, নীতি, ধর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে যে গভীর সংস্কার বহুকাল থেকে চলে আসছে তাকেও ঝেড়ে ফেলতে পারছে না, অথবা বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসার পদ্ধতি সেই 'আত্মিক' রাজ্যের সমস্যা আলোচনায় ব্যবহার করবার সাহস সঞ্চয় করতে পারছে না। তার ফলে তার জীবনকে দুটো পরস্পর-বিচ্ছিন্ন প্রকোষ্ঠে সে ভাগ করে একটা অলীক শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করছে। এক জগতের রীতি হচ্ছে প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা, সংশয়, আর এক জগতের রীতি হচ্ছে, বিশ্বাস, গ্রহণ ও সমর্থন। এ জোড়াতালিকে ডিউই মানসিক ভীরুতা ও আলস্য বলেই ঘৃণা করেছেন। বিজ্ঞান তার সাধনার ফল 'কেজো' জগতেই আবদ্ধ রাখবে, তার জ্ঞান, তার সিদ্ধান্ত নিতান্তই আত্মিক জগতের ঠাকুরঘরের রুদ্ধ দুয়ারের সামনে সঞ্চিত হতে থাকবে এ অসম্ভব। বিজ্ঞানের প্রভাব সমগ্র জীবনের সমস্যা সমাধানেই দেখা দেবে। এর ফলে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হতে বাধ্য। বিজ্ঞানের রীতি হোল পরীক্ষা, প্রশ্ন, আলোচনা। এতে প্রাচীন সংস্কারের মূল আলোড়িত হবে এটাই বাঞ্ছনীয়। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডার্লিংটন তাঁর একটি ভাষণে

---

৪ John Dewey, *Reconstruction in Philosophy*

বলেছিলেন, "অনেক সময় নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিকে শিথিল ভাবে মনে করা হয় যেন পুরাতনের বৃহৎ জ্ঞানভাণ্ডারে নূতন তথ্য সংগ্রহ মাত্র। একথা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর আবিষ্কারগুলির সম্বন্ধে হয়তো সত্য। কিন্তু মৌলিক আবিষ্কারগুলি সম্বন্ধে একথা সত্য নয়।...এ জাতীয় নূতন জ্ঞান পুরাতনকে ধ্বংস বা গভীরভাবে পরিবর্তন ভিন্ন কখনও সম্ভব হয় না।" তাঁর ভাষণের শেষে তিনি বলেছেন, "আমাদের দরকার এমন একটি মন্ত্রী-দপ্তর যা আমাদের বিচলিত করবে, যার কাজ হবে নিয়মিত ও নির্দিষ্ট ভাবে মনকে নাড়িয়ে দেওয়া, প্রাচীন ও প্রচলিত রুটিন্‌কে পাল্টে দেওয়া, আত্মতৃপ্তি ও আলস্যের আরামে বাধা দেওয়া।"[৫] ডিউই এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। তিনি জ্ঞানের রাজ্যে 'খোলা পথের পথিক'। তাঁর মতেও প্রাচীন অভ্যাসের সংস্কার বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসার ঔৎসুক্যকে নিয়ন্ত্রণ করে দেয়; এ হচ্ছে ক্রিয়াশীল বিজ্ঞানীর পথে নূতন আবিষ্কারের পথে, সব চেয়ে বড় বাধা। তার কারণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আবিষ্কার ও জিজ্ঞাসা এ দুইই সমার্থবাচক ক্রিয়া। জ্ঞান হচ্ছে সত্যের পশ্চাদ্ধাবন, অব্যয় ও অপরিবর্তনীয়কে স্থায়িভাবে সংগ্রহ নয়। তাই যাঁরা শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী তাঁরা তাঁদের নূতন আবিষ্কারকে সকলের অপেক্ষা আগে ভয় ও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে থাকেন।[৬]

ডিউই 'চরৈবেতি' মন্ত্রের উপাসক এবং তাঁর নূতন দর্শনের মূলেও এই 'চরৈবেতি' মন্ত্র। বাস্তবিক পক্ষে দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে বিজ্ঞান ও দর্শনে কোন পার্থক্য নেই। তবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্র ক্ষুদ্রতর। যখন কোন নির্দিষ্ট জ্ঞান প্রত্যক্ষ-ভাবে কোন বিশিষ্ট ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় তখন তাকে বলা হয় 'বিজ্ঞান'। আর যখন কোনও জ্ঞানের তত্ত্ব বিস্তৃততর হয় এবং তাকে নির্দিষ্ট কোন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করা যায় না তখন তাকে বলা যাবে 'দর্শন'। এতে দর্শনের অপ্রয়োজনীয়তা প্রমাণ হয় না। বরং বলা যায় দর্শন্‌ হচ্ছে জীবন-সমস্যা সমাধান-কল্পে সত্যানুসন্ধিৎসার সাধারণ মনোবৃত্তি যা সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত আলোচনার ভিত্তিতে অগ্রসর হয়ে থাকে।

ডিউই মনে করেন 'কেজো' ও সাংসারিক, এবং সত্য ও পারমার্থিক (the useful *vs.* the true) এই যে কৃত্রিম ভাগ, এটা সামন্ততান্ত্রিক মনোবৃত্তির

---

৫ C. D. Darlington, *Conway Memorial Lecture on the Conflict of Society and Science*

৬ John Dewey, *Reconstruction in Philosophy*—Introduction, pp, 14-15

পরিচায়ক। এককালে গ্রীসের রাজ্যগুলিতে, বিশেষ করে এথেন্সে, 'দাস'দের কর্তব্য ছিল জীবনের 'স্থূল' ও প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি কায়িক শ্রম দ্বারা মেটানো। এরা কাজ করত আর অবসর-সুখ-বিলাসী উচ্চবংশীয়দের কর্তব্য ছিল সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্ত্বের মনন, চিন্তন, নিদিধ্যাসন। ডিউইর মতে আজ এই গণতন্ত্রের যুগে এ বিভাগ অচল। চিন্তার জগতে, জ্ঞানের জগতে এ প্রকার কোন জাতিভেদের তিনি ঘোর বিরোধী। বাস্তবিকপক্ষে আমরা দেখব তাঁর শিক্ষাদর্শের এটি একটি মূলসূত্র যে শিক্ষা হবে স্বাধীন ও গণতন্ত্রসম্মত। তাঁর মতে প্রাচীন শিক্ষানীতির এ একটা প্রকাণ্ড দোষ যে, তা একনায়ক-তান্ত্রিক 'টোটালিটেরিয়ান্ (totalitarian)।[৭]

ডিউইর দৃঢ় প্রত্যয় যে, জাতীয় উন্নতি ও মানব-সমাজের স্থায়ী কল্যাণ সুপরিকল্পিত সুশিক্ষা-ব্যবস্থা দ্বারাই সম্ভবপর। তিনি এ কথা বিশ্বাস করেন যে প্রগতি-পন্থী সুষ্ঠু শিক্ষাই গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ। "সামাজিক উন্নতি ও সংস্কারের সর্বপ্রধান উপায় হচ্ছে সুশিক্ষা। শুধু মাত্র আইনপ্রণয়ন বা শাস্তির ভয় দেখিয়ে যে সংস্কার সাধিত হয় তা ক্ষণস্থায়ী ও নিষ্ফল। সুশিক্ষা দিয়ে সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গী অভ্যস্ত হলেই সমাজের স্থায়ী সংস্কার ও উন্নতি সম্ভব। গণতন্ত্রবাদ একটি রাজনৈতিক মতবাদ মাত্র নয়, এ হচ্ছে একটি উন্নততর জীবনযাত্রা-পদ্ধতি। এ জীবনযাত্রার আদর্শ হচ্ছে সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগমন।"[৮]

শিক্ষা যে একটি প্রবলতম সামাজিক শক্তি—এ কথা গণতন্ত্রী ও একনায়কতন্ত্রী সমস্ত দেশেই স্বীকৃত। তাই একনায়কতন্ত্রী দেশের শাসকেরা দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই প্রথম আঘাত হানেন। তাঁরা ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ও স্বাধীন চিন্তার আগ্রহকে সর্বপ্রথম দমন করেন, দেশের সর্বত্র শাসকগোষ্ঠীর মতবাদের সমর্থক ছাত্রের দলগঠনে প্রয়াসী হন। একনায়কতন্ত্রী দেশে পরিবর্তনের ফল সহজে দৃষ্টিগোচর হয়, কারণ বইপত্র পুড়িয়ে, শিক্ষকদের জেলে পুরে, শাস্তি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে স্বাধীন মতপ্রকাশের আগ্রহ দমন করা অনেক সহজ। কিন্তু সাহিত্যকারের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা-সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব-বিকশিত অগ্রসর সমাজ-ব্যবস্থা সৃষ্টি অনেক বেশী যত্ন, সময় ও সাধনা-সাপেক্ষ। কিন্তু স্বাধীন জীবন-ব্যবস্থাকে

---

৭ John Dewey, *Democracy & Education*, p. 100

৮ Dewey, *Education To-day*, Introduction by Josepb Ratner

যদি আমরা মূল্যবান মনে করি, তবে সেই কঠিন দুর্গম পথেই মানব-কল্যাণকামী শিক্ষা-ব্রতীকে অগ্রসর হতে হবে।

শিক্ষার সঙ্গে সমাজ-জীবনের এ গভীর সম্বন্ধের কথা বর্তমানের প্রত্যেক শক্তিকামী রাষ্ট্রই বোঝে। এর জন্যেই নতুন রাষ্ট্রতন্ত্রে শিক্ষা নতুন মর্যাদা লাভ করেছে। শুধু যে শিক্ষার পরিধিরই বিস্তার ঘটেছে তা নয়—তার আদর্শ ও বিষয়বস্তু যাচ্ছে বদলে। "সংগঠনের শ্রেষ্ঠ যন্ত্র হিসাবে বিদ্যালয়গুলির দিকে বর্তমান রাষ্ট্র অধিকতর দৃষ্টি দিচ্ছে এবং নতুন চোখে তাদের দেখতে শিখছে। আজ সব জাতিই জনসাধারণের শিক্ষার গতিনির্ধারণ ও শাসনকে রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে কচ্ছে। কারণ এ বোধ সর্বত্র এসেছে যে, কোন জাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও শিল্পগঠন, স্বাস্থ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে উন্নতি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধির সঙ্গে শিক্ষা-ব্যবস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।[৯]

শিক্ষা একটি জীবন্ত সামাজিক ক্রিয়া। 'ছাত্র তথ্য-সংগ্রহের নিষ্ক্রিয় ভাণ্ড মাত্র, শিক্ষকের দায়িত্ব হচ্ছে প্রাচীন সঞ্চিত জ্ঞানের অমৃতভাণ্ড উপুড় করে ছাত্রের নিরুৎসুক মনকে ভরিয়ে তোলা'—এ প্রাচীন মতকে ডিউই সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। প্রাচীন শিক্ষাদর্শ, তার উদ্দেশ্য, তার রীতি ও তার বিষয়বস্তু কি? নূতন শিক্ষানীতিই বা কি? এ দুই-এর মধ্যে প্রভেদ ডিউই খুব সুস্পষ্ট করেই বর্ণনা করেছেন। প্রাচীন শিক্ষার বিষয়বস্তু হচ্ছে কতগুলি তথ্য বা নিপুণতার সমষ্টি যা অতীতকাল থেকে অনুশীলিত হয়ে আসছে। বিদ্যালয়ের কাজ তাই হচ্ছে এই অতীত ঐতিহ্যকে নূতন বংশধরদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। অতীত কাল থেকে কতগুলি নৈতিক আদর্শ ও ব্যবহারের সূত্র গৃহীত হয়ে এসেছে। নীতি-শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই প্রাচীন আদর্শ অনুযায়ী ছাত্রদের ক্রিয়া ও ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তোলা। ছাত্রেরা অনিচ্ছুক, অলস ও দুষ্টপ্রকৃতি। তাই শিক্ষকের কাজ হচ্ছে শাসন-পীড়ন দ্বারা প্রাচীন জ্ঞান-সঞ্চয় ও প্রাচীন আদর্শ অনুযায়ী ব্যবহারগুলি পুনঃপুনঃ আবৃত্তি ও অনুকরণের দ্বারা ছাত্রদের আয়ত্ত করিয়ে দেওয়া। তাই শিক্ষক হবেন শাসনে দক্ষ ও ছাত্র-গোযূথতাড়নে পটু। আর ছাত্রদের হওয়া চাই বাধ্য, বিনীত ও গ্রহণেচ্ছু। পুস্তকেই প্রাচীন জ্ঞান ও আদর্শ লিপিবদ্ধ, তাই পুস্তকই হচ্ছে শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। এই পুস্তকের সঙ্গে শিক্ষকের সম্পূর্ণ পরিচয়

---

৯ Ellwood. P. Cubberly, *Studies in Comparative Education.*

থাকতে হবে, কারণ তাঁর শিক্ষণ-ক্রিয়ার মাধ্যমেই শিশুরা সত্যিকার শিক্ষালাভ করতে পারবে।

এ প্রাচীন শিক্ষাদর্শ যে রক্ষণশীল মানুষদের প্রিয় তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কারণ এ জাতীয় বয়স্ক ব্যক্তিরা নিজের ইচ্ছা ছোটদের উপর চাপানোটাই পছন্দ করেন। তাঁদের আদর্শ ও অভ্যাস চিরদিন আদৃত হোক—এ ইচ্ছার মধ্যে তাঁদের কায়েমী স্বার্থ আছে, এবং তাই তাঁরা কোন নূতনত্ব বা পরিবর্তনের বিপক্ষে।[১০]

কিন্তু নিতান্ত সঙ্গত কারণেই এই প্রাচীন শিক্ষাদর্শ সমালোচনার যোগ্য। ডিউই বলেছেন (১) এ শিক্ষা উপর থেকে জোর করে চাপানো। (২) এতে বয়স্কদের রুচি ও আদর্শ মানতে বাড়ন্ত শিশুদের কাছ থেকে অসঙ্গতভাবে দাবি করা হয়। (৩) এতে শিশুর শক্তি, সামর্থ্য, ইচ্ছা ও আগ্রহের কোন বিবেচনা নেই। শিক্ষার বিষয়বস্তু ও শিক্ষাদানের পদ্ধতি দুইই কিশোর ছাত্রের শক্তি ও আগ্রহের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। তাই ছাত্রের শিক্ষাবিষয়ে কোন স্বাভাবিক আনন্দ থাকে না। (৪) ছাত্রেরা যখন আগ্রহশূন্য তখন শিক্ষাদান-প্রণালী কঠোর ও নির্মম হওয়ারই আশঙ্কা। (৫) ছাত্রদের সামর্থ্য ও আগ্রহের সঙ্গে এ শিক্ষা সম্পর্কশূন্য, কাজেই ছাত্রেরা নিতান্তই নিষ্ক্রিয় গ্রাহক মাত্র। (৬) শিক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণ স্থাণুবৎ (static), কারণ শিক্ষার বিষয়বস্তু একেবারে তৈরী মাল বলেই মনে করা হয়। অতীতে এই শিক্ষার বিষয়গুলি কি করে নির্ধারিত হয়েছে—এ সম্বন্ধে কোন বিবেচনা করা হয় না এবং বর্তমানে সমাজ-জীবনে যে পরিবর্তন ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে যে পরিবর্তন ঘটবে, শিক্ষা সেই জীবনের প্রয়োজন অনুযায়ী কিনা এ কথাও ভেবে দেখা হয় না। (৭) এ শিক্ষা অতীত সমাজ-জীবনের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ফল এবং সেই সংস্কৃতিরই পরিপোষক। একথা ধরে নেওয়া হয় যে ভবিষ্যতের সমাজজীবন ও আদর্শও সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত থাকবে।[১১]

এই প্রাচীনপন্থী শিক্ষাব্যবস্থার তুলনায় নূতন ও অগ্রসরমান শিক্ষাপদ্ধতির বিশিষ্ট লক্ষণ কি? ডিউই বলেছেন, নানা পার্থক্য সত্ত্বেও আধুনিক ও অগ্রসর

---

১০ John Dewey. *Experience and Education*, Ch. Traditional or Progressive Education.

১১ John Dewey, *Education Today*, Introduction by Joseph Ratner.

শিক্ষাপদ্ধতিগুলির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—এতে বাইরে থেকে চাপানো প্রাণহীন ঐক্যের (uniformity) পরিবর্তে আছে স্বতঃপ্রকাশ ও ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ এবং শাসন-তাড়নের পরিবর্তে আছে স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া; পুস্তক ও শিক্ষকের কাছ থেকে জ্ঞানলাভের পরিবর্তে আছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে সত্যিকার জানা; শুধু মুখস্থ ও পুনরাবৃত্তির দ্বারা কয়েকটি বিচ্ছিন্ন জ্ঞান বা কৌশল আয়ত্তীকরণের পরিবর্তে আছে জীবন্ত উৎসাহ ও ঔৎসুক্য-পরিচালিত স্বতঃস্ফূর্ত ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রয়াসের দ্বারা সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কযুক্ত বিদ্যা ও নিপুণতা অর্জন। শিক্ষাকে দূর ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্যের জন্য প্রস্তুতি বলে না ভেবে, বর্তমান প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মনে করে তাতে রস পাওয়া; স্থাণু ও অচল পৃথিবীতে বাসের উপযুক্ত মামুলী তথ্য সংগ্রহকে জ্ঞান বলে বিবেচনা না করে, নিত্য বিবর্তনশীল পৃথিবী ও জীবনের উপযোগী জিজ্ঞাসা ও পরীক্ষার ভিত্তিতে জ্ঞান ও শক্তি আহরণ করা—এই হচ্ছে নূতন শিক্ষাপদ্ধতির বিশেষ লক্ষণ।[১২]

ডিউই প্রাচীন রক্ষণশীল শিক্ষাপদ্ধতির কঠোর সমালোচক। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী নেতিবাচক মাত্র নয়। তাঁর মতে রচনাত্মক ও গঠনমূলক সামগ্রিক জীবনদর্শনের ভিত্তিতেই অগ্রগামী আধুনিক শিক্ষা প্রাণবন্ত ও সার্থক হতে পারে। তিনি বলেন এই নূতন শিক্ষাপদ্ধতির দায়িত্ব হচ্ছে—এই নূতন জীবনের সমস্যাসমাধানে কি করে সফল হতে পারে তার বাস্তব পথ নির্দেশ করা।

ডিউইর এই নূতন অগ্রগামী শিক্ষারও মূলসূত্র হচ্ছে এই যে, শিক্ষা সমাজ-জীবনের অঙ্গ এবং শিক্ষার সঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান। কাজেই শিক্ষার মধ্যে প্রশ্ন, পরীক্ষা ও ব্যক্তিগত উদ্যমের স্থান থাকতে বাধ্য। শিক্ষা শুধু নিষ্প্রাণ ও ঔৎসুক্যহীন গ্রহণ নয়। অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষা জীবনক্রিয়ারই অংশ এবং মানুষের জীবন একক ও বিচ্ছিন্ন নয়, তা গোষ্ঠী ও সমাজের বৃহত্তর পটভূমিকাতেই সত্য। ব্যক্তিগত উদ্যমকে উচ্চমূল্য দেয় বলে ডিউইর শিক্ষানীতি সামাজিক উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করে না। সমাজের অতীত অভিজ্ঞতাই ব্যক্তির মানসিক বিকাশের প্রথম পদক্ষেপ। তা যদি ব্যক্তির জীবনে সত্য হয়, তবেই তা নূতন জিজ্ঞাসায় তাকে প্রবুদ্ধ করে। কাজেই সত্যদৃষ্টিতে দেখলে

[১২] John Dewey, *Experience and Education*, Ch. Traditional or Progressive Education.

অতীত সংস্কার ও নতুন অগ্রগমন (tradition and progress) পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, পরস্পর বিরোধী নয়।[১৩]

শিক্ষা শুধু নির্বিচার গ্রহণ নয়, শিক্ষার ভিত্তি হচ্ছে সোৎসুক এবং জীবন্ত অভিজ্ঞতা। আব্রাহাম্ লিঙ্কন গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন যা প্রসিদ্ধ হয়ে আছে তা হচ্ছে, 'জনগণের স্বার্থে, জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন।' (Democracy is rule of the people, by the people, for the people.) ডিউই প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কনের অনুকরণে শিক্ষার সংজ্ঞা দিলেন—'অভিজ্ঞতা দ্বারা, অভিজ্ঞতার জন্য, অভিজ্ঞতার শিক্ষণ।' (Education of, by and for experience).

নূতন শিক্ষাপদ্ধতি হবে অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক্, শুধু শিক্ষকের বিদ্যা ও শাসনের উপর নির্ভরশীল নয় ; তাই তা প্রশ্ন, পরীক্ষা ও আলোচনায় ছাত্রদের উৎসাহিত করে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ, তার সামঞ্জস্যকরণ। তা নূতন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পথ সুগম করে ব্যক্তিকে সামনের দিকে অগ্রসর করবে।

শিক্ষার ফলে হবে অভিজ্ঞতার মূল্যবোধ। সব অভিজ্ঞতাই মূল্যবান নয়। যে অভিজ্ঞতা ব্যক্তিকে সমাজজীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য-বিধানে সাহায্য করে, যা গোষ্ঠীজীবনের অভিজ্ঞতা-পুষ্ট এবং যা গোষ্ঠীজীবনের সমস্যা সমাধানের সহায়ক—তাই মূল্যবান। শিক্ষা এই মূল্যবোধকে জাগ্রত করবে।

শিক্ষাগ্রহণ ও অভিজ্ঞতার পরিপুষ্টি দুটি বিপরীতধর্মী অথচ পরস্পর পরিপূরক ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। এর একটি নীতিকে ডিউই বলেছেন ঐক্যের সূত্র (Principle of continuity), আর একটিকে বলেছেন বৃদ্ধি ও বিকাশের সূত্র—(Principle of growth)। পূর্বেই বলা গেছে, সমাজের অতীত ঐতিহ্যের উপরেই গড়ে ওঠে নতুন অভিজ্ঞতার অট্টালিকা। অতীত ও বর্তমান বিচ্ছিন্ন নয়, তাদের মধ্যে বইছে অবিচ্ছিন্ন ধারা। এটিই হচ্ছে সমাজের সংরক্ষণ ধর্ম—অতীত ও বর্তমানের ঐক্যের সূত্র। কিন্তু যদি অতীত বিদ্যা হয় অচলায়তন, যদি অতীত জ্ঞান-অভিজ্ঞতার সঞ্চয় জগদ্দল পাথরের মত নূতনের অগ্রগমনের পথ জুড়ে থাকে, তবে তা শিক্ষাকে ব্যর্থ করবে। শিক্ষা যদি জীবনকে বৃদ্ধি ও বিকাশের পথে না নিয়ে অতীতের সঞ্চয়ের মাঝে বেঁধে রাখে, তবে সে শিক্ষা মানুষকে পঙ্গু করে। প্রাচীনকে নূতন করে গড়ার সাহসেই নবীনের বীর্য ও সার্থকতা। শিক্ষা শুধু অন্ধ

---

১৩ John Dewey, *Education Today*, Introduction by Joseph Ratner.

পুনরুক্তি নয়, তা নবজীবনের পথে সাহসিক অভিযান। এটিই হোল বৃদ্ধি ও বিকাশের সূত্র।

ডিউইর মতে শিক্ষার ভিত্তি হবে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা। কাজেই শিক্ষার পদ্ধতি মনস্তত্ত্বমূলক হতেই হবে। ব্যক্তির আগ্রহ ও প্রয়োজনকে ভর করেই শিক্ষা অগ্রসর হবে। এই মত তিনি পেয়েছেন রুশো, পেস্তালৎসী ও ফ্রোএবেল থেকে। যেখানে ছাত্রের আগ্রহ জাগ্রত হয়েছে সেখানেই শিক্ষা নূতন প্রশ্ন, নূতন পরীক্ষার দিকে স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে দেবে। এ-মতেরই প্রত্যক্ষ ফল হচ্ছে কাজ ও গঠনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার পদ্ধতি, যাকে প্রজেক্ট মেথড্ বলে। যাতে শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ আছে, তার সূত্র ধরেই শিক্ষক বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদিকে জীবন্ত করে তুলবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলি বিদ্যালয়ের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় মাত্র (school subjects) ততক্ষণ পর্যন্ত তারা শিশুর ভীতির কারণ, কিন্তু খেলা ও পড়ার মধ্য দিয়ে যখন শিশু তথ্য সংগ্রহ করে ও নিপুণতা আয়ত্ত করে তখন শিক্ষা তার বর্তমান জীবন-ক্রিয়ার অঙ্গ, কাজেই তা আনন্দময় হয়। এ শিক্ষার শক্তি (dynamism) জোগায় শিক্ষকের বেত্রাঘাত নয়, তার স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও ঔৎসুক্য। প্রাচীন কাল থেকে এ ধারণা চলে এসেছে যে আগ্রহ (interest) ও উদ্যম (effort) এ দুটোর কোঠা আলাদা। খেলার বেলায় আমাদের স্বাভাবিক আগ্রহ আছে, কাজেই সেটা অ-কাজ। আর বিদ্যালয় হচ্ছে ঘর্ম ও অশ্রু, বেত্রাঘাত ও তাড়নার মধ্য দিয়ে মূল্যবান্ জ্ঞান ও কৌশল আহরণ। এখানে আগ্রহের প্রশ্ন অবান্তর, শিক্ষকের দেখতে হবে ছাত্রদের যথেষ্ট উদ্যম আছে কি না। তার অনিচ্ছুক উদ্যমকে জাগিয়ে তুলবার জন্যেই শাস্তি ও তাড়নার অঙ্কুশ চাই। শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহের কথা আমদানী করা মানেই ছাত্রদের মস্তিষ্কটি চর্বণ। শিক্ষার পৌরুষ ও গৌরব এখানেই যে তা আয়ত্ত হয় বহু তাড়ন-পীড়ন সহ্য করে। ডিউই এই বিভেদকে কৃত্রিম ও অনাবশ্যক মনে করেন। উদ্যম তখনই সর্বাধিক যখন সত্যিকারের আগ্রহ জাগ্রত হয়েছে। সমগ্র দৃষ্টির অভাবই এই বিভেদ সৃষ্টির কারণ। কিন্তু তখন উগ্র উদ্যমবাদীরা বলবেন আগ্রহকে বড় করলে শিক্ষা হবে অলস প্রজাপতির মত লক্ষ্যহীনভাবে এক ক্রিয়া থেকে অন্য ক্রিয়ায়, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ঘুরে বেড়ানো; তা ছাত্রদের করবে নরম, খেয়ালী ও জীবনের কঠোর সংগ্রামের অনুপযোগী। আবার উগ্র আগ্রহবাদীরা বলবেন, উদ্যমবাদীরা বিদ্যালয়কে পরিণত করেন জেলখানায়; বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিবর্তে ঘটে

অন্ধ অনুকরণ ও আনন্দহীন পুনরুক্তি মাত্র। তাতে শাস্তির ভয়ে বাহ্যিক বাধ্যতা ও নিয়মানুবর্তিতা দেখা যায় কিন্তু সত্যিকার শৃঙ্খলাবোধ তাতে আসে না। এ ব্যবস্থায় শিশুরা বইএর আড়াল থেকে মুখ ভ্যাংচায়—স্কুলের ঘণ্টা বাজলেই অঙ্কের বই লাথি মেরে দূরে ছুঁড়ে ফেলে। ডিউইর মতে দুই পক্ষের সমালোচনাই একদেশদর্শী। ডিউইর মতে আধুনিক অগ্রসর শিক্ষানীতির এটি একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব যে, তা আগ্রহ ও উদ্যমকে এক করে বেঁধেছে। আগ্রহ যেখানে সত্য ও সুপরিচালিত, সেইখানেই উদ্যম সার্থক জ্ঞানের পথে ছাত্রকে নিয়ে যায়। তাড়না দিয়ে উদ্যম জাগানো যায় না ; যে গড়ার কাজে (Project) শিশুর আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে তা সচল করে তুললেই শিশুর দিক থেকে অনেক বেশী উদ্যম পাওয়া যায়। প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই আছে অহঙ্কার আর প্রশংসা পাবার আকাঙ্ক্ষা। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে শিক্ষিত শিক্ষক জানেন কি করে শিশুর এই স্বাভাবিক সংস্কারগুলিকে কাজে লাগাতে হবে। ডিউই এই নব শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্তক ও উৎসাহী সমর্থক। এই পথেই বিদ্যালয়ের বিষয়গুলি জীবন্ত, অবশ্য জ্ঞাতব্য ও স্বভাবতঃ আনন্দদায়ক করে তোলা যায়।[১৪]

শিক্ষা মনস্তত্ত্ব-ভিত্তিক হলেও তার সামাজিক উদ্দেশ্য বিস্মৃত হলে চলবে না। শুধু ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। রুশো শিক্ষাকে করেছিলেন ব্যক্তিকেন্দ্রিক। কিন্তু ডিউই শিক্ষার সামাজিক মূল্যের উপর জোর দিয়েছেন বেশী। শিক্ষা সমাজ-জীবনেরই অঙ্গ। সমাজ-বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত উৎকর্ষ লাভ নিরর্থক ও নিষ্ফল। সমাজ-জীবনের পটভূমিকাতেই ব্যক্তির সম্পূর্ণতা। এখানেও ডিউই উগ্র ব্যক্তিত্ববাদী ও উগ্র সমাজবাদীদের কলহকে দুই পক্ষেরই একদেশ-দর্শিতা-প্রসূত বলে মনে করেন। দর্শনের সমগ্র দৃষ্টিতে এ বিভেদ সত্য নয়। এ দুইএর সমন্বয় তখনই সম্ভব যখন ব্যক্তি ও সমাজের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়। ডিউই বলেছেন, "যে ব্যক্তি শিক্ষালাভ করবে সে সামাজিক জীব ; সমাজও বহু ব্যক্তির জীবন্ত সমাবেশের ফল। শিশুর জীবন থেকে সমাজের দানকে অস্বীকার করলে যা থাকে তা একটা বিমূর্তভাব মাত্র (a mere abstraction), আর সমাজ-জীবন থেকে ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে প্রাণহীন বহুর সমষ্টি মাত্র।…শিক্ষার গোড়াতে তাই থাকবে শিশুর ক্ষমতা, আগ্রহ ও অভ্যাস সম্বন্ধে

[১৪] G. H. Thompson, *A Modern Philosophy of Education*, pp. 86-88

মনস্তত্ত্বের অন্তর্দৃষ্টি…কিন্তু শিশুর শক্তি, আগ্রহ ও ক্ষমতার তাৎপর্য বোধ করতে হবে তার সামাজিক পরিবেশের পটভূমিকায়……তখনই তাদের সম্পূর্ণতা, আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমের সঙ্গে তখনই তাদের সমন্বয় ঘটবে যখন সমাজের প্রয়োজন ও কল্যাণের সঙ্গে তার সংযোগ হবে।" [১৫]

রুশো বলেছিলেন সমস্ত শিক্ষাই আত্মশিক্ষা। মন্তেসরীও একথা বলেছেন। ডিউই একথাটা মানেন—কিন্তু সম্পূর্ণ মানেন না। শিক্ষা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-নির্ভর, তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার মস্ত স্থান আছে। এর মধ্য দিয়েই ঘটবে ব্যক্তিত্বের বিকাশ। কিন্তু স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচার নয়। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ খেয়ালখুশি মত বেড়ে উঠবে, প্রত্যেকটি শিশু এক একটি বদ্ধ কোরক, তার নিজের নিয়মে নিজের স্বভাবে সে বিকশিত হয়ে উঠবে—একথা তিনি স্বীকার করেন না। ব্যক্তিত্বের বিকাশ শুধু শিশুর নিজস্ব অন্তর্নিহিত শক্তির ফলেই ঘটে না—সে বিকাশকে উদ্দেশ্যমুখী করে তুলতে হয়। এখানেই প্রয়োজন আছে শিক্ষকের চালনার। শিক্ষক নির্বাক ও নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র নন। তিনি বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবনের অঙ্গ। শিশুর বিকাশ যাতে সামাজিক জীবনের সঙ্গে সমঞ্জস হয় তা দেখার ও শিশুর শক্তি, রুচি ও আগ্রহকে সমাজ-কল্যাণের বৃহত্তর উদ্দেশ্যে পরিচালনের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত। এটা জবরদস্তি নয়, বাইরের বয়স্কদের আদর্শ ছোটদের উপর জোর করে চাপানো নয়।[১৬] বিদ্যালয়ের জীবন সমাজ-জীবনেরই অঙ্গ। বিদ্যালয়ে শিশু এই বৃহত্তর গোষ্ঠীজীবনের অংশভাগী। ডিউই বলছেন বিদ্যালয় মুখ্যতঃ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা সামাজিক অগ্রগতির শ্রেষ্ঠ বাহন। বিদ্যালয় তাই গোষ্ঠীজীবনের সেই সংস্থা যেখানে শিশু সমাজের সমৃদ্ধ ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারের অংশভাগী হতে পারে এবং তার শক্তি ও উদ্যমকে সমাজ-কল্যাণে নিয়োগ করতে পারে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার অর্থ-ই হচ্ছে সেই উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক সমস্ত ক্রিয়ার একীকরণ। [১৭]

ডিউই বলেন শিক্ষা উদ্দেশ্যমূলক। প্রাচীনপন্থীরা বলবেন, সে উদ্দেশ্য হচ্ছে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতি—তার জন্যে নির্দিষ্ট কিছু তথ্য সংগ্রহ, কিছু কৌশল ও নিপুণতা আয়ত্তীকরণ। ডিউই এ মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁর মতে শিক্ষা

---

১৫ John Dewey, *My Pedagogic Creed*, Art. I

১৬ " " *Education To-day*, Introduction, Joseph Ratner.

১৭ I " *My Pedagogic Creed*, Art I. What School Is.

দূর ভবিষ্যৎ-জীবনের অনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রস্তুতি নয়। শিক্ষা বর্তমান জীবন-ক্রিয়ারই অঙ্গ—Education therefore, is a process of living, not a preparation for future living."

বিদ্যালয় সমাজ-জীবনের অঙ্গ, কিন্তু আমাদের বর্তমান সমাজ-জীবন এমনি জটিল যে শিশু এর মধ্যে দিশাহারা হয়ে পড়ে। তাই বিদ্যালয়ের পরিবেশ সরল, সুন্দর, সুস্থ হওয়া চাই। বাসনা ও স্বার্থের বিষে আমাদের সাংসারিক ও সামাজিক জীবন কলুষিত, বিক্ষুব্ধ। শিশুর শিক্ষা এই পরিবেশে সার্থক হতে পারে না। তাই চাই শিশুর জন্য শান্ত পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, কিন্তু এই পরিবেশ গৃহ-পরিবেশ থেকেই স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হওয়া প্রয়োজন। গৃহে যে স্নেহ ও নিরাপত্তাবোধ তা যেন সঞ্চারিত হয় বিদ্যালয়েও। বিদ্যালয় যেন গৃহের বিরুদ্ধ বা বিকল্প না হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পূর্ণ মিল আছে। এ মত রুশোর মতের বিরোধী, কেননা রুশোর মতে শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্র তার গৃহের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া চাই, কারণ গৃহ ও সমাজ কৃত্রিম ও বিকারদুষ্ট।

বিদ্যালয় সমাজ-জীবনেরই সহজ সুস্থ প্রতিচ্ছবি। তাই নীতিবোধ বিদ্যালয়ের গোষ্ঠীজীবনের মধ্যেই স্বাভাবিক ভাবে গড়ে উঠবে। এটা বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় পরীক্ষা পাশের একটা নীরস বিষয় নয়। বিদ্যালয় গোষ্ঠীজীবনের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও নীতিবোধের নিশ্চিত ভিত্তি। শুধু মাত্র উপদেশ ও অনুশাসন কখনও নৈতিক চেতনা উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম নয়। রুশো বলেছিলেন, ব্যক্তি তার ব্যবহারের ফলাফল দিয়েই কৃতকর্মের নৈতিক মূল্য বুঝতে শেখে। এ মূল্যবোধ একটি সামাজিক পরিবেষ্টনীতেই শুধু সম্ভব। কিন্তু সংসারের জটিলতর পরিবেশ বয়স্কদের আদর্শ ও মতামত দিয়েই গঠিত। সেখানে তাই স্বাভাবিকভাবে শিশুর নীতিবোধ জাগ্রত হতে পারে না। সেখানে নৈতিক আদর্শ উপর থেকে তার উপর চাপানো হয়। কাজেই তা তার আন্তরিক সম্মতি লাভ করে না। তাই শিশুর নীতিবোধের উপযুক্ত ক্ষেত্র হচ্ছে তারই উপযুক্ত সহজতর পরিবেশ, যে পরিবেশ তারই মত শিশুদের দিয়ে গঠিত। বিদ্যালয়ের সেই আপন পরিবেষ্টনীতে শিশু প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা, কলহ ও সখ্যের মধ্য দিয়েই সত্য-নীতি-জ্ঞানলাভ করে, যেটা বইয়ে-পড়া অবাস্তব জিনিস নয়, যেটা তার অভিজ্ঞতালব্ধ বলেই জীবন্ত সত্য।

প্রাচীনপন্থী বিদ্যালয়ে সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত শক্তি, সমস্ত শাসন ও সমস্ত নৈতিক আদর্শের কেন্দ্র হচ্ছেন শিক্ষক। বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্মশক্তি ও উদ্যমের উৎস

তিনি। শিশুর বিদ্যালয়-জগতের তিনি ঈশ্বর। তিনি শাস্তিদাতা, তিনি ভয়ত্রাতা। এ ব্যবস্থায় শিশুর আত্মশক্তির উদ্বোধন হয় না। সে পর-নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আবার কোন কোন আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিতে (যথা—মন্তেসরী) শিক্ষক প্রায় নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা। শিশু নিজের বিকাশের অন্তর্নিহিত নিয়ম অনুসারে বেড়ে উঠবে, শিক্ষক শিশুর ক্রিয়া ও উদ্যমে যথাসাধ্য কম হস্তক্ষেপ করবেন। তিনি দৃষ্টি রাখবেন ও ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবেন (watch and wait), কিন্তু সক্রিয় পরিচালনা করবেন না। ডিউই এই দুই মতের একটিও গ্রহণ করেন না। এখানেও তিনি মনে করেন, এই দুই বিপরীত পদ্ধতিই অসম্পূর্ণ ও একদেশদর্শী। দার্শনিকের সমন্বয়ী দৃষ্টি দিয়ে এ দুই বিপরীতের সমন্বয় সম্ভব এবং তাই সত্য পথ। তাঁর মতে শিক্ষক বিদ্যালয়ের গণতন্ত্রী সংস্থারই একজন সদস্য। বিদ্যালয়-জীবনের তিনি অচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু তিনি সে রাজ্যের খামখেয়ালী রাজা নন। বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবন থেকেই তিনি তাঁর শক্তি ও প্রভাব আহরণ করবেন। তিনি যখন শাস্তি দেবেন তা তাঁর ব্যক্তিগত বিরাগ থেকে উদ্ভূত হবে না, বিদ্যালয়ের শাসনশক্তি সমগ্র গোষ্ঠীজীবনের কল্যাণ ও প্রয়োজন দ্বারা নির্ধারিত হবে। আর বিদ্যালয়ে তিনি নির্বাক দর্শক মাত্র নন। তাঁর সমৃদ্ধতর অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি-বিবেচনা তাঁকে নিয়োগ করতে হবে শিশুদের শক্তি ও প্রবৃত্তির গতি নির্ধারণের কাজে—তাকে সমাজ-জীবনের সঙ্গে যুক্ত করবার কাজে। শিশুর যে প্রবৃত্তি ও ক্রিয়া তাকে বিদ্যালয়ের গোষ্ঠীজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে, তার সঙ্গে বিরোধ ঘটায়, তাকে তিনি বাধা দেবেন, সংযত করবেন, তার গতি পরিবর্তন করবেন, উন্নয়ন করবেন। এ দায়িত্ব সামান্য নয়। এর জন্য শিক্ষকের থাকতে হবে ধীর দূরদৃষ্টি, অসীম ধৈর্য ও অপরিমেয় ক্ষমা ও করুণা।[১৮]

বিদ্যালয়ের পরীক্ষা-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পারদর্শিতার পরিমাপ নয়—তার উদ্দেশ্য শিশুর শক্তি ও প্রবৃত্তি সমাজ-জীবনের সেবার কতটা উপযোগী এবং সমাজ-জীবন থেকে কি সাহায্য তার প্রয়োজন তার নির্ধারণ।[১৯]

বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয় ও অবশ্য কর্তব্যক্রিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন তথ্য সংগ্রহ বা নিপুণতালাভ মাত্র হয়, ততক্ষণ তা শিশুর আগ্রহ আকর্ষণ করতে পারে

১৮ John Dewey, *My Pedagogic Creed*, Art I, What School Is.

১৯ Dewey, *Education To-day.*

না। শিশুর কাছে সেগুলি বোঝা হয়। সেখানে তাই চেষ্টা হয় কোন প্রকারে মুখস্থ করে পরীক্ষা-সাগর উত্তীর্ণ হবার। এ শিক্ষা নিরানন্দ ও শক্তির অপচয়কর। ডিউইর মতে বিদ্যালয়ের পাঠ ও ক্রিয়াগুলির আলাদা কোন মূল্য নেই। তাদের মূল্য হচ্ছে সমাজ-জীবনের সঙ্গে সংযোগের সূত্র হিসাবে। কোন কোন শিক্ষাবিদ্ শিক্ষায় সমন্বয় ও ঐক্যের সূত্র (basis of correlation) হিসাবে বিজ্ঞান বা ইতিহাস বা প্রকৃতি-পরিচয়কে উচ্চস্থান দিয়েছেন। কিন্তু ডিউইর মতে এ বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ভ্রান্ত। ডিউই বলেন, সমাজ-জীবনের কল্যাণ ও তার সঙ্গে সামঞ্জস্যের প্রয়োজনই বিদ্যালয়ের সমস্ত জ্ঞান ও ক্রিয়ার সমন্বয়ের সূত্র। শিশু তার বিদ্যালয়ের গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন ক্রিয়ার দ্বারা তার সমস্ত জ্ঞান ও কর্মের সংযোগসূত্র আবিষ্কার করে। সাহিত্য সমাজ-জীবনেরই প্রতিফলন, সমাজের অভিজ্ঞতার তাৎপর্য নির্ণয়। সেই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে যখন শিশু দেখতে শেখে তখনই সাহিত্য তার কাছে সরল হয়ে ওঠে। অনুরূপ ভাবে ইতিহাস কতগুলি ঘটনা, তারিখ, বিবরণের সমষ্টিমাত্র নয়। ইতিহাস হচ্ছে সভ্যতার বিকাশের ধারাবাহিক গতি। সমাজ-জীবনের জীবন্ত প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হয়েই তা তাৎপর্যপূর্ণ ও সজীব হয়ে ওঠে।[২০]

খেলা, গড়া, বাগান করা, সেলাই, এগুলি শিশুর বিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্থান অধিকার করে ; কারণ এগুলিই হচ্ছে শিশুর আত্মপ্রকাশ, আত্মপরিচয় ও সামাজিকবোধ জাগ্রত করবার স্বাভাবিক উপায়। শিশু বিদ্যালয়েই আয়ত্ত করবে সেই প্রাথমিক ক্রিয়া ও জ্ঞান, যার উপর ভিত্তি করে মানব-সভ্যতা গড়ে উঠেছে।[২১]

প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিতে বিভিন্ন বিষয়ের একটি নির্দিষ্ট পাঠক্রম আছে। ডিউইর মতে এটাও ভ্রান্ত ও বিচ্ছিন্ন ফল। সমস্ত জীবনই শিক্ষা ; বিকশিত জীবন-ক্রিয়ার মধ্যে কোনও কৃত্রিম ও সুনির্দিষ্ট ভাগ নেই। সমাজ-জীবনের অংশীদার হিসাবে শিশুর আগ্রহ ও শক্তির বিকাশই নির্ধারণ করে দেবে পাঠক্রম ; এটা কখনও সুনির্দিষ্ট হতে পারে না। কাজেই আদর্শ বিদ্যালয়ে

---

২০ John Dewey, *My Pedagogic Creed*, Art. The Subject-matter of Education.

২১ John Dewey, *My Pedagogic Creed*, Art. The Subject-matter of Education.

এমন ভাগ থাকবে না যে, এক শ্রেণীতে শুধু শেখানো হবে বর্ণপরিচয় আর হাতের লেখা, তার পরের শ্রেণীতে সাহিত্য, তার পরের শ্রেণীতে বিজ্ঞান। সমৃদ্ধতর অভিজ্ঞতা ও বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারাই পাঠ্যবিষয় নির্ধারিত হবে। শিক্ষকের কর্তব্য হবে শিশুর মনোজগতের ধারার ক্রমবিকাশ যত্নের সঙ্গে লক্ষ্য করা ও তাকে সমৃদ্ধতর অভিজ্ঞতার দিকে যথোপযুক্ত ক্রিয়া ও উপাদানের মাধ্যমে অগ্রসর করে দেওয়া। শিশুর চিন্তা ও কর্মের সুষ্ঠু অভ্যাস, সুস্থ সামাজিক রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশে শিক্ষক মনোযোগী হবেন, তার মধ্য দিয়েই ঘটবে শিশুর অনুভূতির সংযম ও স্বচ্ছন্দ প্রকাশ।[২২]

অভিজ্ঞতাই শিক্ষার ভিত্তি। কিন্তু সব অভিজ্ঞতাই তো সমান মূল্যবান নয়। পকেট কাটতে শেখাও অভিজ্ঞতা এবং একটি ফুলকে বৈজ্ঞানিক রীতিতে বিশ্লেষণ করে তার অংশগুলিকে নির্ভুলভাবে জানাও অভিজ্ঞতা। শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন্ অভিজ্ঞতাকে মূল্য দেবেন শিক্ষক, কোন্ অভিজ্ঞতাকে বাধা দেবেন? এ বিষয়ে ডিউইর মত মূল্যবান্। সুখবাদী (hedonist) বেন্থাম্ বলেছিলেন—সুখই হচ্ছে কাম্য আর সব সুখই সমান—a push pin is as good as poetry। কিন্তু মিল্ বলেছিলেন, সব সুখ সমান কাম্য নয়। শূকর নোংরা কাদায় গড়িয়ে যে সুখ পায় তার পরিমাণ সামান্য নয়, কিন্তু সে নিম্নস্তরের সুখ, প্রভূত সুখই মানুষের কাম্য নয়। ডিউই তেমনি বললেন, কতক অভিজ্ঞতা আপাতরম্য কিন্তু তার ফল হচ্ছে সমৃদ্ধতর অভিজ্ঞতার পথ রুদ্ধ করা বা ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতার সুস্থ বিকৃতি ঘটানো। এমন অভিজ্ঞতা শিক্ষার পথের কণ্টক। এরা miseducative। যে অভিজ্ঞতা নূতন আগ্রহ সৃষ্টি করে, নূতন জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত করে, যে অভিজ্ঞতা ব্যক্তিকে সমাজ-জীবনের সঙ্গে অধিকতরভাবে ও সফলতরভাবে সংযুক্ত করে, সেই অভিজ্ঞতাই শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যবান। পকেট কাটার অভিজ্ঞতা উত্তেজক ও আপাতলাভজনক সন্দেহ নেই—কিন্তু এ অভিজ্ঞতা ব্যক্তিকে সমাজের সুস্থ জীবন থেকে বিযুক্ত করবে, তার রুচিকে বিকৃত করবে, শোভনতর আনন্দের পথ রুদ্ধ করবে। তাই এ অভিজ্ঞতাকে শিক্ষক বাধা দেবেন। প্রাচীন শিক্ষারীতিতে অভিজ্ঞতার স্থান নেই তা নয়, কিন্তু সে অভিজ্ঞতা নিষ্ফলা, কারণ তা ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তা, পরীক্ষা ও প্রশ্নের দ্বারা সমৃদ্ধতর অভিজ্ঞতার সম্ভাবনার

---

[২২] John Dewey, *My Pedagogic Creed*, Art. The Nature of Method.

পথে বাধা দেয়। সে শিক্ষানীতির ফল দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্কোচন—সম্প্রসারণ নয়।[২৩]

ডিউই গণতন্ত্রে গভীর বিশ্বাসী, কারণ গণতন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গীতেই সুস্থ, সফল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার পথ প্রশস্ত। সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদ শিক্ষার জগতে জাতিভেদ সৃষ্টি করে,—মানুষে মানুষে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পথে বাধা জন্মায়। একনায়কতন্ত্র শাসকের অভিজ্ঞতাকেই জোর করে চাপিয়ে দেয় শাসিতের ঘাড়ে। এ দুইই শিক্ষার পক্ষে মৃত্যুর পথ—বৃদ্ধির পথ নয়। আদর্শ শিক্ষানীতি গণতন্ত্র-সম্মত, কারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যমের উপযুক্ত মূল্য গণতন্ত্রেই স্বীকৃতিলাভ করে। প্রত্যেকের জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ থাকবে, নির্ভয়ে নিজেকে প্রকাশ করবার অধিকার থাকবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীই গণতন্ত্রকে সার্থক করে তুলতে পারে। জীবনের উচ্চতম সত্য শুধুমাত্র অবসরপ্রাপ্ত একটি শ্রেণীর (the leisured class) নিজস্ব সম্পত্তি—তা সর্বজনের কাছে উন্মুক্ত (public) এলাকা থেকে আলাদা—এ পঙ্‌ক্তিবিভাগ প্রাচীন পুঁজিবাদী মনোবৃত্তি। বিজ্ঞান আমাদের বৈষয়িক ও জড়জগৎকে বদলে দিয়েছে। শিক্ষার কাজ হবে তাকে সাংস্কৃতিক ও আত্মিক জগতেও উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা সফল করে তোলা। ডিউই আশাবাদী। তিনি বিশ্বাস করেন—বিজ্ঞানী দৃষ্টিভঙ্গী সমগ্র সমাজ-জীবনকে নূতনতর উন্নতির পথে নিয়ে যাবে।[২৪] যেদিন বিজ্ঞানের উচ্চতর মূল্যবোধ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হবে, সেদিন শিক্ষা তার সফলতম আদর্শে পৌছাবে।[২৫]

ডিউইর দৃষ্টি সমন্বয়ী, বৈজ্ঞানিক ও গঠনমূলক। তিনি অগ্রগমনে বিশ্বাসী, গোষ্ঠীচেতনা তাঁর মধ্যে প্রবল। তাঁর শিক্ষানীতি আধুনিক ও মনস্তত্ত্বভিত্তিক। তিনি গতিবাদী ও জীবনধর্মী।

রুশোর মত তিনিও প্রাচীন পন্থাকে সবলে নাড়া দিয়েছেন, কিন্তু রুশোর মত তাঁর মত নেতিবাচক নয়। তিনি নূতন শিক্ষাপদ্ধতির পথ স্পষ্ট করেই বিবৃত করেছেন। রুশো অত্যন্ত ব্যক্তি-কেন্দ্রিক—শিক্ষার ক্ষেত্রে সামাজিক প্রভাবকে তিনি সযত্নে পরিহার করেছেন। কিন্তু ডিউই সামাজিক জীবনের পটভূমিকাতেই

---

২৩ John Dewey, *Exprience & Education*, Ch II

২৪ G. Thompsch, *A Modern Philosophy of Education*, p. 81

২৫ John Dewey, *Education To-day*, Introduction, Josheph Ratner

শিক্ষার সার্থকতা খুঁজেছেন। রুশোর মত তিনিও শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা, ঔৎসুক্য ও উদ্যমকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করেছেন। শিক্ষার ব্যাপারে শিশুর মনকে জানবার প্রয়োজনীয়তা পেস্তালৎসীও বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন। মন্তেসরী শিশুর আগ্রহ ও শক্তির বিকাশের স্তরগুলি অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছেন, আর চেষ্টা করেছেন শিশুর মনের বিকাশের স্তর অনুযায়ী শিক্ষার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ও উপকরণ আবিষ্কারে। কিন্তু ডিউই রবীন্দ্রনাথের মতই শিশুর মনের বিকাশকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখতে চেষ্টা করেছেন। পেস্তালৎসী বা মন্তেসরীর দৃষ্টি সঙ্কীর্ণতরভাবে মনস্তত্ত্বমূলক। ডিউই ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি দার্শনিক ও সামগ্রিক। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে যতটা বিশ্বাসী, ডিউই ততটা নন। দু'জনেই ব্যক্তি-জীবনকে সমাজ-কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত করবার পক্ষপাতী, কিন্তু ডিউই অধিকতর সমাজ-সচেতন। ফ্রোএবেল, মন্তেসরীর মত ডিউইর শিক্ষাপদ্ধতিও ক্রিয়াকেন্দ্রিক, প্রকৃতি-পরিচয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সকলেই সচেতন। কিন্তু ফ্রোএবেল এর মধ্য দিয়ে সমগ্র শিক্ষার একত্বসূত্রের সন্ধান করেছেন—কিন্তু মন্তেসরী একে অন্যান্য ক্রিয়ার অন্যতম বলে মনে করেছেন, আর ডিউই একে একটি বিচ্ছিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় বলে মনে করেন নি। এদের সকলের মধ্যেই বর্তমান শিশুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ।

ডিউইর ইন্‌স্ট্রুমেন্টালিজম্ মতবাদ সমালোচনার যোগ্য। সত্য গতিশীল, সত্য প্রয়োজন সাধনের অস্ত্র মাত্র, নীতি ও শিক্ষার আদর্শ চিরপরিবর্তনশীল—এই মতে সত্যের একটি দিক অস্বীকৃত হয়েছে। কোন কিছুই যদি স্থির, ধ্রুব, অটল না থাকে তবে জীবনের অবলম্বন, সত্য, শিব ও সুন্দরের মাপকাঠি কিছুই থাকে না। যখন ডিউই সমাজ-কল্যাণকে শিক্ষার আদর্শ বলে স্বীকার করছেন তখন সমাজ-কল্যাণ নির্ধারণের উপায় কি হবে? বহুর মাঝে এককে, পরিবর্তনের মাঝে অপরিবর্তনীয়কে না মানলে চিন্তা, নীতি ও ধর্মের জগতে অরাজকতা অনিবার্য। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় দৃষ্টি আমাদের কাছে অনেক বেশী প্রাণবন্ত বলে মনে হয়।

ডিউই শিক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষা, সংশয় ও উদ্যমের উচ্চমূল্য দিয়েছেন। এটা সঙ্গত। কিন্তু মুখস্থ ও পুনরাবৃত্তির নিন্দা করেছেন। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে সব জ্ঞান, সব নিপুণতা কি পরীক্ষা ও সংশয়ের পথে আসতে পারে? কিছুটা মুখস্থ, কিছুটা 'ড্রিলিং' ব্যতিরেকে সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য ও তত্ত্ব সমস্ত কৌশল, নিপুণতা

কি আয়ত্ত হতে পারে ? ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানও অনেক আছে। একে আয়ত্ত করতে হলে বইপত্র, শিক্ষক ও ক্লাসের রুটিন্ কিছুটা দরকার হবেই।

ডিউই সমাজের অগ্রগমনে, ব্যক্তির উন্নয়নে বিশ্বাসী, কিন্তু কী তার শেষ লক্ষ্য ? এ প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব যেন মিলে না ডিউইতে। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা—

রথীরে কহিল গৃহী উৎকণ্ঠার উচ্চস্বরে ডাকি,
'থামো, থামো, কোথা তুমি রুদ্রবেগে রথ যাও হাঁকি ?'
রথী কহে, 'যেতে হবে আগে।'
'কোন্খানে' শুধাইল। রথী বলে 'কোনখানে নহে,
'শুধু আগে।' 'কোন্ তীর্থে,
কোন্ সে মন্দিরে ?' গৃহী কহে।
'শুধু আগে।' 'কোন্ বন্ধু সাথে হবে দেখা ?'
'কারো সাথে নহে, যাব সব-আগে আমি মাত্র একা।'[২৬]

অ্যামেরিকায় ডিউইর প্রভাব যথেষ্ট। তথাপি সেখানে তাঁর শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষানীতির সমালোচনাও সামান্য নয়।

সত্য স্থির ও চিরন্তন নয়—পরীক্ষা দ্বারা যা ফলদায়ক বলে প্রমাণিত, তাই সত্য, ডিউইর এই ইন্‌স্ট্রুমেণ্টালিস্‌ম্ মতবাদ সব চেয়ে বেশী সমালোচিত হয়েছে।

বাস্তববাদীরা (Realists) বলেন জগৎ-ব্যাপার একটা সংশয়রহিত নির্দিষ্ট সংস্থা (incontrovertible scheme of things)। তার নিয়ম ও বিধি অপরিবর্তনীয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই অপরিবর্তনীয় জগৎ-ব্যাপারকে সম্যক জানা ও তাকে মেনে নেওয়া। কিন্তু ডিউই বলেছেন শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরীক্ষা দ্বারা জগতের বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তন করা। বাস্তববাদীরা বলেন অভ্রান্ত সত্যকে জানতে গেলে প্রাচীন অভিজ্ঞতার কাছে মাথা নত করতে হবে এবং অভ্যাস ও অনুশীলন দ্বারা তাকে আয়ত্ত করতে হবে। ব্যক্তিগত আগ্রহের প্রশ্ন গৌণ। তাকেই শিক্ষার মূলনীতি বলে স্বীকার করে নিলে জ্ঞানের রাজ্যে অরাজকতা অবশ্যম্ভাবী।[২৭]

---

২৬ রবীন্দ্রনাথ—'লক্ষ্যহীন'

২৭ Meyer, *The Development of Education in the Twentieth Century*, pp. 51 .

ভাববাদী হর্ণও ডিউইর তীক্ষ্ণ সমালোচক। প্র্যাগমাটিক ডিউই বলবেন—অচল ধ্রুব সত্য বলে কিছু নেই। যা কার্যোদ্ধারের সহায়ক তাই সত্য। সত্য মানুষের চিন্তা ও কর্মের সৃষ্টি। ভাববাদী বলেন কথাটা ঠিক উল্টো। সত্য স্থির, ধ্রুব, অপরিবর্তনীয়—আমাদের চিন্তা ও কর্ম তখনই ফলদায়ক যখন তা সত্যকে অনুসরণ করে। "কার্যকরী হোল বলে আমাদের চিন্তা সত্য এটা ঠিক নয়, বরং এটাই ঠিক যে আমাদের চিন্তা সফল হয় যখন তা সত্য—মানুষের চিন্তা পরিবর্তিত হতে পারে—হয়েও থাকে, কিন্তু সত্যের পরিবর্তন নেই।[২৮]

ডিউই ঐশী চিৎশক্তি সমস্ত জগৎ-ব্যাপারের মূল এ কথাটা নিতান্ত ভাবাবেগ-সঞ্জাত বলে মনে করেন। তাঁর মতে জগতের সমস্ত পরিবর্তনের মূল হচ্ছে মানুষের চিন্তা, কর্ম, উদ্যম। হর্ণের মতে সমস্ত জগৎ একটি পূর্ণতর উচ্চতর নৈতিক আদর্শের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, কারণ তা ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত—এ জগৎ ও জীবন ভগবদ্‌ভাব (Absolute idea)-এরই প্রকাশ ও ক্রমপরিণতি।

হর্ণ বলেন নীতি ও ধর্মের আদর্শ পরীক্ষামূলক নয়, তা অবশ্য পালনীয় (obligatory)। কাণ্টের মত জার্মান-সম্রাট বলেছিলেন—কর্তব্য যা তা করতে হবে (Dienst ist Dienst)। এতে ভাল লাগা, মন্দ লাগার প্রশ্ন বিবেচ্য নয়। সুতরাং শিশু আগ্রহ যদি বোধ নাও করে তবু যা কর্তব্য বলে শিক্ষক বিবেচনা করবেন তা তাকে করতে তিনি অভ্যস্ত করাবেন। তাই হর্ণের মতে বিদ্যালয়ের কেন্দ্র ও সত্য পরিচালক হচ্ছেন শিক্ষক। বাধ্যতা শিক্ষার্থীর পক্ষে শ্রেষ্ঠ গুণ। "সমস্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের আত্মার সুপ্ত আকৃতিকে তার পরম আশ্রয় ভগবানের অভিমুখী করা এবং তার জন্য প্রয়োজন ভগবানের গুণবর্ণন, উপসনা ও পূজা।" ডিউইর শিক্ষাদর্শের বিরুদ্ধে একটি প্রধান অভিযোগ তাতে ধর্ম ও নীতি শিক্ষার কোন স্থান নেই।[২৯]

ক্যাথলিকরাও ডিউইর শিক্ষা ধর্মহীন বলে নিন্দা করে থাকেন। মানুষের জীবনের সার্থকতা এই পার্থিব জীবনে নয়, অপার্থিব পরমার্থ লাভে। ডিউইর

---

[২৮] H. H. Horne, *The Philosophy of Education*, p. 303

[২৯] H. H. Horne, Complete Living as the Goal of Education, *Education XLVIII*, p. 342

শিক্ষানীতি বিজ্ঞানকেই কেবল মাত্র জ্ঞান বলে স্বীকার করে, ধর্মকে তা মনে করে কুসংস্কার। সাহিত্য, শিল্প যা জীবনকে মাধুর্যমণ্ডিত করে, তার কিছুই ডিউইর শিক্ষানীতিতে মর্যাদা পায়নি—এই তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনা করেছেন আর একজন প্রভাবশালী অ্যামেরিকান্ শিক্ষাবিদ্—আর. এম্. হাচিন্‌স্। তিনি বলেছেন শিক্ষাকে 'কেজো' করবার ফল হয়েছে এই যে, আমেরিকায় শিক্ষা নিতান্তই দোকানদারী ও পেশাদারীতে (vocationalism) পরিণত হয়েছে। এ শিক্ষার সাফল্যকেই সর্বোচ্চ মূল্য দেওয়া হয়েছে, এর ফলে প্রতিযোগিতা, লোভ ও ঈর্ষ্যাই প্রবল হয়ে উঠবে।[৩০] বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুরূপ অনুযোগ গান্ধীজীও করেছেন।

হাচিন্সের মতে শিক্ষার ক্ষেত্রে কতকগুলি সত্য যেমন মৌলিক, তেমনি কতকগুলি বিষয়ও অবশ্য শিক্ষণীয় বলে বিবেচনা করতে হবে। সমস্ত শিক্ষার্থীর পক্ষেই কতগুলি বিদ্যা ও নৈতিক আদর্শ অবশ্য গ্রহণীয় এবং মানব-সভ্যতার সঞ্চিত অভিজ্ঞতালব্ধ ফল কয়েকটি স্মরণীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ। এমন একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের তালিকা তিনি নির্দিষ্ট করেছেন। এ পুস্তকগুলি সমস্ত ছাত্রের অবশ্য পাঠ্য। বিভিন্ন বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পের মৌলিক তত্ত্ব ও তথ্য এই গ্রন্থগুলিতে লিপিবদ্ধ আছে। তাঁর মতে সমস্ত বিদ্যার মৌলিক সমন্বয় হয় দর্শনে, তাই দর্শনই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। ডিউইর শিক্ষাদর্শ প্রাচীন জ্ঞানের যথেষ্ট মর্যাদা দেয় না, সুতরাং, তার ভিত্তি দুর্বল।

হাচিন্স শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট, সুতরাং ডিউইর বিরুদ্ধশক্তি শিকাগোতে যথেষ্ট শক্তিশালী।

ডিউইর অগ্রগমনের আদর্শকে হেন্‌রী হ্যাজলিট্ উদ্দেশ্যহীন বলে উপহাস করেছেন। তিনি বলেছেন, "কোথায় আমরা যেতে চাই এবং যেখানে যেতে চাই সেখানে যাওয়াটা বাস্তবিকই সঙ্গত ও প্রয়োজন কি না, সেটা না জেনে এগিয়ে যাওয়ার কোন মানে হয় কি।" ডিউইতে এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর যেন মেলে না। কারণ তিনি সত্য স্থির ধ্রুব আদর্শ বা লক্ষ্য বলে কিছু স্বীকার করেন না। সুতরাং তাঁর শিক্ষাদর্শ লক্ষ্যহীন ও অস্পষ্ট।

এ সমস্ত সমালোচনার উদ্দেশ্য ডিউইর মূল্য ও প্রভাব অস্বীকার করা নয়। বর্তমান যুগের শিক্ষাজগতে ডিউইর অবদান অসামান্য। তাঁর সম্বন্ধে বর্তমান

---

৩০ R. M. Hutchins, *Education for Freedom*, pp. 34-36

যুগের দু'জন শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করে প্রবন্ধটি শেষ করছি। এ. এন্. হোয়াইটহেড্ বলেন,

"John Dewey is to be classed among those who have made philosophic thought relevant to the needs of their own day."

আর এডুয়ার্ড. সি. লিণ্ডম্যান্ ডিউইর সম্বন্ধে বলেছেন,

"a thinker who is human, hopeful, and everlastingly honest."

তাঁর মৃত্যুতে (১৯৫২) পৃথিবী একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাব্রতীকে হারিয়েছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দান—শান্তিনিকেতন

তোর বক্‌বকানী ফোঁস ফোঁসানী
তাও কবিত্বের ভাব মাখা,
তাও ছাপালি গ্রন্থ হলো
নগদ মূল্য একটাকা।

একদিন রবীন্দ্রকাব্য সম্বন্ধে এই ছিল অধিকাংশ তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তির ধারণা। ক্রমে ক্রমে এ ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে, বিশেষ করে, যেদিন থেকে য়ুরোপ কবিকে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার Nobel Prize দিয়ে সম্মানিত করেছিল। আজ কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি শিক্ষিত সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু শিক্ষাবিদ্ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ এখনও দেশের কাছে যথোচিত সমাদর লাভ করেন নি। বাস্তবিক পক্ষে তাঁর শিক্ষাদর্শ, বিশেষ করে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী সম্বন্ধে সাধারণের মনে বিরূপ ধারণা রয়েছে। খুব অল্পদিন হোল এ প্রতিষ্ঠানগুলির ভার ভারত-সরকার নিজ হাতে গ্রহণ করেছেন এবং বিশ্বভারতী একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করেছে। কিন্তু এর পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে একাই প্রায় সমস্ত আর্থিক দায়িত্ব বহন করতে হয়েছে। দেশবাসীর কাছে আর্থিক আনুকূল্য তিনি সামান্যই পেয়েছেন। খুব সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ ও তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত এবং সমাজে যশস্বী বাঙ্গালীর বিরূপ মতের সারমর্ম উল্লেখ করছি:

"রবীন্দ্রনাথ কবি ও সাহিত্যিক। তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা ও শোভন রুচি অনস্বীকার্য। কিন্তু কবি বলেই তিনি কল্পনাবিলাসী। তদুপরি তিনি বিত্তশালী

জমিদার। শান্তিনিকেতন তাঁর খেয়ালী মনেরই কল্পনা-বিলাস। সঙ্গীত, শিল্প-কলার কেন্দ্র হিসাবে বড়লোকের অলস ছেলেমেয়েদের পক্ষে হয়ত এমন প্রতিষ্ঠানের সার্থকতা আছে, কিন্তু তিনি যে শিক্ষার আদর্শ স্থাপন করেছেন তা নিতান্তই 'মেয়েলী'। এতে বিদেশের কাছে তিনি অনেক বাহবা পেতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাঁর শিক্ষানীতি দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর পরীক্ষা নিষ্ফল হয়েছে।"

এ সব সমালোচনা ধীর বিচারসাপেক্ষ। উপরিউক্ত বিরূপ মত কয়েকজন দায়িত্বজ্ঞানহীন অর্বাচীনের মত নয়, দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের মনে এমন মত ছড়িয়ে আছে। কাজেই এর আলোচনার প্রয়োজন আছে। এখানে দুটি প্রশ্নের আলাদা বিচার করা প্রয়োজন: (১) রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ কি? তা কি বাস্তবিক পক্ষে কল্পনাশ্রয়ী ও আমাদের বর্তমান জীবনের পক্ষে অনুপযোগী? (২) শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী কি তাঁর শিক্ষাদর্শের সার্থক রূপ? তারা কি সফল হয়েছে? দ্বিতীয় প্রশ্নটির বিচার আমাদের আলোচনার বহির্ভূত। বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিশনের মত বিশেষজ্ঞ, বিদ্বজ্জন ও শিক্ষাব্রতী সমাবেশের দ্বারাই এর উপযুক্ত বিচার সম্ভবপর। আমাদের আলোচনা প্রথম প্রশ্নটি নিয়ে। আমরা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ এবং তিনি এই আদর্শকে কি ভাবে রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছেন তাই আলোচনা করব।

একথা নিশ্চয়ই স্বীকৃত হবে যে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করেছিলেন এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা বা কয়েকটা নূতন পরীক্ষা তিনি করে গেছেন। কোন সংস্কার আন্দোলন—তা সে ধর্মসংস্কারই হোক, রাজনৈতিক সংস্কার হোক বা শিক্ষাসংস্কার হোক, আকস্মিক ব্যাপার নয়। তার পেছনে একটা বেদনা, সংগ্রাম ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস থাকে। তাই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শকে বুঝতে গেলে তার ঐতিহাসিক পটভূমিকাটি জানা দরকার।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম ও কর্মজীবন উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত। আমাদের দেশের পক্ষে এ কালটি বিশেষ সঙ্কট ও গৌরবের কাল। যে ইংরেজ বণিক একদিন ব্যবসায়ের সুযোগ প্রার্থনা করে একখণ্ড ভূমি ভিক্ষা চেয়েছিল, তারা তখন সমগ্র দেশের একছত্র অধিপতি। শুধু যে রাষ্ট্রনৈতিক প্রভুত্বই তারা বিস্তার করেছিল তা নয়,—দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরাজয়ও প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছিল। আমরা সে দাসত্বকে শুধু মেনে নিয়েছিলাম

তা নয়, সে গিল্টি-করা শৃঙ্খল নিয়ে গর্ব করতেও যেন স্থরু করেছিলাম। দেশের সমগ্র ঐশ্বর্য শোষণ করে বিদেশী প্রভুরা যে স্বর্ণরথে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তার বাহন হিসাবে শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ও কিছু কিছু স্বর্ণমুষ্টি প্রভুর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ হিসাবে লাভ করেছিলেন। ইংরাজী ভাষা, ইংরাজী রুচি, ইংরাজী আচার, ইংরাজী শিক্ষাই তখন শিক্ষিত সমাজের আদর্শ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বাল্য বয়সে উচ্চ ইংরেজী শিক্ষার জন্যে কলকাতায় হিন্দুকলেজ স্থাপিত হয় এবং সেকালে ডিরোজিও ও রিচার্ডসন প্রমুখ কৃতী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষকদের প্রভাবে ছাত্রদের মন নিজ দেশীয় ধর্ম, আচার, সাহিত্য, সংস্কৃতির প্রতি বিমুখ হয়ে উঠেছিল। একদিকে প্রাচীনপন্থীদের অন্ধতা, সংকীর্ণতা, বিচারহীনতা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা ও কুৎসিত রুচিহীনতা, অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানীদের দেশের ঐতিহ্যের প্রতি সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা, ধ্বংসপন্থীদের দলের উগ্র বিদেশীয়ানা দেশকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছিল। প্রাণবন্ত ও আত্মবিশ্বাসী পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল সংঘাত অবশ্য তার পূর্বেই দেশের মর্মস্থলে আঘাত হানতে শুরু করেছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পূর্বে মনীষী রামমোহন রায় এ সঙ্কট অনুভব করেছিলেন। খ্রীষ্টান পাদ্রীরা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই দেশের ধর্ম, আচার ও সভ্যতাকে হেয় বলে প্রতিপন্ন করতে উদ্যত হয়েছিলেন। রামমোহন রায়ও তৎপর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইত্যাদি দেশের চিন্তানায়কগণ খ্রীষ্টান সভ্যতার এ আঘাতকে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করেছিলেন। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মন নিয়ে তাঁরা একদিকে দেশের অন্ধ কুসংস্কারগুলি দূর করবার চেষ্টা করেছেন, আর একদিক দিয়ে শ্রদ্ধাশীল হয়ে দেশের শ্রেষ্ঠ আত্মিকসম্পদ, দেশের ধর্ম, আচার ও সভ্যতার সত্য ও মহনীয় রূপ বেদ, উপনিষদ, শাস্ত্রাদি চর্চার দ্বারা দেশের সামনে উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছিলেন। তাই উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে আমরা দেখি একদিকে ইংরাজী শিক্ষার প্রসারে বিদেশীদের প্রভাববৃদ্ধি, অন্যদিকে নানা সমাজসংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশের আত্মরক্ষার ও আত্মোপলব্ধির আকুল প্রয়াস। রবীন্দ্রনাথ যে পরিবারে জন্মেছেন তার গৌরবকাহিনী দেশের সমস্ত সমাজসংস্কার ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকবে। ভারতের জাগ্রত ও সমন্বয়ী চিত্তের শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছে এই পরিবারটিতে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সবচেয়ে মূল্যবান চিন্তার ধারা—জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শন, মুসলমান সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ—

তার সাহিত্য ও শিল্পকলা আর প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার গভীর অধ্যাত্মবাদ ও শান্ত ধ্যানপরায়ণতা এই ত্রিধারার মিলন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের জীবনে তাঁর পরিবারের মধ্য দিয়ে। তাঁর বিশ্বভারতীর আদর্শের মধ্যে এই আশ্চর্য সমন্বয়ের পরিচয় মিলবে। তিনি তাঁর পিতা ও পরিবারের কাছ থেকেই গভীর স্বাজাত্যাভিমান উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন। বাংলাদেশে জাতীয় আন্দোলন শুরু হয় বঙ্গভঙ্গের পর (১৯০৫ সালে), কিন্তু তার বহুদিন পূর্ব থেকেই ঠাকুর পরিবারে স্বদেশী হাওয়া সবেগে বইতে শুরু করেছিল। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন, "বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশী প্রথার চলন ছিল, কিন্তু আমাদের পরিবারে হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুত, সে সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোক দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোন নূতন আত্মীয় ইংরাজীতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকট তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।" বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে মাতৃভাষার প্রতি নিবিড় অনুরাগ সঞ্চারিত হয়েছিল এবং ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁর শিক্ষানীতির এটি একটি মূল কথা।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতি বুঝতে গেলে তাঁর বাল্য-জীবনের অভিজ্ঞতা কিছু জানা দরকার। সাবেকী আমলের বনেদী ঘরে, বিশেষ করে ঠাকুরবাড়ির মত বৃহৎ পরিবারে শিশু ও বালকের জন্যও অন্তঃপুরের দ্বার উন্মুক্ত ছিল না। মায়ের কোল তাই শিশু রবির কাছে খুব সুলভ ছিল না। তাঁর বাল্যকাল তাই কেটেছে 'ভৃত্যরাজতন্ত্রে'র শাসনে ও তত্ত্বাবধানে। বাড়ির বাইরে সমবয়সী অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেশবার সুযোগও তিনি পান নি। মাতৃস্নেহ বঞ্চিত শিশুর মনে যে অভিমান জেগেছিল, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় স্থাপনকালে সে কথাটি তিনি স্মরণ রেখেছিলেন। সে বয়সে প্যারীদাসী, শ্যামাদাসী, ব্রজেশ্বর, আব্দুল ইত্যাদি ভৃত্য ও প্রজার মুখে নানা ভূতের গল্প, ডাকাতের গল্প, সুয়োরাণী-দুয়োরাণীর গল্প আর মা ও দিদিমার ঘরে রামায়ণ-কাহিনী শিশু রবির কল্পনাকে রাঙিয়ে তুলেছিল। কল্পনায় নানা কাহিনী বানিয়ে তাতে আনন্দ

পাওয়ার অভ্যাস অল্প বয়সেই তাই তাঁর আয়ত্ত হয়েছিল। তাঁর 'ছেলেবেলা' থেকে তাঁর কল্পনার খেলার নমুনা কিছু দেওয়া যাক্—"এই তো পালকির ভিতর আমার চাকর, পালকির বাইরে এক একদিন ছিল আমার মাষ্টারি, রেলিংগুলো আমার ছাত্র। ভয়ে থাকতো চুপ। এক একটা ছিল ভারি দুষ্টু, পড়াশুনোয় কিছুই মন নেই। ভয় দেখাই যে বড়ো হোলে কুলিগিরি করতে হবে। মার খেয়ে আগাগোড়া গায়ে দাগ পড়ে গেছে, দুষ্টুমি থামতে চায় না, কেন না, থামলে যে চলে না, খেলা বন্ধ হয়ে যায়।" বিধাতা তখন থেকেই বুঝি শিক্ষক রবীন্দ্রনাথকে তৈরী করে নিচ্ছিলেন। "আরো একটা খেলা ছিল সে আমার কাঠের সিঙ্গিকে নিয়ে। পূজায় বলিদানের গল্প শুনে ঠিক করেছিলুম সিঙ্গি বলি দিলে খুব একটা কাণ্ড হবে। তার পিঠে কাঠি দিয়ে অনেক কোপ দিয়েছি। মন্তর বানাতে হয়েছিল, নৈলে পূজা হয় না।—

'সিঙ্গিমামা কাটুম
আন্দিবোসের বাটুম
উলুকুট্ ঢুলকুট ঢ্যাম্‌কুড়কুড়
আখরোট বাখরোট খটখট খটাস।
পটপট পটাস।'

বাইরের সম্পর্কে এ বাধানিষেধ শিশু রবিকে বরং অধিকতর কৌতূহলী করে তুলেছিল। তিনি 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন, "বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমন কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন খুসি যাওয়া আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার জানালার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বন্ধ—মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল।" আর এক জায়গায় লিখেছেন, "ছেলেবেলার দিকে যখন তাকানো যায় তখন সবচেয়ে এই কথাটা মনে পড়ে যে জগৎটা এবং জীবনটা রহস্যে পরিপূর্ণ। সর্বত্রই যে একটি অভাবনীয় আছে এবং কখন যে তাহার দেখা পাওয়া যাইবে তাহার ঠিক নাই এই কথাটা প্রতিদিনই মনে জাগিত। প্রকৃতি যেন হাত মুঠা করিয়া হাসিয়া

জিজ্ঞাসা করিত "কী আছে বলো দেখি।" বাল্যকালে প্রকৃতির এ আকর্ষণ তিনি জেনেছিলেন যতই বড় হয়েছেন ততই এই আকর্ষণ প্রবলতর হয়েছে। এবং মানুষের অন্তর-প্রকৃতির সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির একটা নাড়ীর সংযোগ আছে, প্রকৃতির সাহচর্য মানুষের আত্মার পক্ষে অন্নজলের মতই অপরিহার্য, এ কথাটি তাঁর শিক্ষানীতির একটি মূল কথা। প্রকৃতির রহস্য এশিশুকে বিস্ময়াবিষ্ট করেছে, কৌতূহলী করেছে এবং তার জন্যেই নানা পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণে তিনি প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং সে পথেই তিনি সন্ধান পেয়েছেন শিক্ষার মূলমন্ত্র, এ পথেই ঘটেছে তাঁর আত্মশক্তির উদ্বোধন। তাঁর উন্মেষশালিনী প্রতিভা আবিষ্কার ও আত্মবিকাশের আনন্দের মধ্য দিয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ আহরণ করেছে।

বিশ্বপ্রকৃতির অখণ্ডতা ও সমগ্রতার মধ্যে মানুষ যখন নিজের অন্তরতম সত্তাটি খুঁজে পায় তখনই মানুষের গভীরতম শান্তি এই নিবিড় উপলব্ধি তাঁর জীবনে তিনি লাভ করেছিলেন। শিশুকালেই এই অনুভূতির অস্পষ্ট আভাস তিনি পেয়েছিলেন। যা খণ্ডিত তা অর্থহীন, এই কথাটি তাঁর শিশু মন দিয়েও তিনি সহজে জেনেছিলেন। অল্প বয়সেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার হিমালয় ভ্রমণের সঙ্গী হয়ে গিয়েছিলেন। এই তাঁর প্রথম দেশভ্রমণ। সংসারের গণ্ডী থেকে এ মুক্তি তাঁর সৌন্দর্যপিপাসু মনকে প্রকৃতির প্রতি আরো অনুরাগী করে তুলেছিল।

বাল্যে ও কৈশোরে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার দুঃখময় অভিজ্ঞতা তাঁকে সেই ছোট বয়স থেকেই ইস্কুলের গতানুগতিকতা, শাসননির্মমতা ও সর্বপ্রকার স্বাধীনতার খর্বকারী আবহাওয়ার প্রতি বিরূপ করে তুলেছিল। গৃহশিক্ষকদের শিক্ষাও এর চেয়ে বেশী আকর্ষণীয় ছিল না। 'ছেলেবেলা'য় তিনি লিখেছেন, "মাষ্টার মশাই মিটমিটে আলোয় পড়াতেন প্যারী সরকারের ফার্ষ্ট বুক। প্রথমে উঠত হাই, তারপর আসত ঘুম, তারপর চলত চোখরগড়ানি। বারবার শুনতে হোত মাষ্টার মশায়ের অন্য ছাত্র যতীন সোনার-টুক্‌রো ছেলে, পড়ায় আশ্চর্য মন, ঘুম পেলে চোখে নস্যি ঘষে। আর আমি? সে কথা বলে কাজ নেই। সব ছেলের মধ্যে একটা মূর্খ হয়ে থাকবার মতো বিশ্রী ভাবনাতেও আমাকে চেতিয়ে রাখতে পারতো না।" আবার লিখছেন, "সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পড়াশুনার জাঁতাকল চলছেই। ঘর্ঘর শব্দে এ কলে দম দেওয়ার কাজ ছিল আমার সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের হাতে। তিনি ছিলেন কড়া শাসনকর্তা। তম্বুরার তারে অত্যন্ত বেশি টান দিতে গেলে পটাং করে যায় ছিঁড়ে। তিনি আমাদের মনে যতটা বেশি মাল বোঝাই করতে

চেয়েছিলেন তার অনেকটাই ডিঙি উল্‌টিয়ে তলিয়ে গেছে একথা এখন আর লুকিয়ে রাখা চলবে না। আমার বিদ্যেটা লোকসানি মাল।” রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয় সত্য ইস্কুলে পড়ে, তাই শখ হোল ইস্কুলে ভর্তি হবার। কান্না শুরু করলেন ইস্কুলে পড়বার জন্যে। সেদিন বাড়ীর মাষ্টারমশাই বলেছিলেন, ‘আজ ইস্কুলে যাবার জন্যে কাঁদচো, কিন্তু এর পর অনেক বেশী কাঁদতে হবে ইস্কুল না যাবার জন্যে’। সে ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল। প্রথম ইস্কুলের পাঠ শুরু ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে। সে সম্বন্ধে ‘জীবনস্মৃতিতে’ লিখেছেন, “শিক্ষাদান ব্যাপারের মধ্যে যে-সমস্ত অবিচার, অধৈর্য, ক্রোধ, পক্ষপাতপরতা ছিল, অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের চেয়ে সেটা অতি সহজেই আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলাম।” তারপর ভর্তি হলেন নর্মাল স্কুলে। সে সম্বন্ধে লিখেছেন, “নর্মাল স্কুলের স্মৃতিটা যেখানে ঝাপসা অবস্থা পার হইয়া উঠিয়াছে সেখানে কোন অংশেই তাহা লেশমাত্র মধুর নহে। ছেলেদের সঙ্গে যদি মিশিতে পারিতাম, তবে বিদ্যাশিক্ষার দুঃখ তেমন অসহ্য বোধ হইত না। কিন্তু সে কোন মতেই ঘটে নাই। অধিকাংশ ছেলের সংস্রব এমন অশুচি ও অপমানজনক ছিল, ছুটির সময় আমি চাকরকে লইয়া দোতলায় রাস্তার দিকে এক জানালার কাছে একলা বসিয়া কাটাইয়া দিতাম। ....শিক্ষকদের মধ্যে একজনের কথা আমার মনে আছে, তিনি এমন কুৎসিত আচার ব্যবহার করিতেন যে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধাবশত তাঁহার কোন প্রশ্নেরই উত্তর করিতাম না.........এমন করিয়া সেই ক্লাসে এক বছর যখন কাটিয়া গেল তখন মধুসূদন বাচস্পতির নিকট আমাদের বাংলার বাৎসরিক পরীক্ষা হইল। সকল ছেলের চেয়ে আমি বেশি নম্বর পাইলাম! আমাদের ক্লাশের শিক্ষক কর্তৃপুরুষদের কাছে জানাইলেন যে পরীক্ষক আমার প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করিয়াছেন।” অল্পবয়সে বাড়ীতে ইংরেজী শিখতে হয়েছিল সে দুঃখের কথা লিখেছেন, “সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যাবেলায় টিমটিমে বাতি জ্বালাইয়া বাঙালী ছেলেকে ইংরেজি পড়াইবার ভার যদি স্বয়ং বিষ্ণুদূতের উপরেও দেওয়া যায়, তবু তাহাকে যমদূত বলিয়া মনে হইবেই তাহাতে সন্দেহ নাই।” আবার লিখেছেন, “একে সন্ধ্যাবেলায় শরীর ক্লান্ত ও মন অন্তঃপুরের দিকে, তাহার পরে সেই বইখানার মলাট কালো এবং মোটা, তাহার ভাষা শক্ত এবং তাহার বিষয়গুলির মধ্যে নিশ্চয়ই দয়ামায়া কিছুই ছিল না, কেন না শিশুর প্রতি সেকালে মাতা সরস্বতীর মাতৃভাবের কোন লক্ষণ দেখি নাই।” তাঁদের পরিবারে

বালকদের ইংরেজি শিখবার আগে বাংলাভাষা শিখবার দিকে জোর দেওয়া হত, তার সুফল তিনি কখনো ভোলেন নি। তিনি লিখেছেন—"ছেলেবেলায় বাংলা পড়িয়াছিলাম বলিয়াই সমস্ত মনটার চালনা সম্ভব হইয়াছিল। শিক্ষা জিনিসটা যথাসম্ভব আহার ব্যাপারের মতো হওয়া উচিত। খাদ্যদ্রব্যে প্রথম কামড়টা দিবামাত্রই তাহার স্বাদের সুখ আরম্ভ হয়, পেট ভরিবার পূর্ব হইতেই পেটটি খুশী হইয়া জাগিয়া উঠে, তাহাতে তাহার জারকরসগুলির আলস্য দূর হইয়া যায়। বাঙালীর পক্ষে ইংরেজী শিক্ষায় এটি হইবার জো নাই। তাহার প্রথম কামড়েই দুইপাটি দাঁত আগাগোড়া নড়িয়া উঠে—মুখবিবরের মধ্যে একটা ছোটখাটো ভূমিকম্পের অবতারণা হয়। তারপরে, সেটা যে লোষ্ট্রজাতীয় পদার্থ নহে, সেটা যে রসে-পাক-করা মোদকবস্তু, তাহা বুঝিতে বুঝিতেই বয়স অধিক পার হইয়া যায়। বানানে ব্যাকরণে বিষম লাগিয়া নাক-চোখ দিয়া যখন অজস্র জলধারা বহিয়া যাইতেছে, অন্তরটা তখন একেবারেই উপবাসী হইয়া আছে। অবশেষে বহুকষ্টে অনেক দেরিতে খাবারের সঙ্গে যখন পরিচয় ঘটে তখন ক্ষুধাটাই যায় মরিয়া।" যাক্, ইস্কুলের পালা তখনো সবে শুরু। এর পর ভর্তি হলেন 'বেঙ্গল একাডেমি' নামে এক ফিরিঙ্গি স্কুলে। সেখানে কিছুটা স্বাধীনতা পাওয়া গেল—বিশেষ করে পড়া শিখবার জন্যে কোন তাড়া ছিল না, কারণ "ছোটো ইস্কুল, আয় অল্প, ইস্কুলের অধ্যক্ষ আমাদের একটি সদগুণে মুগ্ধ ছিলেন। আমরা মাসে মাসে নিয়মিত বেতন চুকাইয়া দিতাম। এইজন্য ল্যাটিন ব্যাকরণ আমাদের পক্ষে দুঃসহ হইয়া উঠে নাই এবং পাঠচর্চার গুরুতর ত্রুটিতেও পৃষ্ঠদেশ অনাহত ছিল।" কিন্তু এই ইস্কুলও তাঁর মনকে আকর্ষণ করতে পারে নি কারণ, "হাজার হইলেও ইহা ইস্কুল। ইহার ঘরগুলা নির্মম, ইহার দেয়ালগুলা পাহারাওয়ালার মতো—ইহার মধ্যে বাড়ির ভাব কিছুই নাই, ইহা খোপওয়ালা একটা বড়ো বাক্স। কোথাও কোন সজ্জা নাই, ছবি নাই, রঙ নাই, ছেলেদের হৃদয়কে আকর্ষণ করিবার লেশমাত্র চেষ্টা করে নাই। ছেলেদের যে ভাল লাগা মন্দ লাগা বলিয়া একটা খুব মস্ত জিনিস আছে, বিদ্যালয় হইতে সে-চিন্তা একেবারে নিঃশেষে নির্বাসিত। সেইজন্য বিদ্যালয়ের দেউড়ি পার হইয়া তাহার সংকীর্ণ আঙিনার মধ্যে পা দিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সমস্ত মন বিমর্ষ হইয়া যাইত—অতএব, ইস্কুলের সঙ্গে আমার সেই পালাইবার সম্পর্ক আর ঘুচিল না।" এর পরের ইস্কুল সেণ্ট জেবিয়ার্স। তিনি লিখেছেন "সেণ্ট জেবিয়ার্সে আমাদের ভরতি করিয়া দেওয়া হইল, সেখানেও কোন বড়ো

ফল হইল না।…একদিন বড়দিদি কহিলেন, "আমরা সকলেই আশা করিয়াছিলাম বড় হইলে রবি মানুষের মত হইবে, কিন্তু তাহার আশাই সকলের চেয়ে নষ্ট হইয়া গেল।" আমি বেশ বুঝিতাম ভদ্রসমাজের বাজারে আমার দর কমিয়া যাইতেছে, কিন্তু তবু যে-বিদ্যালয় চারদিকের জীবন ও সৌন্দর্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন, জেলখানা ও হাসপাতাল জাতীয় একটা নির্মম বিভীষিকা, তাহার নিত্য-আবর্তিত ঘানির সঙ্গে কোনমতেই আপনাকে জুড়িতে পারিলাম না।" দেশের বিদ্যালয়ে পাঠ এখানেই তাঁর শেষ। তারপর গেলেন সতরো বছর বয়সে বিলেতে। সেখানে গিয়ে ব্রাইটনে এক ইস্কুলে তাঁকে ভর্তি করা হোল। সেখানের অভিজ্ঞতা তেমন দুঃখকর নয়। তবে সেখানে বেশি দিন পড়েন নি। তখন তাঁর মেজদা ও তারকনাথ পালিত মহাশয়ের নির্দেশক্রমে তাঁকে বাসা করে দেওয়া হোল লণ্ডনে। সেখানে নানা গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ল্যাটিন ও অন্যান্য বিদ্যাভাস শুরু হোল। তাতে যে তিনি খুব বেশি কিছু আয়ত্ত করেছিলেন তা নয়। তবে এ সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি মানুষ ও পৃথিবীর সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং বিভিন্ন দেশের মানুষের হৃদয়ের মধ্যে যে গভীর ঐক্য তা তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর বিশ্বমানবতার ধারণা এ সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই পুষ্টিলাভ করছিল তাতে সন্দেহ নেই। সে দেশে মানুষদের কর্মপ্রেরণা ও মহৎ ঔদার্যও তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজ দেশ, ধর্ম, আচারকে বিষম উগ্রতার সঙ্গে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করবার এই অপরিণত বয়সের স্বাভাবিক ঝোঁকও দেখা দিয়েছিল। তার পরিচয় সে সময়ের ভারতীতে প্রকাশিত "য়ুরোপযাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র"গুলিতে আমরা পাই। এর পর লণ্ডন ইয়ুনিভার্সিটি কলেজেও তিনি কিছুদিন পড়েছিলেন। কিন্তু কোন পরীক্ষা পাশ তিনি করেন নি, কোন ডিগ্রীও তিনি পান নি। পরিবারের ইচ্ছা ছিল তিনি ব্যারিষ্টার হবেন, কিন্তু সে আশা সফল হয়নি। পরীক্ষাপাশ, ডিগ্রীলাভ, প্রচলিত অর্থে "ভালো ছেলে" হওয়ার প্রতি তাঁর অন্তরের মধ্যে বিমুখতা ছিল। ইস্কুল কলেজে পড়ার কড়াকড়ি, বাঁধাবাঁধির মধ্যে তাঁর সৃজনী প্রতিভা মুক্তি পায় নি। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রাণহীন, ব্যক্তিত্ববিকাশের বিরোধী, নিতান্তই ব্যবসায়ী বুদ্ধিচালিত, হীন জীবিকা অর্জনের উপায় মাত্র। যে শিক্ষা সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক নয়,—সে শিক্ষাকে তিনি কোন দিন শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারেন নি। আমাদের শিক্ষার সঙ্গে আমাদের জীবনের কোন অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নেই—তা নিতান্ত আমাদের

জীবনের বাইরের কোঠার জিনিস। তিনি "আশ্রমের রূপ ও বিকাশ" প্রবন্ধে লিখেছেন, "অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আমার মনে এই কথাটি জেগে উঠেছিল, ছেলেদের মানুষ করে তোলবার জন্যে যে একটা যন্ত্র তৈরী হয়েছে, যার নাম ইস্কুল, সেটার ভিতর দিয়ে মানবশক্তির শিক্ষার সম্পূর্ণতা হতেই পারে না।"

ইস্কুল কলেজে পড়ে তিনি বড় হন নি, বিদ্বান হন নি। তিনি যে যশ অর্জন করেছেন তা তাঁর নিজ চেষ্টায় আয়ত্ত। অবশ্য এর পিছনে ছিল তাঁর পিতার উৎসাহ ও পরিবারের সজীব আবহাওয়া। শিশুকালেও পিতা তাঁকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছেন—নানা পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ, নানা কর্মোদ্যমে। দু-একটি উদাহরণ নেওয়া যাক্,—'জীবনস্মৃতি' থেকে…"যদিচ আমি নিতান্ত ছোটো ছিলাম কিন্তু পিতা কখনো আমাকে যথেচ্ছ বিহারে নিষেধ করতেন না। বোলপুরের মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে বর্ষার জলধারায় বালিমাটি ক্ষয় করিয়া প্রান্তরতল হইতে নিম্নে, লাল কাঁকর ও নানাপ্রকার পাথরে রচিত ছোটো ছোটো শৈলমালা, গুহা-গহ্বর, নদী-উপনদী রচনা করিয়া, বালখিল্যদের দেশের ভূবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছে। এখান হইতে জামার আঁচলে নানা প্রকারের পাথর সংগ্রহ করিয়া পিতার কাছে উপস্থিত করিতাম। তিনি আমার এই অধ্যবসায়কে তুচ্ছ বলিয়া একদিনও উপেক্ষা করেন নাই। তিনি উৎসাহ প্রকাশ করিয়া বলিতেন, 'কী চমৎকার! এ-সমস্ত তুমি কোথায় পাইলে!' আমি বলিতাম, "এমন আরও কত আছে! কত হাজার হাজার! আমি রোজ আনিয়া দিতে পারি।" তিনি বলতেন, "সে হইলে তো বেশ হয়। ওই পাথর দিয়া আমার এই পাহাড়টা তুমি সাজাইয়া দাও।" আবার আর এক জায়গায়—"ভগবদ্গীতায় পিতার মনের মতো শ্লোকগুলি চিহ্নিত করা ছিল। সেইগুলি বাংলা অনুবাদ সমেত আমাকে কপি করিতে দিয়াছিলেন। বাড়িতে আমি নগণ্য বালক ছিলাম, এখানে আমার 'পরে এই সকল গুরুতর কাজের ভার পড়াতে তাহার গৌরবটা খুব অনুভব করিতে লাগিলাম।" আর একটি দৃষ্টান্ত—"পিতা বোধ করি আমার সাবধানতা বৃত্তির উন্নতিসাধনের জন্য আমার কাছে দুই চারি আনা পয়সা রাখিয়া বলিতেন, হিসাব রাখিতে হইবে, এবং আমার প্রতি তাঁহার দামি সোনার ঘড়িটি দম দিবার ভার দিলেন। ইহাতে যে ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল, সে চিন্তা তিনি করিলেন না, আমাকে দায়িত্বে দীক্ষিত করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। পথের মধ্যে ভিক্ষুক দেখিলে, ভিক্ষা দিতে আমাকে আদেশ করিতেন।" বাস্তবিক পক্ষে পিতার

উৎসাহ ও সুশৃঙ্খল জীবন রবীন্দ্রনাথকে বিকশিত হতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তাঁর সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে রুচি ও বিজ্ঞান চর্চা বিশেষতঃ জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসার মূলে ছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহ। রবীন্দ্রনাথ দেশের ধর্ম, আচার ও শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে যে গভীর অনুরাগ পোষণ করতেন তার প্রধান উৎস ছিলেন তাঁর পিতা। বাস্তবিক পক্ষে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মজীবন তাঁর পিতার সাধন দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত। তাঁর ইস্কুলের পড়া খুব সুফলপ্রসূ হয়নি সে কথা বলেছি। গৃহে তাঁর বিভিন্ন শিক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা হয়েছিল তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল এ কথা মনে হয় না। বাড়ীতে বাঙলা ভাষার চর্চা তো যথেষ্টই করতে হোত—তা ছাড়া সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য ইত্যাদিও পড়তে হোত—বিজ্ঞান চর্চার জন্যে গৃহশিক্ষক ছিলেন,—দৈহিক চর্চাও নিয়মিতই করতে হোত—তার ফলে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন সুস্থ সবল দেহ। আর একটা শিক্ষা পেয়েছিলেন যা তাঁর জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল—তা হোল সঙ্গীত চর্চা। তাঁর কৈশোরে দৈনিক নানা পাঠ ও ব্যায়ামের তালিকা তিনি 'ছেলেবেলা' ও অন্যত্র দিয়েছেন তা থেকে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সাধারণের মধ্যে যে ধারণা প্রচারিত—যে রবীন্দ্রনাথ আরাম, আয়েস ও বিলাসের মধ্যে মানুষ হয়েছেন—একথা একেবারেই সত্য নয়। শিক্ষা সম্বন্ধে যে সর্বাঙ্গীন দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর শিক্ষা-নীতির বিশেষত্ব তা তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই লাভ করেছিলেন—তাঁর অভিভাবকদেরও এ বিষয়ে দৃষ্টি ছিল বলে মনে হয়। একটা উল্লেখযোগ্য কথা যে তাঁর বাড়ীর আবহাওয়া তাঁর বাড়ন্ত এবং গ্রহণেচ্ছু মনকে নানা দিক দিয়েই উৎসুক করে তুলেছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই আবহাওয়া সৃষ্টি যে মস্ত কথা এটা তিনি তাঁর শান্তিনিকেতন গড়বার সময় বিশেষ করে মনে রেখেছেন। তিনি তাঁর বাড়ীর আবহাওয়া সম্বন্ধে জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন, "ছেলেবেলায় আমার একটা মস্ত সুযোগ এই ছিল যে, বাড়ীতে দিনরাত্রি সাহিত্যের হাওয়া বহিত।" শুধু সাহিত্য কেন ইতিহাস, ধর্ম, সমাজ-সংস্কার, স্বদেশী অনুরাগের নানা আলোচনা ও আয়োজন রবীন্দ্রনাথের সজীব মনটিকে নানাদিক দিয়ে পুষ্ট ও সরস করেছে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতি তাঁর জীবনের বিচিত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত—সেটা নিতান্তই পুঁথিগত জিনিস নয়। তাই এতটা বিস্তারিত-ভাবে তাঁর বাল্য ও কৈশোর জীবনকাহিনী আলোচনা করা হোল।

রবীন্দ্রনাথ যৌবনে উপনীত হলেন। পাশ করলেন না, ব্যারিষ্টার হলেন না,

সিভিল সার্ভিস উত্তীর্ণ হয়ে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট হলেন না। হলেন কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, গল্প রচয়িতা। ক্রমে ক্রমে তাঁর লেখা ছাপা হতে লাগল—সন্ধ্যা-সঙ্গীত, প্রভাত সঙ্গীত, কড়ি ও কোমল, মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি, কণিকা, বউঠাকুরাণীর হাট ও গল্পগুচ্ছ ইত্যাদি। বঙ্কিমচন্দ্রের মত সাহিত্য-রথীর হাত থেকে সম্মানের মালা পেলেন, আবার সুরেশ সমাজপতির মত ধুরন্ধর সমালোচকের কাছ থেকে নিন্দাও কম পেলেন না। জমিদারি দেখতেন, পদ্মার বুকে বোটে করে বেড়াতেন, সাহিত্য চর্চার নেশায় মগ্ন হয়ে রইলেন। কিন্তু কবি তাঁর গজদন্ত নির্মিত কল্পনার সৌধে তাঁর সোনার স্বপ্নে ভুলে থাকতে তো পারলেন না। জমিদারি দেখা উপলক্ষ্যে দেশের লোকের দুর্গতি, হীনতা, অসহায় নিশ্চেষ্টতা, মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত অবমাননা তাঁর চারিদিকে প্রত্যক্ষ করলেন। সংবেদনশীল মন তাঁর চঞ্চল হয়ে উঠল। এ আত্মধিক্কার ধ্বনিত হয়ে উঠেছে 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায়ঃ

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত ;
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে
দূর বন গন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্ত বায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি। ওরে তুই ওঠ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা ? কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি ?
স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া। বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার, সংকুচিত ভীত ক্রীতদাস
লুকাইছে ছদ্মবেশে।......

প্রাণে তাঁর আহ্বান এসে পৌছল—

এই সব মূঢ়, ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ;.........
কবি তবে উঠে এসো—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহো সাথে, তবে তাই করো আজি দান।

বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র বদ্ধ অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু।
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্যমাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।"

স্মরণ রাখতে হবে এ কবিতা ১৩০০ সালে লেখা। বঙ্গভঙ্গজনিত রাজনৈতিক আন্দোলনের বহুপূর্বেই কবির মনে গভীর বেদনা জেগেছিল। দেশের এ দুর্গতি দূর করবার জন্যে তাঁরও দায়িত্ব আছে এ কথাটি কবির মনকে আন্দোলিত করতে লাগল। তাঁর পরিবারের আবহাওয়াটিও অনুকূল ছিল। জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন, "আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল (ইং ১৮৭৫)। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা এই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয়-সঙ্গীত 'মিলে সবে ভারত সন্তান' রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প, ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।" একটি গুপ্ত সমিতি (যার সাঙ্কেতিক নাম ছিল 'হাম্ চুপা মুহাক')ও তাঁরা গঠন করেছিলেন। "এক পোড়ো বাড়িতে সেই সভা বসিত। সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল। দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋক্‌মন্ত্রে, কথা আমাদের চুপি চুপি—ইহাতেই সকলের রোমহর্ষণ হইত। আর বেশি কিছুই প্রয়োজন ছিল না। সেই সভায় আমরা একটি ক্ষ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম···এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো।" এই 'ক্ষ্যাপামি' শুধু একটা ক্ষণিক উত্তেজনাতেই শেষ হয়ে যায় নি। শুধু মাত্র উত্তেজনার হুজুগে মেতে ওঠা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। এবং সেই কারণেই স্বদেশী আন্দোলন বা পরবর্তী রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির মাতামাতিকে তিনি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতে পারেন নি। তাঁর মনের মধ্যে দেশ সম্বন্ধে বেদনা ক্রমশঃ গঠনমূলক পরিণতি লাভ করেছিল। তা শুধুই নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক ছিল না।

দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দুর্গতি তাঁকে ব্যথিত করে তুলেছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেশের একটি ধ্যানময় কল্যাণমূর্তি তাঁর অন্তরে ধীরে ধীরে বিকশিত

হয়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাস তাঁকে নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করতে লাগল—দেশের প্রকৃত আত্মার স্বরূপটি তিনি প্রাচীন যুগের মধ্যে যেন প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। 'কথা' (১৩০৪) ও 'কাহিনী' (১৩০৬)তে পরিচয় আমরা পাই—পরিচয় পাই নানা প্রবন্ধে। 'নৈবেদ্য'-এ (১৩০৮) প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের মহান আদর্শের আহ্বান তাঁকে মুগ্ধ করেছে দেখতে পাই। তিনি তাঁর কর্তব্যের আহ্বান শুনেছিলেন, রাজনীতির ক্ষেত্রে মুখ্যভাবে নয়, গ্রাম সংগঠনের ক্ষেত্রে। তাঁর মন বিশেষ করে আকৃষ্ট হচ্ছিল দেশের শিক্ষা সংস্কারের দিকে—যার মধ্যে গড়ে উঠবে সুস্থ, স্বাভাবিক, স্বাধীন, কর্মকুশল, সুখী মানুষ। তাঁর সন্তানের শিক্ষার সমস্যাও তখন তাঁকে পীড়িত করে তুলেছিল। তাঁর মনে তাই জাগল শান্তরসাস্পদ প্রাচীন তপোবন আশ্রমের ছবি—'শান্তিনিকেতন' আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা হোল। অবশ্য তারও কিছুদিন আগে তিনি রথীন্দ্রনাথ ও আরও কয়েকটি গ্রামের ছেলেকে পড়াবার জন্যে গৃহ-বিদ্যালয় স্থাপন করেন শিলাইদহে। নিজেই পড়াতে শুরু করলেন ; সঙ্গে জুটে গেলেন এক ইংরেজ শিক্ষক, নাম লরেন্স। তাঁর শিক্ষানীতির প্রথম পরীক্ষা শুরু করলেন। যে জিনিসকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন সেখানে ফাঁকি কখনও দেন নি। শিলাই-দহের সে পরীক্ষারই পরিণতি 'শান্তিনিকেতন' আশ্রমবিদ্যালয়। সেই সূচনা সম্বন্ধে তিনি এক প্রবন্ধে লিখেছেন, "কোন জিনিসের আরম্ভ কী করে হয় তা বলা যায় না। সেই আরম্ভকালটি রহস্যে আবৃত থাকে। আমি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত পদ্মার বোটে কাটিয়েছি, আমার প্রতিবেশী ছিল বালিচরের চক্রবাকের দল। তাদের মধ্যে বসে বসে আমি বই লিখেছি। হয়তো চিরকাল এইভাবেই কাটাতুম। কিন্তু মন হঠাৎ কেন বিদ্রোহী হল, কেন ভাবজগৎ থেকে কর্মজগতে প্রবেশ করলাম ?

আমি বাল্যকালের শিক্ষাব্যবস্থায় মনে বড়ো পীড়া অনুভব করেছি। সেই ব্যবস্থায় আমাকে এত ক্লেশ দিত, আঘাত করত যে বড়ো হয়েও সে অন্যায় আমি ভুলতে পারিনি। কারণ প্রকৃতির বক্ষ থেকে, মানব-জীবনের সংস্পর্শ থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে শিশুকে বিদ্যালয়ের কলের মধ্যে ফেলা হয়। তার অস্বাভাবিক পরিবেষ্টনের নিষ্পেষণে শিশুচিত্ত প্রতিদিন পীড়িত হতে থাকে। ...আমরা—যাদের শিশুপ্রকৃতির মধ্যে প্রাণের উদ্যম সতেজ ছিল—এতে বড়োই দুঃখ পেতাম। প্রকৃতির সাহচর্য থেকে দূরে থেকে আর মাষ্টারদের সঙ্গে প্রাণগত যোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আমাদের আত্মা যেন শুকিয়ে যেত। মাষ্টারেরা সব আমাদের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করত।

প্রাণের সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে বিদ্যালাভ করা যায়, এটা কখনও জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না।

আমি এ বিষয় নিয়ে কখনও কখনও বক্তৃতাও দিয়েছিলাম। কিন্তু যখন দেখলাম আমার কথাগুলি শ্রুতিমধুর কবিত্ব হিসাবেই সকলে নিলেন এবং যাঁরা কথাটাকে মানলেন তাঁরা এটা কাজে খাটাবার কোনো উদ্যোগ করলেন না, তখন আমার ভাবকে কর্মের মধ্যে আকার দান করার জন্যে আমি নিজেই কৃত-সংকল্প হ'লাম। আমার আকাঙ্ক্ষা হল, আমি ছেলেদের খুশি করব, প্রকৃতির গাছপালাই তাদের অন্যতম শিক্ষক হবে, জীবনের সহচর হবে—এমনি করে বিদ্যার একটি প্রাণ নিকেতন নীড় তৈরী করে তুলব।" 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' এর আর একটি প্রবন্ধে—বিদ্যালয় স্থাপন ও শিলাইদহে শিক্ষার পরীক্ষা সম্পর্কে লিখেছেন—"রথীন্দ্রনাথকে পড়াবার সমস্যা এল সামনে। তখন প্রচলিত প্রথায় তাকে ইস্কুল পাঠালে আমার দায় হ'ত লঘু, এবং আত্মীয় বান্ধবেরা সেইটেই প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু বিশ্বক্ষেত্র থেকে যে শিক্ষালয় বিচ্ছিন্ন সেখানে তাকে পাঠানো আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। আমার ধারণা ছিল, অন্ততঃ জীবনের আরম্ভকালে নগরবাস প্রাণের পুষ্টি ও মনের প্রথম বিকাশের পক্ষে অনুকূল নয়। শহরে যানবাহন ও প্রাণযাত্রার অন্যান্য নানাবিধ সুযোগ থাকে, তাতে সম্পূর্ণ দেহ চালনা ও চারিদিকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভে শিশুরা বঞ্চিত হয়, বাহ্য বিষয়ে আত্মনির্ভর চিরদিনের জন্যে তাদের শিথিল হয়ে যায়। ···দেহটাকে সম্যকরূপে ব্যবহার করবার যে শিক্ষা প্রকৃতি আমাদের কাছে দাবী করে, এবং নাগরিক 'ভদ্দর' শ্রেণীর রীতির কাছে যেটা উপেক্ষিত অবজ্ঞাভাজন, তার অভাব-দুঃখ আমার জীবনে আজ পর্যন্ত আমি অনুভব করি।"

শিলাইদহে তিনি রথীন্দ্রনাথকে কি রকম শিক্ষা দিচ্ছিলেন? "শিলাইদহের বিশ্বপ্রকৃতির নিকটসান্নিধ্যে রথীন্দ্রনাথ যে রকম ছাড়া পেয়েছিল সে রকম মুক্তি তখনকার কালের সম্পন্ন অবস্থার গৃহস্থেরা আপন ঘরের ছেলেদের পক্ষে অনুপযোগী বলেই জানত এবং তার মধ্যে যে বিপদের আশঙ্কা আছে, তারা ভয় করত তাকে স্বীকার করতে। রথী সেই বয়সে ডিঙি বেয়েছে নদীতে। সেই ডিঙিতে করে চলতি ষ্টীমার থেকে সে প্রতিদিন রুটি নামিয়ে আনত, তাই নিয়ে ষ্টীমারের সারেঙ আপত্তি করেছে বারে বারে। চরে বনঝাউয়ের জঙ্গলে সে বেরোত শিকার করতে—কোনদিন বা ফিরে এসেছে সমস্ত দিন পরে অপরাহ্নে। তা নিয়ে ঘরে

উদ্বেগ ছিল না তা বলতে পারিনে, কিন্তু সে উদ্বেগ থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে বালকের স্বাধীন সঞ্চরণ খর্ব করা হয়নি!" শিলাইদহে বালকদের শিক্ষার যে আয়োজন শুরু করেছিলেন, কিছুদিন পরে বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে তা স্থায়িভাবে স্থাপন করলেন। এ আশ্রম তাঁর ও ভগবদ্‌বিশ্বাসী মানুষদের সাধনার ক্ষেত্র হিসাবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানে নির্মুক্ত প্রান্তরের মাঝখানে জোড়া ছাতিমগাছের তলে রৌদ্রতপ্ত খর মধ্যাহ্নে তৃষা-পীড়িত দেবেন্দ্রনাথ একদিন পেয়েছিলেন "প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।" তাই আশ্রমের নাম দিয়েছিলেন "শান্তিনিকেতন।" কবির মনে যখন তপোবনের পরিবেশে সন্তানদের শিক্ষা-সাধনার ক্ষেত্র স্থাপনের সংকল্প জাগল তখন এই শান্তিনিকেতন আশ্রমের কথাই স্বভাবতঃ তাঁর মনে পড়ল। তিনি "আশ্রমের রূপ ও বিকাশ" এর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন—"শান্তি-নিকেতনে এসেই আমার জীবনে প্রথম সম্পূর্ণ ছাড়া পেয়েছি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে। উপনয়নের পরেই আমি এখানে এসেছি। উপনয়ন অনুষ্ঠানে ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করবার যে দীক্ষা পেয়েছিলেম পিতৃদেবের কাছ থেকে, এখানে বিশ্বদেবতার কাছ থেকে পেয়েছিলেম সেই দীক্ষাই।" "তার পরে সেদিনকার বালক যখন যৌবনের প্রৌঢ়বিভাগে তখন বালকদের শিক্ষার তপোবন তাকে দূরে খুঁজতে হবে কেন? আমি পিতাকে গিয়ে জানালেম, শান্তিনিকেতন এখন প্রায় শূন্য অবস্থায়, সেখানে যদি একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারি তা হলে তাকে সার্থকতা দেওয়া হয়। তিনি তখনই উৎসাহের সঙ্গে সম্মতি দিলেন।" বাং ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ মহর্ষির দীক্ষার দিনটিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই আশ্রম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

এখানে এ কথাটা আলোচনা করা যেতে পারে—এ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় কি "বড়লোকের একটা খেয়াল" মাত্র? রবীন্দ্রনাথ যখন এ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন তখন বাস্তবিক পক্ষে তিনি "বড়লোক" ছিলেন না। বরং তাঁর কাঁধে ঋণের বোঝাই ছিল। "তখন আমার ঘাড়ে মস্ত একটা দেনা ছিল।...সে দেনার পরিমাণ লক্ষ টাকারও অধিক ছিল। আমার এক পয়সার সম্পত্তি ছিল না, মাসিক বরাদ্দ সামান্য। আমার বইয়ের কপিরাইট প্রভৃতি আমার সাধ্যায়ত্ত সামগ্রীর কিছু কিছু সওদা করে অসাধ্যসাধনে লেগে গেলাম। আমার ডাক দেশের কোথাও পৌঁছয় নি।" এ বিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠা ও

রক্ষা করতে তাঁর স্ত্রীর অলঙ্কারও তিনি নিতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর নিজের পুস্তকের সমস্ত উপস্বত্ব তিনি দান করেছেন "বিশ্বভারতী"কে। আজীবন নিজ চেষ্টা দ্বারা এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষার চেষ্টা করেছেন, এদের গড়ে তুলবার জন্যে চিন্তা করেছেন, শ্রম করেছেন, সমস্ত উদ্বেগ বহন করেছেন। বরং বিদেশ থেকে অনেক সাহায্য তিনি পেয়েছেন, তার তুলনায় দেশবাসীর সাহায্য সামান্য। এ বিদ্যালয় তাঁর ক্ষণিকের খেয়াল নয়—কোন একটি উত্তেজনাকর মুহূর্তের ফল নয়। এ তাঁর জীবনের সাধনা—এ তাঁর কাব্যসাধনারই আর একটি রূপ। A Poet's School প্রবন্ধে তিনি কেন কাব্যজগৎ ছেড়ে এ কর্ম-জগতে প্রবেশ করলেন তার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে বলেছেন, "The poet may be compared to (that) foolish butterfly. He...tries to translate all the festive colours of creation in the vibration of his verses, then why should he imprison himself in an interminable coil of duty, bringing out some good, tough and fairly respectable result? Why should he make himself accountable to those sane people who would judge the merit of his produce by the amount of profit it will bring?

Suppose this individual poet's answer would be, that when he brought together a few boys, one sunny day in winter, among the warm shadow of the Sal trees, strong, straight and tall, with branches of a dignified moderation, he started to write a poem in a medium not of words."

প্রত্যেক সংস্কারের মধ্যেই একটি প্রতিবাদ থাকে। এ আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনের মধ্যেও সে প্রতিবাদ ছিল—সে প্রতিবাদ প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। রুশোর শিক্ষানীতির মধ্যেও অনুরূপ প্রবল প্রতিবাদ সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের মনে তাঁর বাল্যের শিক্ষা সম্বন্ধে গভীর বেদনা ও ক্ষোভ ছিল সে কথা পূর্বেই বলেছি। A Poet's School প্রবন্ধেও তিনি লিখেছেন, "In these self-conscious days of psycho-analysis, clever minds have discovered the secret spring of poetry in some obscure stratum of repressed freedom, in some constant fretfulness of thwarted self-realisation. Evidently in this case they are right. The phantom of my long-ago boyhood did come to haunt the ruined

opportunities of its early beginning; it sought to live in the lives of other boys, to build up its missing paradise as only children can do with ingredients which may not have any orthodox material, prescribed measure or standard value."

তিনি দেখেছিলেন আমাদের শিশুদের দেহ মন আত্মা নানা নিষেধের শৃঙ্খলে বাঁধা। আমাদের সমাজ শিশুকে কেবলই নিষেধ করে, বাধা দেয়—কোন বড় মুক্তির আহ্বান সমাজের কাছ থেকে আমরা পাই না। দেশের যে বিদেশী শাসক তাঁরাও তাঁদের শাসনযন্ত্রের প্রয়োজনে আমাদের কেরানী হবার জন্যে যতটুকু দরকার সেটুকু শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক। 'আমাদের সম্বন্ধে তাঁদের কোন শ্রদ্ধা নেই, কোন বড় প্রত্যাশাও নেই। তাই এই শিক্ষা শিশুদের মনে কোন স্বাভাবিক উদ্যম জাগায় না। এ একটা বিদেশী কল, তাতে ডিগ্রী পাওয়া যায় যার ফলে কেরানীগিরি চাকুরী পাওয়া যায়, বড় জোর জজ ম্যাজিষ্ট্রেট পর্যন্ত হওয়া যায়, কিন্তু সম্পূর্ণ ও সুষম মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে এ শিক্ষা সম্পূর্ণ নিষ্ফল। 'শান্তিনিকেতন' আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় এ কথা তাঁর মনকে আন্দোলিত করেছিল—তার পরেও এ মত বরং দৃঢ়তর হয়েছে। ১৩১৯ সালে 'শিক্ষাবিধি' প্রবন্ধে লিখছেন, "...যে দেশে সামাজিক শিক্ষাশালায় বাঁধা প্রথা হইতে একচুল সরিয়া গেলে জাত হারাইতে হয়, সে দেশে মানুষ হইবার পক্ষে গোড়াতেই একটা প্রকাণ্ড বাধা। সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতেছেই এবং ঘটিবেই, কেহ তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না—অথচ ব্যবস্থাকে সনাতন রেখায় পাকা করিয়া রাখিলে মানুষের পক্ষে তেমন দুর্গতির কারণ আর কিছুই হইতে পারে না।......সামাজিক বিদ্যালয়ের তো এই বদ্ধ দশা, তাহার পরে রাজকীয় বিদ্যালয়! সেও একটা প্রকাণ্ড ছাঁচে ঢালা ব্যাপার। দেশের সমস্ত শিক্ষা-বিধিকে সে এক ছাঁচে শক্ত করিয়া জমাইয়া দিবে, ইহাই তাহার একমাত্র চেষ্টা। পাছে দেশ আপনার স্বতন্ত্র প্রণালী আপনি উদ্ভাবিত করিতে চায়, ইহাই তাহার সবচেয়ে ভয়ের বিষয়। দেশের মনঃপ্রকৃতিতে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া, সে আপনার আইন খাটাইবেই, ইহাই তাহার মৎলব। সুতরাং এই বৃহৎ বিদ্যার কল, কেরানীগিরির কল হইয়া উঠিতেছে; মানুষ এখানে নোটের নুড়ি কুড়াইয়া ডিগ্রীর বস্তা বোঝাই করিয়া তুলিতেছে, কিন্তু তাহা জীবনের খাদ্য নহে। তাহার গৌরব কেবল বোঝাইয়ের গৌরব, তাহা প্রাণের গৌরব নহে।" তিনি সে

প্রাণের গৌরবের সন্ধান পেলেন প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শে। সম্ভবত সমসাময়িককালে বিবেকানন্দের চিন্তা ও বাণী তাঁর ধারণাকে প্রভাবান্বিত করেছিল। তা ছাড়া কিছুদিন পূর্বে ব্রাহ্মসমাজে বিবাহবিধি নিয়ে যে আন্দোলন চলেছিল তাতে ব্রাহ্মরা হিন্দু ব'লে নিজেদের পরিচয় দেবেন কি না এ নিয়ে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব উগ্র হয়ে উঠেছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মনে এ সম্বন্ধে কোন দ্বিধা ছিল না। তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারকে সবলে অস্বীকার করেছেন কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মের সার্থক উদার প্রকাশ এ বিশ্বাসে তিনি অবিচল ছিলেন। প্রাচীন হিন্দুধর্মের মধ্যে যে উদার সত্য আছে তাকে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন—এবং হিন্দু ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের বিশুদ্ধ আদর্শকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তাই নিজেকে হিন্দু বলে প্রচারে তাঁর কোন লজ্জা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শটি পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন, তাই প্রাচীন তপোবনের আদর্শ স্বভাবতঃই তাঁর মনকে আকর্ষণ করেছিল। এই তপোবনের আদর্শ কি? এটি বিদ্যার্থী ও শিক্ষকের সম্মিলিত সাধনার প্রাণময় ও আনন্দময় ক্ষেত্র। সে সাধনা সত্যকে আয়ত্ত করার, সত্যকে উপলব্ধি করার, সত্যাগ্রহী হয়ে ওঠার সাধনা। জীবনের পূর্ণ ও সার্থক বিকাশের জন্যেই শিক্ষা—ভারতীয় প্রতিভা সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে যে আধারটি রচনা করেছিল—তাই তপোবন। ১৩৩৯ সালে ৯ই পৌষ শান্তিনিকেতন মন্দিরে উপদেশ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আমার মনে হয়েছিল জীবনের কী লক্ষ্য এই প্রশ্নের মীমাংসা যেন শিক্ষার মধ্যে পেতে পারি। আমাদের দেশের পুরাতন শিক্ষা প্রণালীতে তার আভাস পাওয়া যায়। তপোবনের বিচিত্র তপস্যা ও অধ্যাপনার মধ্যে যে শিক্ষা সাধনা আছে তাকে আশ্রয় করে শিক্ষক ও ছাত্র জীবনের পূর্ণতা লাভ করেছিলেন। শুধু পরা বিদ্যা নয়, শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ প্রভৃতি অপরা বিদ্যার অনুশীলনেও যেমন প্রাচীনকালে গুরুশিষ্য একই সাধন-ক্ষেত্রে মিলিত হয়েছিলেন, তেমনি সহযোগিতার সাধনা যদি এখানে হয় তবেই শিক্ষার পূর্ণতা হবে। তপোবনের গুরুগৃহের শিক্ষা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষকে প্রীতির সম্বন্ধে ঔৎসুক্যের সম্বন্ধে যুক্ত করে আবার মানুষের সঙ্গে মানুষকেও শ্রদ্ধার বন্ধনে আবদ্ধ করে। এ সংযোগ শুধু স্বার্থের সংযোগ নয়, প্রয়োজনের সংযোগ নয়, একাত্মবোধের সংযোগ!" 'তপোবন' (১৩১৬) প্রবন্ধে লিখেছেন, "এই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠকে সকলের মধ্যেই বোধের দ্বারা অনুভব করা

ভারতবর্ষের সাধনা।" যা খণ্ডিত, যা বিচ্ছিন্ন—তা অসার্থক, তা সঙ্গতিহীন, ভয়ঙ্কর, একথাটি সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুভূতিতে জেনেছিলেন, তাই ভারতের তপোবনের আদর্শে যে ভূমা ও সমগ্রতার কল্পনা রূপ পেয়েছে তাকে তিনি তাঁর শিক্ষার একটি মূল উদ্দেশ্য বলে চিরকাল বিশ্বাস করেছেন। "অতএব যদি আমরা মনে করি ভারতবর্ষের এই সাধনাতে দীক্ষিত করা ভারতবাসীর শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত, তবে এটা মনে স্থির রাখতে হবে যে কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ কেবল কারখানার দক্ষতা শিক্ষা নয়, স্কুল-কলেজে পরীক্ষা পাশ করা নয়, আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে—প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে, তপস্যা দ্বারা পবিত্র হয়ে।" ১৩২৯ সালে লেখা আর একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন "......তপোবনের শিক্ষা প্রণালীতে খুব একটি বড়ো সত্য আছে। যে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির কোলে আমাদের জন্ম তার শিক্ষকতা থেকে বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে মানুষ সম্পূর্ণ শিক্ষা পেতে পারে না। বনস্থলীতে যেমন এই প্রকৃতির সাহচর্য আছে তেমনি অপরদিকে তপস্বী মানুষের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাসম্পদ এই প্রকৃতির মাঝখানে বসে যখন লাভ করা যায় তখনই যথার্থ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের মধ্যে বাস করে বিদ্যাকে গুরুর কাছ থেকে পাওয়া যায়।...এতে করে শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে যথার্থ যোগ স্থাপিত হয়, গুরুশিষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ সত্য ও পূর্ণ হয়, বিশ্বপ্রকৃতির ও মানবপ্রকৃতির সঙ্গে মিলন মধুর ও স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। তাই আমার মনে হয়েছিল যে, তখনকার দিনে তপোবনের মধ্যে মানবজীবনের বিকাশ একটি সহজ ব্যাপার ছিল বটে, কিন্তু তার সময়টি এখনও উত্তীর্ণ হয়ে যায় নি ; তার মধ্যে যে সত্য ও সৌন্দর্য আছে তা সকল কালের। বর্তমান কালেও তপোবনের জীবন আমাদের অগম্য হওয়া উচিত নয়।" এ আদর্শ শুধু একটা 'কাব্যিয়ানা' নয়, তাকে সার্থক রূপ দিতেই তিনি শান্তিনিকেতনে আজীবন নানা পরীক্ষা ও চেষ্টা করে গেছেন। এ আশ্রমে সপরিবারে তিনি বাস করতেন। তাঁর ছেলে রথীন্দ্র ও শমীন্দ্র ছাড়াও আরও কয়েকটি ছেলে একত্রিত হয়েছিল। দালান কোঠা, ডেস্ক, সরঞ্জাম ছিল না। গাছের তলায়ই হ'ত ক্লাস, অল্প যে কয়েকজন এ আদর্শে আকৃষ্ট হ'য়ে এসেছিলেন—যেমন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রেবাচাঁদ, পরে সতীশচন্দ্র রায়, অজিত চক্রবর্তী, জগদানন্দ রায়, ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী ইত্যাদি, তাঁরা ছাত্রদের সঙ্গেই বাস করতেন। তাঁরা

অর্থের লালসায় আসেন নি, এসেছিলেন আদর্শের আকর্ষণে। ঐশ্বর্য তাঁদের ছিল না বেশে-বাসে—ঐশ্বর্য ছিল ছাত্রদের প্রতি স্নেহের প্রাচুর্য আর জ্ঞানের সঞ্চয়ে। থাকতেন তাঁরা কুটিরে। রবীন্দ্রনাথ নিজে সপরিবারে ছিলেন এই আশ্রমের কেন্দ্র—শিক্ষকদের মধ্যে একজন। ছাত্রদের পুঁথিপত্রের মধ্যে দিয়ে, শাসনের ভীতি দিয়ে আবদ্ধ করে রাখেন নি। প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রান্তরে তাদের যথেচ্ছ বিচরণের সুযোগ দিয়েছেন। বই মুখস্থ করে পরীক্ষা পাশের জন্য তাড়া দেন নি। তাদের চারপাশের প্রকৃতির প্রতি তাদের কৌতূহলী করে তুলেছেন, তাদের প্রশ্ন করতে সাহস দিয়েছেন, নানা পরীক্ষা ও কর্ম-উদ্যমে উৎসাহ দিয়েছেন। গল্প ও খেলার মধ্যে দিয়ে জ্ঞানের পথে আনন্দ পেতে শিখিয়েছেন। একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, "আমি পাঁচ-ছয়টি ছেলে নিয়ে জামগাছতলায় তাদের পড়াতাম। আমার নিজের বেশি বিদ্যে ছিল না। কিন্তু আমি যা পারি তাই করেছি। সেই ছেলে কয়টিকে নিয়ে রস দিয়ে, ভাব দিয়ে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়েছি—তাদের কাঁদিয়েছি, হাসিয়েছি, ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের মানুষ করেছি।" ১৩৪২ সনে ৮ই পৌষ আশ্রমের প্রার্থনান্তে উপদেশে বলেছেন, "ছেলেদের জন্যে নানা রকম খেলা মনে মনে আবিষ্কার করেছি, একত্র হয়ে তাদের সঙ্গে অভিনয় করেছি, তাদের জন্যে নাটক রচনা করেছি। সন্ধ্যার অন্ধকারে যাতে তারা দুঃখ না পায় এ জন্যে তাদের চিত্ত বিনোদনের নূতন নূতন উপায় সৃষ্টি করেছি, তাদের সমস্ত সময়ই পূর্ণ করে রাখবার চেষ্টা করেছি।... তাদের আপন অন্তরের মধ্যে তাদের জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি। কোন নিয়ম দ্বারা তারা পিষ্ট না হয়, এই আমার মনে অভিপ্রায় ছিল। এই চেষ্টার সঙ্গী পেয়েছিলাম কিশোর কবি সতীশচন্দ্রকে—শিক্ষাকে তিনি আনন্দে সরস করে তুলতে পেরেছিলেন, সেক্সপীয়রের মতো কঠিন বিষয়কেও তিনি অধ্যাপনার গুণে শিশুদের মনে মুদ্রিত করে দিতে পেরেছিলেন। তারপর ক্রমশঃ নানা ঋতু উৎসবের প্রচলন হয়েছে, আপনার অজ্ঞাতসারে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের আনন্দের যোগ এই উৎসবের সহযোগে গড়ে উঠবে এই আমার লক্ষ্য ছিল।" ইতিপূর্বে রথীন্দ্রনাথের শিক্ষার বেলায় শিলাইদহে যে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন সেকথা বলেছি। এখানেও তার অনুরূপ পরীক্ষাই চলল। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, "একসময়ে নিজের অনভিজ্ঞতার" খেদে আমার হঠাৎ মনে হল যে, একজন হেড মাষ্টারের নেহাত দরকার। কে যে একজন লোকের নাম করে বললে, 'অমুক

লোকটি একজন ওস্তাদ শিক্ষক, যাকে তাঁর পাশের সোনার কাঠি ছুঁইয়েছেন সেই পাশ হয়ে গেছে।' তিনি তো এলেন, কিন্তু কয়েকদিন সব দেখেশুনে বললেন, 'ছেলেরা গাছে চড়ে, চেঁচিয়ে কথা কয়, দৌড়ায়, এ তো ভাল না।" আমি বললুম, 'দেখুন আপনার বয়সে তো কখনও তারা গাছে চড়বে না। এখন একটু চড়তেই দিন না। গাছ যখন ডালপালা মেলেছে, তখন সে মানুষকে ডাক দিচ্ছে। ওরা ওতে চড়ে পা ঝুলিয়ে থাকলই বা।" শিক্ষাকে আনন্দময় করবার চেষ্টার সঙ্গে ছিল তাদের রুচিকে বিকশিত করার এবং আত্মকৃতিত্ব-বোধ জাগ্রত করার চেষ্টা। গান শিখিয়েছেন, অভিনয় শিখিয়েছেন—ছবি আঁকতে, মূর্তি গড়তে, বাগান করতে উৎসাহ দিয়েছেন। এসব অবশ্য পরে অনেক বেড়েছে। কিন্তু শুধু স্নেহ, শুধু আনন্দ, শুধু স্বাধীনতাই নয়, ছিল কৃচ্ছ্রসাধনের শিক্ষা, সরল ও শুচি জীবনের তপশ্চর্যার শিক্ষা, শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধার শিক্ষা, সামাজিকতা ও ভদ্র আচরণের শিক্ষা। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবসের উপদেশকালে তিনি বলেছিলেন, "আমাদের পূর্বপুরুষেরা কিরূপ শিক্ষা ও ব্রত অবলম্বন করতেন? তাঁরা বাল্যকালে গৃহ ছেড়ে নির্জনে গুরুর বাড়িতে যেতেন। সেখানে খুব কঠিন নিয়মে নিজেকে সংযত করে রাখতে হ'ত। গুরুকে একান্ত মনে ভক্তি করতেন, গুরুর সকল কাজ করে দিতেন। গুরুর জন্যে কাঠ কাটা, জল তুলে আনা, তাঁর গরু চরানো, তাঁর জন্যে গ্রাম থেকে ভিক্ষে করে আনা, এই সমস্ত তাদের কাজ ছিল, তা তারা যত বড় ধনীর ছেলেই হোক না। শরীর মনকে একেবারে পবিত্র রাখতে হবে—তাঁদের শরীরে ও মনে কোন রকম দোষ একেবারে স্পর্শ করতো না। গেরুয়া বস্ত্র পরতেন, কঠিন বিছানায় শুতেন, পায়ে জুতো নেই, মাথায় ছাতা নেই—সাজসজ্জা বড়োমানুষি কিছুমাত্র নেই। সমস্ত মনের সমস্ত চেষ্টা কেবল শিক্ষালাভে, কেবল সত্যের সন্ধানে, কেবল নিজের দুষ্প্রবৃত্তি দমনে, নিজের ভাল গুণকে ফুটিয়ে তুলতে নিযুক্ত থাকত।

তোমাদের সেই রকম কষ্ট স্বীকার করে সেই কঠিন নিয়মে সকল প্রকার বড়োমানুষিকে তুচ্ছ করে দিয়ে এখানে গুরুগৃহে বাস করতে হবে। গুরুকে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধা করবে, মনে বাক্যে কাজে তাঁকে লেশমাত্র অবজ্ঞা করবে না।" শারীরিক শ্রম ও স্বাস্থ্যবিধি পালন শিক্ষক ছাত্র সকলের পক্ষেই অবশ্য কর্তব্য ছিল। এ থেকে এটা বোঝা যাবে শান্তিনিকেতনের আদর্শ "নাচগান ফূর্তির আড্ডা" নয়।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদানপদ্ধতির মধ্যেও দেখি তিনি সহজ ও ফাঁকির প্রশ্রয় দেননি। ছাত্রদের কাছে অনেক সময় কঠিন বিষয়ের আলোচনা করেছেন, ওয়ার্ডস্বার্থ, কীটস্‌, ব্রাউনিং, কালিদাস, ভবভূতি ইত্যাদি বিশ্ববিখ্যাত কবি ও মনীষীদের লেখা প'ড়ে শুনিয়েছেন। তারা হয়তো অনেক সময় সে সব আলোচনা বুঝতে পারে নি। কিন্তু তাই বলে অতিরিক্ত সহজ করে ব্যাখ্যা করে অত্যন্ত 'নরম' করে দিয়ে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করেননি। তাদের কল্পনা উদ্‌বুদ্ধ হ'ক, তাদের সাহস ও আত্মনির্ভরতা বাড়ুক এই ছিল তাঁর আদর্শ। ভীরুতা নয়, আলস্য নয়, কঠিন ও দুরূহকে জয় করবার, আয়ত্ত করবার বীর্য ও উদ্যম তাদের জাগুক এই তিনি চেয়েছেন। তাদের বুদ্ধির অনুপাতে অনেক কঠিন বই নিয়ে নাড়াচাড়া করতেও তিনি কোনদিন নিষেধ করেন নি। ছাত্রদের জন্যে নানা বিষয়ে বই তিনি লিখেছেন। শুধু গল্প, উপন্যাস, নাটক নয়, পাঠ্যপুস্তক, বিজ্ঞানের বই—সর্বত্রই ছোটরা কি করে জ্ঞানের বস্তুকে ভালবাসতে শিখবে সে চেষ্টা আছে, কিন্তু কোথাও ফাঁকি দিয়ে মন ভোলাবার চেষ্টা নেই। তাঁর 'বিশ্বপরিচয়' বইএর ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "এর নৌকোটা অর্থাৎ এর ভাষাটা যাতে সহজে চলে সে চেষ্টা এতে আছে, কিন্তু মাল খুব কমিয়ে দিয়ে একে হালকা করা কর্তব্য বোধ করিনি। দয়া করে বঞ্চিত করাকে দয়া বলে না। আমার মত এই যে, যাদের মন কাঁচা তারা যতটা স্বভাবত পারে নেবে, না পারে আপনিই ছেড়ে দিয়ে যাবে, তাই ব'লে তাদের পাতটাকে প্রায় ভোজ্য শূন্য করে দেওয়া সদ্ব্যবহার নয়। যে বিষয়টা শেখবার সামগ্রী, নিছক ভোগ করবার নয়, তার উপর দিয়ে অবাধে চোখ বুলিয়ে যাওয়াকে পড়া বলা যায়। মন দেওয়া এবং চেষ্টা করে বোঝাটাও শিক্ষার অঙ্গ, সেটা আনন্দেরই সহচর। ...এক বয়সে দুধ যখন ভালবাসতুম না, তখন গুরুজনদের ফাঁকি দেবার জন্যে দুধটাকে আগাগোড়া ফেনিয়ে বাটি ভরতি করার চক্রান্ত করেছি। ছেলেদের বই যাঁরা লেখেন, দেখি তাঁরা প্রচুর পরিমাণে ফেনার যোগান দিয়ে থাকেন। এইটে ভুলে যান, জ্ঞানের যেমন আনন্দ আছে তেমনি তার মূল্যও আছে, ছেলেবেলা থেকে মূল্য ফাঁকি দেওয়া অভ্যাস হোতে থাকলে যথার্থ আনন্দের অধিকারকে ফাঁকি দেওয়া হয়। চিবিয়ে খাওয়াতেই একদিকে দাঁত শক্ত হয় আর একদিকে খাওয়ার পুরো স্বাদ পাওয়া যায়।"

১৩২৯ সালের একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "আমাদের দেশবাসীরা 'ভূমৈব সুখম্' এই ঋষিবাক্য ভুলে গেছে। ভূমৈব সুখং, তাই, জ্ঞানতপস্বী মানব দুঃসহ ক্লেশ

স্বীকার করেও উত্তর মেরুর দিকে অভিযানে বার হচ্ছে, আফ্রিকার অভ্যন্তর প্রদেশে দুর্গম পথে যাত্রা করেছে, প্রাণ হাতে করে সত্যের সন্ধানে ধাবিত হচ্ছে। তাই কর্ম জ্ঞান ও ভাবের সাধন পথের পথিকেরা দুঃখের পথ অতিবাহন করতে নিক্রান্ত হয়েছেন; তাঁরা জেনেছেন যে, ভূমৈব সুখং—দুঃখের পথেই মানুষের সুখ। আজ আমরা সে কথা ভুলেছি, তাই অত্যন্ত ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও অকিঞ্চিৎকর জীবনযাত্রার মধ্যে আত্মাকে প্রচ্ছন্ন করে দিয়ে দেশের প্রায় সকল লোকেরই কাল কাটছে। শিক্ষালয় স্থাপন করবার সময়ে প্রথমেই আমার একথা মনে হল যে, আমাদের ছাত্রদের জীবনকে মানসিক ক্ষীণতা থেকে ভীরুতা থেকে উদ্ধার করতে হবে।"

এ আদর্শ নিশ্চয়ই "ললিত লবঙ্গলতা নরমু সরম মেয়েলী" আদর্শ নয়।

যদিও তিনি প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শে গভীরভাবে বিশ্বাসী তথাপি তিনি জানতেন, সেই তপোবনের আদর্শ সম্পূর্ণভাবে বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার উপযোগী নয়। পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞান সাধনা, তাঁদের কর্মক্ষেত্রে মহৎ কীর্তিকে তিনি অশ্রদ্ধার চোখে দেখেন নি। বরং গোড়া থেকেই তিনি এই প্রাণবান্ সভ্যতার দুঃসাহসিক নানা পরীক্ষা এবং কর্মোদ্যমকে অনুকরণীয় বলে মনে করেছেন। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রধান ত্রুটি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত লোভ—জাতিগত ঔদ্ধত্য ও নির্লজ্জ ভোগবাদিতা। একে তিনি কখনও গ্রহণ করেন নি —কিন্তু তাদের সত্যানুসন্ধিৎসা, নিষ্ঠা, কর্মকুশলতা মহৎ ও অনুকরণীয় গুণ বলেই মনে করেছেন। তিনি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদর্শের সমন্বয় করতে চেয়েছেন তাঁর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে। 'A Poet's School' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন "I had intently wished that the introspective vision of the universal soul which an Eastern devotee realises in the solitude of his mind could be united with this spirit of its outward expression in service, the exercise of will unfolding the wealth of beauty and well-being from its shy obscurity to the light". তাই তিনি শান্তিনিকেতনে শিক্ষার মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ববিকাশের যে আদর্শটি কল্পনা করেছেন সেটি হচ্ছে "to be vitally active and mentally civilized."

দেশের যে প্রচলিত শিক্ষা তা জীবনের সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন। জীবনের সমস্যা সমাধানে এ আমাদের সাহায্য করছে না। এ শিক্ষা আমাদের জীবনের অঙ্গ

হয়ে উঠছে না, তাই এ আমাদের কোন বল দিচ্ছে না। তাই তিনি চেয়েছেন শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর ছাত্ররা এমন শিক্ষা পাবে যে জীবনে কোন নূতন অবস্থায়ই তারা নিজেদের অসহায় বোধ করবে না এবং যে সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান তারা শিখছে তা সরস, সজীব ও অর্থপূর্ণ হয়ে তাদের জীবনকে সমৃদ্ধতর করবে। বর্তমান অবাঞ্ছিত অবস্থার একটা মস্ত কারণ আমাদের শিক্ষার বাহন হচ্ছে বিদেশী ভাষা, তাই তিনি বহু প্রবন্ধে একথা আলোচনা করেছেন এবং তাঁর বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার মাধ্যমেই উচ্চতম শিক্ষা দেবারও ব্যবস্থা করেছেন। সর্বত্র তিনি সফল হন নি, বহু বাধা পেয়েছেন, কিন্তু এটা স্বীকার করতেই হবে—বিশেষ করে তাঁর চেষ্টার ফলেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলাভাষা পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী মর্যাদা পেয়েছে। শিক্ষাকে দেশের চিত্তে প্রবাহিত করবার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি বাঙলা ভাষায় জ্ঞানের পুস্তক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন এবং যারা ইংরেজি স্কুলে পড়বার সুযোগ পাবে না তারাও যাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় সেজন্যে বিভিন্ন জেলায় কেন্দ্রস্থাপন করে বাঙলা ভাষায় নানা পরীক্ষা গ্রহণ ও উপাধিদানের ব্যবস্থা করেছিলেন (লোক শিক্ষা সংসদ)। আমাদের দেশের শিক্ষার এই অস্বাভাবিক অবস্থা সম্বন্ধে দুঃখ করে 'শিক্ষার বিকিরণ' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "ইংরেজি খানার টেবিলে আহারের জটিল পদ্ধতি যার অভ্যস্ত নয় এমন বাঙালীর ছেলে বিলেতে পাড়ি দেবার পথে পি. এণ্ড. ও. কোম্পানীর ডিনার কামরায় যখন খেতে বসে তখন ভোজ্য ও রসনার মধ্যপথে কাঁটাছুরির দৌত্য তার পক্ষে বাধাগ্রস্ত বলেই ভরপুর ভোজের মাঝখানেও ক্ষুধিত জঠরের দাবি সম্পূর্ণ মিটতে চায় না। আমাদের শিক্ষার ভোজেও সেই দশা—আছে সবই, অথচ মাঝখানে অনেকখানি অপচয় হয়ে যায়। 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' ঘটে না বলেই শিক্ষা আমাদের পাথেয় না হয়ে, বোঝা হয়। এজন্যে শিক্ষাকে প্রাণময় ও সরস করবার জন্যে তাঁর চেষ্টার অবধি ছিল না। কি পদ্ধতি অবলম্বন করলে এ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে তা নিয়ে তিনি নিজেও যেমন নানা চিন্তা করেছেন, তাঁর সহকর্মী শিক্ষকদেরও নানা পরীক্ষার স্বাধীনতা দিয়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন।

বাস্তবিক পক্ষে তাঁর বিদ্যালয়ের কেন্দ্র ছিলেন শিক্ষক। তাঁদের চরিত্র, তাঁদের ব্যক্তিত্ব, তাঁদের বিদ্যার সাধনা দ্বারা তাঁরা ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করবেন। তাঁরা শুধু বেতনভুক্ কর্মচারী নন, তাঁরা সত্যিকারের শিক্ষাব্রতী গুরু। তাঁরা হবেন

ছাত্রদের শুভার্থী সুহৃদ, তাদের দুঃখ ও প্রলোভনের দিনে রক্ষক, তাদের আনন্দের সহচর, তাদের জীবনের জীবন্ত আদর্শ। তাঁরা হবেন অনলস, ধৈর্যশীল, শান্ত, শুভবুদ্ধিযুক্ত। শাসন ও ভীতির দ্বারা তাঁরা ছাত্রদের ভয়ের কারণ হবেন না—প্রীতি, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে তাঁরা ওদের উচ্চাসনে বসবার অধিকার লাভ করবেন। 'আশ্রমের শিক্ষা' (১৩৪৩ বাং) প্রবন্ধে লিখেছেন, "দেখেছি মনে মনে তপোবনের কেন্দ্রস্থলে গুরুকে। তিনি যন্ত্র নন, তিনি মানুষ, নিষ্ক্রিয়ভাবে মানুষ নন, সক্রিয়ভাবে, কেন না মনুষ্যত্বের লক্ষ্যসাধনেই তিনি প্রবৃত্ত। এই তপস্যার গতিমান ধারায় শিষ্যের চিত্তকে গতিশীল করে তোলা তাঁর আপন সাধনারই অঙ্গ। শিষ্যের জীবন প্রেরণা পায় তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ থেকে। নিত্যজাগরূক মানবচিত্তের এই সঙ্গ জিনিসটি আশ্রমের শিক্ষার সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান।" প্রচলিত বিদ্যালয়গুলিতে এটি ঘটে না বলেই শিক্ষাদান বহুল পরিমাণে নিরর্থক হয়ে যায়। 'শিক্ষাসমস্যা' প্রবন্ধে লিখেছেন, "আমরা যাঁহাকে ইস্কুলের শিক্ষক করি তাঁহাকে এমন করিয়া ব্যবহার করি যাহাতে তাঁহার হৃদয়মনের অতি অল্প অংশই কাজে খাটে। ফোনোগ্রাফ যন্ত্রের সঙ্গে একখানা বেত এবং কতকটা পরিমাণ মগজ জুড়িয়া ইস্কুলের শিক্ষক তৈরি করা যাইতে পারে। কিন্তু এই শিক্ষককেই যদি গুরুর আসনে বসাইয়া দাও, তবে স্বভাবতই তাঁহার হৃদয় মনের শক্তি সমগ্র ভাবে শিষ্যের দিকে ধাবিত হইবে। অবশ্য, তাঁহার যাহা সাধ্য তাহার চেয়ে বেশি তিনি দিতে পারিবেন না। কিন্তু তাহার চেয়ে কম দেওয়াও তাঁহার পক্ষে লজ্জাকর হইবে।" বহু বিদ্যালয়ে ছাত্রদের 'ডিসিপ্লিন' কথাটাতেই জোর দেওয়া হয়। এটা শিক্ষকেরা অনেক সময়ে ভুলে যান, বালক-বয়সে কিছুটা পরিমাণ চাঞ্চল্যই স্বাভাবিক। এটাকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। শুধু স্বীকার করা নয়, একে তিনি মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি চেয়েছেন ছেলেরা প্রাণবান ও দুঃসাহসী হোক্। কিছু উৎপাত তারা করবেই, কারণ যেখানে প্রাণ আছে সেখানেই চাঞ্চল্য। তাই তিনি 'শিক্ষাসংস্কার' প্রবন্ধে লিখেছেন—"ডিসিপ্লিনের যন্ত্রটাকে যে পরিমাণে পাক দিলে ছেলেরা সংযত হয়, তাহার চেয়ে পাক বাড়াইবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে—ইহাতে তাহাদিগকে নিঃস্বত্ব করা হইবে। ছেলেদের মধ্যে ছেলেমানুষের চাঞ্চল্য যে স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর, তাহা স্বদেশের সম্বন্ধে ইংরেজ ভালো করিয়াই বোঝে। তাহারা জানে এই চাঞ্চল্যকে দমন না করিয়া যদি নিয়মিত করিয়া পুষ্ট করা যায়, তবে ইহাই একদিন চরিত্র ও বুদ্ধির শক্তিরূপে

সঞ্চিত হইবে। এই চাঞ্চল্যকে একেবারে দলিত করাই কাপুরুষতা সৃষ্টির প্রধান উপায়। ছেলেদের যাহারা যথার্থ হিতৈষী তাহারা এই চাঞ্চল্যের মধ্যে প্রকৃতির মহৎ উদ্দেশ্য স্বীকার করে, তাহারা ইহাকে উপদ্রব বলিয়া গণ্য করে না। এইজন্য কালোচিত চাঞ্চল্যের নানাবিধ উৎপাতকে বিজ্ঞলোকেরা সস্নেহে রক্ষা করেন।"

আশ্রমের পরিধির মধ্যেই ছাত্রদের শিক্ষা সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষার প্রথম অবস্থায় তাদের সংসারের আবিলতা ও কোলাহল থেকে দূরে গুরুগৃহের শান্তনির্মল পরিবেশে স্থাপন-করা তিনি অবশ্য প্রয়োজন মনে করেছেন। "সংসার কাজের জায়গা ও নানা প্রবৃত্তির লীলাভূমি। সেখানে এমন অনুকূল অবস্থার সংঘটন হওয়া বড়ো কঠিন যাহাতে শিক্ষাকালে অক্ষুব্ধভাবে ছেলেরা শক্তিলাভ ও পরিপূর্ণ জীবনের মূলপত্তন করিতে পারে।" কিন্তু তাদের সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ রাখলে তাদের হৃদয় ও মনের প্রসার বাড়তে পারে না। তাই যেমন দেশবিদেশের কাহিনী তাদের শুনিয়েছেন, তেমনি ব্যবস্থা করেছেন—তাদের আশেপাশের গ্রামের লোকেদের সঙ্গে তারা মিশবে, তাদের জীবনযাত্রা ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে উৎসুক হবে, তাদের সুখদুঃখের সঙ্গে নিজেদের জড়িত করে তাদের সঙ্গে সেবা প্রীতি ও প্রাণের সম্বন্ধ স্থাপন করবে।

বিদ্যালয়ে যেমন নানা বিদ্যাচর্চা, খেলাধূলা, কর্মোদ্যম সচেতন ভাবে কাজ করবে তেমনি অচেতন ভাবে একটি শান্তি, উৎসাহ, শুভবুদ্ধি, প্রীতি, ক্ষমা ও আনন্দের পরিবেশও থাকা চাই। বাস্তবিক পক্ষে সেই সংজ্ঞাতীত পরিবেশের মধ্যেই আশ্রমবিদ্যালয়ের প্রাণকোরক নিহিত। তাই A Poet's School প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, "Children have their active sub-conscious mind which, like the tree, has the power to gather its food from the surrounding atmosphere. For them the atmosphere is a great deal more important than rules and methods, building appliances, class teaching and text books. The earth has her mass of substance in her land and water. But, if I may be allowed figurative language, she finds her inspiration of freedom, the stimulation of her life, from her atmosphere.......In his society man has the diffuse atmosphere of culture always about himself. It has the effect of keeping his mind sensitive to his racial inheritance, to the current of influences that come from tradition ; it makes it easy for him unconsciously to imbibe the concentrated wisdom

of ages..........I tried to create an atmosphere in my institution, giving it the principal place in our programme of teaching."

রবীন্দ্রনাথের চোখে বিদ্যার দান ও গ্রহণ শুধু স্বার্থের ব্যাপার নয়, এ সম্বন্ধ পারমার্থিক। তাই ধর্মবোধকে জাগ্রত রাখা এ শিক্ষার শেষ উদ্দেশ্য। তাই তিনি একনিষ্ঠ হয়ে এ ব্রত গ্রহণ ও পালনের জন্যে আহ্বান করেছেন ছাত্রদের। তিনি বলেছেন, "আজ থেকে তোমরা সত্যব্রত গ্রহণ করলে। মিথ্যাকে কায়মনোবাক্যে দূরে রাখবে।······আজ থেকে তোমাদের অভয়ব্রত। ধর্মকে ছাড়া জগতে তোমাদের ভয় করবার কিছু নেই।······আজ থেকে তোমাদের পুণ্যব্রত। যা কিছু অপবিত্র কলুষিত, যা কিছু প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ হয়, তা সর্বপ্রযত্নে প্রাণপণে শরীর মন থেকে দূর করে শিশিরসিক্ত ফুলের মতো পুণ্যে ধর্মে বিকশিত হয়ে থাকবে।······আজ থেকে তোমাদের মঙ্গলব্রত। যাতে পরস্পরের ভালো হয় তাই তোমাদের কর্তব্য······এক কথায় আজ থেকে তোমাদের ব্রহ্মব্রত······তিনিই তোমাদের একমাত্র ভয়, তিনিই তোমাদের একমাত্র অভয়।"

এই ধর্মচর্চা কি বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের, বিশেষ কোন জাতির? তা নয়। এ ধর্ম সর্বমানবের ধর্ম, বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবের সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলনের মন্ত্র। —তাই তিনি ছাত্রদের উপদেশ দিয়েছেন প্রত্যহ এই মহান মন্ত্র উচ্চারণের জন্য

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গ
দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।

রবীন্দ্রনাথ এ গায়ত্রী মন্ত্রের এ ভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন—"ওঁভূর্ভুবঃ স্বঃ —এই অংশ গায়ত্রীর ব্যাহৃতি নামে খ্যাত। চারিদিক হইতে আহরণ করিয়া আনার নাম ব্যাহৃতি। প্রথম ধ্যানকালে ভূলোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বজগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হইবে—তখনকার মতো মনে করিতে হইবে আমি সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়াছি···বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়া বিশ্বজগতের যিনি সৃষ্টিকর্তা তাঁহারই বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে এই ধারণাতীত বিপুল বিশ্বজগৎ এই মুহূর্তে এবং প্রতি মুহূর্তেই তাঁহা হইতে বিকীর্ণ হইতেছে।······কোন সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিব। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ—যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন সেই ধীসূত্রেই তাঁহাকে ধ্যান

করিব।......বিশ্বজগতের সবিতা আমাদের মধ্যে অহরহ যে ধীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন, যে শক্তি থাকার দরুণ আমি নিজেকে ও বাহিরের বিশ্বব্যাপারকে উপলব্ধি করিতেছি—সেই ধীশক্তি তাঁহারই শক্তি এবং সেই ধীশক্তি দ্বারাই তাঁহারই শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অন্তরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ রূপে অনুভব করিতে পারি......বাহিরের জগৎ এবং আমার অন্তরের ধী, এ দুইই একই শক্তির বিকাশ—ইহা জানিলে জগতের সহিত আমার চেতনায় এবং আমার চেতনার সহিত সেই সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করিয়া সংকীর্ণতা হইতে, ভয় হইতে, বিষাদ হইতে মুক্তিলাভ করি।" পাঠারম্ভের পূর্বে শিক্ষক ও ছাত্রের সম্মিলিত প্রার্থনা হবে

সহ বীর্যং করবাবহৈ।
আমরা উভয়ে মিলিত হইয়া যেন বীর্য প্রকাশ করি।
তেজস্বিনাবধীতমস্তু।
তেজস্বীভাবে আমাদের অধ্যয়ন অধ্যাপনা হউক।
মা বিদ্বিষাবহৈ।
আমরা পরস্পরের প্রতি যেন বিদ্বেষ না করি।
ভদ্রন্নো অপি বাতয়ঃ মনঃ।
হে দেব, আমাদের মনকে মঙ্গলের প্রতি সবেগে প্রেরণ করো।

এ বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ও শিক্ষারীতি কি, তার পরিচয় হয়তো স্পষ্টতর হবে যদি তাঁর রচিত "শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আদর্শ ও শিক্ষা-প্রণালী"র আলোচনা হতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করি।

১। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রধান লক্ষ্য এই যে এখানে ছাত্রেরা বিদ্যাশিক্ষাকে তাদের অখণ্ড প্রাণপ্রকৃতির ও মনঃপ্রকৃতির বিচিত্রলীলার অঙ্গ-রূপেই গ্রহণ করতে পারে।

২। এই আদর্শকে যদি মানি তবে প্রথম দরকার বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে এখানকার শিশুদের আন্তরিক যোগসাধন। লোকালয়ের কৃত্রিম জীবনযাত্রায় এই যোগ বিচ্ছিন্ন ও বিকৃত হয়।

৩। এই আশ্রমে গাছপালা পশুপাখি যা কিছু আছে ছাত্রেরা তাদের সম্পূর্ণভাবে জানবে এটি খুবই দরকার। আমাদের অধ্যাপনায় পুঁথিগত বিদ্যার পরেই আমাদের একান্ত সতর্কতা, কিন্তু কত বিদ্যা আমাদের চোখের কাছে,

কানের কাছে, হাতের কাছে আমাদের মনোযোগের প্রতি অপেক্ষা ক'রে প্রত্যহই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। তা'তে করে শুধু একটা দেশজোড়া চিত্তদৈন্য ঘটছে তা নয়, দেশের প্রতি আমাদের অনুরাগের সম্পূর্ণতাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ……নিজের পর্যবেক্ষণের দ্বারা যাতে ছেলেরা তা জানে তার উৎসাহ দেওয়া ও ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক।…এর মধ্যে শক্ত হবে, যিনি পরিচয় সাধনে সহায়তা করবেন এমন একজন সুদক্ষ উৎসাহী চোখ-কান-খোলা মানুষ পাওয়া।

৪। শিক্ষার যেমন জানার দিক আছে তেমনি আবার কাজের দিকও আছে। আশ্রমের গাছপালা পশুপক্ষীকে সেবা করাও একটা বড়ো সাধনা।

৫। প্রকৃতির সঙ্গে যোগের কথা হল, তেমনি লোকালয়ের সঙ্গে যোগও চাই। ভুবনডাঙ্গাগ্রাম ও সাঁওতাল পাড়াগুলির সম্যক পরিচয় যাতে ছেলেরা পায় সেদিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। তাদের সঙ্গে আমাদের ছাত্রদের যোগে সেবার সম্বন্ধ রাখা আবশ্যক।

আশ্রমে ব্রতীবালক সম্প্রদায় গড়া হয়েছে। নিকটবর্তী পাড়ায় ব্রতী সম্প্রদায় স্থাপন ক'রে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে চারদিকের পাড়ার কাজ আমাদের ভালো ক'রে চালাতে হবে।……আশ্রমের মধ্যে যেখানে কোন জঙ্গল বা গর্ত ডোবা আছে, যেখানেই চলাচলের রাস্তা ভেঙেচুরে গেছে, যেখানেই কোথাও জল জমে মশার, ও ময়লা জমে মাছির উৎপত্তির কারণ হয়েছে, সেখানেই সংস্কারকার্যে ব্রতীরা যেন মনোযোগ করে। ছেলেদের শোবার ঘরের মেঝে ও তাদের বিছানাপত্র মাঝে মাঝে কার্বলিক প্রভৃতি নৈরাময়িক পদার্থ দ্বারা বিশেষ বিশেষ দিনে ভালো ক'রে ধুইয়ে দেওয়াও তাদের কাজ।

৬। ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের সম্বন্ধ কেবল শিক্ষাদানের সম্বন্ধ হলে চলবে না, যথার্থ আত্মীয়তার সম্বন্ধ হওয়া চাই। ………গুরুপল্লীর সঙ্গে ছাত্রনিবাসের স্নেহসেবার সম্বন্ধ নানা উপায়ে নানা উপলক্ষ্যে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে। আমাদের প্রত্যেক ছাত্রনিবাস এক একটি গুরুপরিবারের সঙ্গে সংলগ্ন হওয়া যদি অবাধে হওয়া সম্ভবপর হতে পারত তবে সেইটিই সবচেয়ে ভালো হ'ত।

৭। আর একটি গুরুতর শিক্ষার বিষয় আছে, সেটি হচ্ছে লোকব্যবহার। মানুষ সামাজিক জীব, এইজন্যে যেমন তার সামাজিক নীতি আছে, তেমনি সামাজিক রীতিও আছে। সেই রীতি পালনের দ্বারা মানুষের পরস্পরের সম্পর্ক সুন্দর ও সুসহ হয়।

…আজকাল শিক্ষাঘটিত ও অর্থঘটিত পরিবর্তনে গ্রাম্য জীবনের সংস্থাগুলি অনেক নষ্ট এবং অনেক শিথিল হয়ে গেছে। সুতরাং সে সমাজের রীতিও নেই, আর সাধারণভাবে পৃথিবীর দূর নিকট সকল মানুষের সঙ্গে আমাদের কী রকম ব্যবহার করা শোভন তারও কোন রীতি আমাদের অভ্যস্ত হয়নি। এমনতরো রীতিরিক্ততার মতো কুশ্রী আর কিছুতেই হতে পারে না। নিজের ব্যবহারের এই রকম রূঢ়তা যে আমাদের নিজের পক্ষেই অপমানজনক তাও আমরা বুঝতে পারিনে।

…মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ স্বীকারের প্রথম সাধারণ উপায় হচ্ছে অভিবাদন ও নমস্কার। এ সম্বন্ধে আমাদের ছাত্রদের মধ্যে ভদ্র অভ্যাস পাকা করিয়ে দেওয়া চাই।

ছাত্রেরা আপন পরিবারের বাইরে গুরুজনকে পাদ গ্রহণ করবে এটা আমি পালনীয় মনে করিনে। কিন্তু নত হয়ে নমস্কার করা তাদের কর্তব্য। আর তাঁরা সম্মুখে এলে উঠে দাঁড়ানো চাই। যেখানে অনেকে সমবেত, সেখানে সকলে মিলে একসঙ্গে নমস্কার করাই শোভন।……গুরুপত্নীদের সম্বন্ধেও এই নিয়ম।

বাহিরের অতিথিরা দর্শক রূপে ক্লাসে উপস্থিত হলে ছাত্রেরা সমবেতভাবে তাঁদের নমস্কার করবে। দিনের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎকালে ছাত্রেরা পরস্পরকে নমস্কার করবে।

৮। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে যে-সব ছাত্র আসে বাঙালী ছাত্রদের জানা উচিত যে তারা বিশেষভাবে তাদেরই অতিথি। সকল বিষয়ে তাদের আনুকূল্য করা বাঙালী ছাত্রদেরই কর্তব্য।

৯। সকল কাজে সময় পালন করাও এই রীতিপালনের অঙ্গ। ক্লাসে, সভায়, উপাসনাগৃহে বা ভোজনশালায় যথাসময়ে উপস্থিত না হওয়া অন্যদের অসম্মান, একথা মনে রাখা কর্তব্য।

১০। মন্দিরে ক্লাসে বা সভায় অপরিচ্ছন্ন হয়ে যাওয়াও অভদ্রতা। ভারতবর্ষে এ সম্বন্ধে মুসলমানদের আচার ভদ্র আচার।

কিছুকাল পূর্বে ছেলেরা পালা ক'রে পরিবেশন করত, এখন সে নিয়ম আছে কিনা জানিনে, কিন্তু থাকা উচিত।

১১। বাস সম্বন্ধেও ভদ্রতার রীতি আছে। ঘর ও ঘরের আসবাব ও নিজের ব্যবহার্য সামগ্রী নোংরা ও কদর্য হতে দেওয়া অভদ্রোচিত…

১২। বিদ্যালয়ের নানা প্রকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাদের নিজের ইচ্ছাচালনার

বহুবিধ উপায় থাকা চাই। এতে তাদের সেই আত্মকর্তৃত্বের চর্চা হয়, যে কর্তৃত্ব দায়িত্ববোধের দ্বারা পদে পদে নিয়ন্ত্রিত।”

ছাত্রদের শিক্ষা প্রণালী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

১। মানুষের শারীরিক ও মানসিক সকলপ্রকার শক্তির মধ্যে একটি অখণ্ড যোগ আছে। পরস্পরের সহযোগিতায় তারা বললাভ করে।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের প্রচলিত শিক্ষার প্রথায় আমরা সাধারণতঃ পুঁথিগত কয়েকটি বিষয় বাছাই করে নিয়ে আর সমস্তকে অস্বীকার করি।...আমাদের দেশে স্কুল কলেজের বাহিরে ছাত্রদের অন্য শিক্ষার ক্ষেত্র নেই বললেই হয়। তাই নোট-নেওয়া মুখস্থ-করা বিদ্যায় তাদের মন যে পরিমাণ বস্তু পায় সে পরিমাণ খাদ্য পায় না।

দেহের শিক্ষা যদি সঙ্গে সঙ্গে না চলে তাহলে মনের শিক্ষার প্রবাহ বেগ পায় না। ......দেহের চর্চা বলতে আমি ব্যায়াম বা খেলার চর্চা বলছিনে।—দেহের দ্বারা আমরা যে সব কাজ করতে পারি সেই সব কাজের চর্চা—সেই চর্চাতে দেহ সুশিক্ষিত হয়, তার জড়তা দূর হয়।

আমাদের আশ্রমে প্রত্যেক ছাত্রকেই বিশেষ ভাবে কোনো কোনো হাতের কাজে যথাসম্ভব সুদক্ষ করে দেওয়া চাই। হাতের কাজ শিক্ষাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। আসল কথা, এই রকম দৈহিক কৃতিত্ব চর্চায় মনও সজীব সতেজ হয়ে ওঠে।......যার দেহ শিক্ষিত হয়নি সে যতো বড়ো পণ্ডিতই হোক সংসারক্ষেত্রে অধিকাংশ বিষয়েই তাকে পরাসক্ত হয়ে জীবন ধারণ করতে হয়—সে অসম্পূর্ণ মানুষ। এই অসম্পূর্ণতা থেকে আমাদের প্রত্যেক ছাত্রকেই বাঁচাতে হবে।

দেহের শিক্ষার সঙ্গে মনের শিক্ষার, দেহের সচলতার সঙ্গে মনের সচলতার যোগ আছে এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।...এই কারণেই আমি মনে করি পথচারী বিদ্যালয়ই বিদ্যালয়ের আদর্শ। ইস্কুলের বদ্ধ ঘরে শিক্ষা দিলে আমাদের জীবন-লীলার অধিকাংশ উদ্যমই সেই শিক্ষাপ্রণালী থেকে বাদ পড়ে। তেমন খাঁচার পাখিকে বুলি শেখানো অসম্ভব হয় না, কিন্তু তাকে উড়তে শেখানো যায় না।

ভ্রমণ করতে করতে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়াই শিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়। তার কারণ কেবলমাত্র এ-নয় যে, ভ্রমণে নানা বিষয় পর্যবেক্ষণের দ্বারা আয়ত্ত হয়। তার কারণ এই যে, নিত্যই নূতনের সংযোগে এবং অন্তর ও বাহির উভয়ের সম্মিলিত পদক্ষেপে আমাদের জাগরূক চিত্তবৃত্তি সর্বদাই উৎসুক হয়ে থাকে।”

১৩০৯ সালে কুঞ্জ ঘোষ মহাশয়কে আশ্রমের আদর্শ ও পরিচালনা সম্পর্কে অধ্যাপক ও ছাত্রদের কর্তব্য সম্বন্ধে যে দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন তার থেকেও কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি……তাতেও আশ্রমের রীতি কি হওয়া উচিত সে আলোচনা তিনি বিস্তারিত করেছেন। আশ্রমের খুঁটিনাটি বিষয়েও তাঁর কতটা দৃষ্টি ছিল এতে বোঝা যাবে।

"আমি আশা করিয়া আছি, যে অধ্যাপকগণ আমার অনুশাসনে নহে, অন্তরস্থ কল্যাণবীজের সহজ বিকাশে ক্রমশই আগ্রহের সহিত ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সঙ্গে নিজের জীবনকে একীভূত করিতে পারিবেন। তাঁহারা প্রত্যহ যেমন ছাত্রদের সেবা ও প্রণাম গ্রহণ করিবেন তেমনি আত্মত্যাগ ও আত্মসংযমের দ্বারা ছাত্রদের নিকট আপনাদিগকে প্রকৃত ভক্তির পাত্র করিয়া তুলিবেন। পক্ষপাত, অবিচার, অধৈর্য, অল্প কারণে অকস্মাৎ রোষ, অভিমান, অপ্রসন্নতা, ছাত্র ও ভৃত্যদের সম্বন্ধে চপলতা, লঘুচিত্ততা, ছোটোখাটো অভ্যাস দোষ, এ সমস্ত প্রতিদিনের প্রাণপণ যত্নে পরিহার করিতে থাকিবেন। নিজেরা ত্যাগ ও সংযম অভ্যাস না করিলে ছাত্রদের নিকট তাঁহাদের সমস্ত উপদেশ নিষ্ফল হইবে এবং ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উজ্জ্বলতা ম্লান হইয়া যাইতে থাকিবে। ছাত্রেরা বাহিরে ভক্তি ও মনে মনে উপেক্ষা করিতে যেন না শেখে।

…অধ্যাপকের প্রতি ছাত্রদের নির্বিচারে ভক্তি থাকা চাই। তাঁহারা অন্যায় করিলেও তাহা বিনা বিদ্রোহে সহ্য করিতে হইবে। কোনো মতে তাঁহাদের সমালোচনা বা নিন্দায় যোগ দিতে পারিবে না। অধ্যাপকেরা যদি কখনো পরস্পরের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন তবে সে সময়ে কোন ছাত্র সেখানে উপস্থিত না থাকে তৎপ্রতি যত্নবান হইতে হইবে। কোন অধ্যাপক ছাত্রদের সমক্ষে অন্য অধ্যাপকদের প্রতি অবজ্ঞাজনক ব্যবহার, অসহিষ্ণুতা বা রোষ প্রকাশ না করেন, সেদিকে সকলের মনোযোগ থাকা কর্তব্য।" কিন্তু নিয়মকেই তিনি কখনও বড়ো করে তোলেন নি। এ বিদ্যালয়ে তিনি সকলের চেয়ে দাম দিয়েছেন স্বাভাবিক শুভবুদ্ধির ও আন্তরিক নিষ্ঠার। তিনি উল্লিখিত চিঠিতে লিখেছিলেন, "প্রধানতঃ নিয়মের সাহায্যেই বিদ্যালয় চালনার প্রতি আমার বিশেষ আস্থা নাই। কারণ, শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়টি পড়া গিলাইবার কল মাত্র নহে। স্বতঃ-উৎসারিত মঙ্গল ইচ্ছার সহায়তা ব্যতীত ইহার উদ্দেশ্য সফল হইবে না।"

শিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষা—বিশ্বভারতী

রবীন্দ্রনাথ যেদিন গুটি পাঁচ ছয় ছেলে নিয়ে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম সুরু করেছিলেন, সেদিন সেটি নিতান্তই ক্ষুদ্র ব্যাপার ছিল। আজ ক্রমে ক্রমে এর বিকাশ এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানকে রূপান্তরিত করেছে পৃথিবীর একটি উল্লেখযোগ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে। কবির অন্তরে এর সম্পূর্ণ রূপটি সেদিন ফুটে উঠেছিল তা নয়। তাঁর কাব্যপ্রতিভার যেমন ক্রমবিকাশ ঘটেছে, তাঁর চিন্তার যেমন পরিপুষ্টি ঘটেছে, সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানটিরও ক্রমবিকাশ ও পরিণতি ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের মত সৃজনশীল সদাজীবন্ত কবিপ্রতিভা পৃথিবীর ইতিহাসেও বিরল। আর এই শান্তিনিকেতন সেই জাগ্রত প্রতিভার একটি অবিচ্ছিন্ন প্রকাশ। এই আশ্রম তাঁর সাধনা ও নিষ্ঠার ফল। এই আশ্রম ছিল তাঁর প্রাণ। ফুলের দরদী মালী যেমন পরম যত্নের সঙ্গে ফুলের গাছকে জল-সিঞ্চন করে প্রতিটি গাছের বেড়ে ওঠার প্রতিটি স্তর মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করে, তেমনি যত্নে এ আশ্রমকে তিনি ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও তাঁর আদর্শ ও পরীক্ষায় বিশ্বাসী শিক্ষক ও সহকর্মীরা এই আশ্রমকে তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন। এর বিকাশ তাই বাইরের পরিকল্পনা বা প্ল্যানিং-এর ফল নয়—জীবন্ত গাছের মতই এ নিজের স্বাভাবিক নিয়মে গড়ে উঠেছে। এর সূচনা থেকে এই পরীক্ষায় তাঁর অটুট আস্থা ছিল,—তাই এর বিকাশের মধ্যে দিয়ে তিনি নিজেকেই সত্য করে পেয়েছিলেন। ১৩৪৫ সনের ৮ই পৌষ উৎসবে তিনি বলেছিলেন, "বস্তুত সাধনা করার আগ্রহ আমাকে পেয়ে বসেছিল, আমার নিজেরই জন্যে। নিজেকে দিয়ে ফেলার দ্বারা নিজেকে পাওয়ার লোভ আমাকে দখল করেছিল।…ঐ কটি ছোট ছেলে আমার সমস্ত সময় নিলে, অর্থ নিলে, সামর্থ্য নিলে—এইটেই আমার সার্থকতা। এই যে সাধনার সুযোগ ঘটল, এতে করে আমি আপনাকেই পেতে লাগলুম। এই আত্মবিকাশ, এ কেবল সাধনার ফলে, বৃহৎ মানব-জীবনের সংগ্রাম-ক্ষেত্রে।" যদিও বিশ্বভারতীর সম্পূর্ণ রূপ এই শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় তাঁর মনে স্পষ্ট ভাবে ছিল না, তথাপি তাঁর পরীক্ষাটি যে বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ, এ দৃঢ় প্রত্যয় তাঁর ছিল। এই আশ্রমের একটি সমগ্রমূর্তি তাঁর ধ্যানে রূপ নিয়েছিল—তিনি জেনেছিলেন তাঁর এ আশ্রম ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক একটি খেয়াল মাত্র নয়। পূর্বোল্লিখিত কুঞ্জলাল ঘোষ

মহাশয়ের কাছে লিখিত পত্রে (১৩০৯) তিনি লিখেছিলেন, "আমার মনের মধ্যে একটি ভাবের সম্পূর্ণতা জাগিতেছে বলিয়া অনুষ্ঠিত ব্যাপারের সমস্ত ত্রুটি, দৈন্য, অপূর্ণতা অতিক্রম করিয়াও আমি সমগ্র ভাবে আমার আদর্শকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই—বর্তমানের মধ্যে ভবিষ্যৎকে, বীজের মধ্যে বৃক্ষকে উপলব্ধি করিতে পারি—সেইজন্য সমস্ত দীনতা সত্বেও, ভাবের তুলনায় কর্মের যথেষ্ট অসংগতি থাকিলেও আমার উৎসাহ ও আশা ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে না।"

তপোবনের যে আদর্শ তাঁকে এ আশ্রম স্থাপনে উৎসাহী করেছিল, সে আদর্শে তাঁর বিশ্বাস অটুট ছিল। তবে এ আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য যে আচার বা রীতি প্রয়োজন তা কখনো কখনো পরিবর্তিত বা পরিত্যক্তও হয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে তার প্রসারও ঘটেছে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাঁর মূল ধারণার সঙ্গে তার অসংগতি নেই। যেমন বলা যেতে পারে প্রথম দিকে হিন্দু আচার ইত্যাদি পালনের দিকে যতটা জোর দেওয়া হত, তা অনেক ক্ষেত্রে ক্রমশঃ শিথিল করা হয়েছিল, বা পরিত্যক্ত হয়েছিল। তাঁর সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আমরা দেখি প্রথম যুগে প্রাচীন ভারতবর্ষের সাহিত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল, কিন্তু ক্রমশঃ বিশ্বমানবতার আদর্শ তাঁর কাছে গভীরতর সত্য বলে প্রতীয়মান হ'ল। শান্তিনিকেতন আশ্রমের বিকাশের ইতিহাসেও এই ধারণার প্রসার আমরা লক্ষ্য করে থাকি। যখন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তখন প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠ যোগের কথাটাই কবির মনে প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দেশের রাজনৈতিক সংঘর্ষ ইত্যাদি তাঁর মনকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিলে। মানুষের সঙ্গে মানুষের কৃত্রিম বিভেদ যে কী ভীষণ সর্বনাশা রূপ নিচ্ছে, এ অনুভব করে তিনি ব্যাকুল হয়েছিলেন। 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' এবং তার 'নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব' তাঁর মনকে ব্যথিত করে তুলল। তিনি অনুভব করতে লাগলেন—মানুষকে প্রকৃতির সাথে শুধু মেলাতে হবে না, মানুষকে মানুষের সাথে মেলাতে হবে, তা নইলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ, অসার্থক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ইয়োরোপ ভ্রমণে গিয়ে যখন তিনি ভারতবর্ষের প্রেম ও শান্তির বাণী দুঃখক্লিষ্ট ইয়োরোপেও শোনালেন তখন তিনি দেখলেন বর্ণের বিভেদ, রাজনৈতিক বিভেদ, সমস্ত ব্যবধান সত্বেও মানুষ মানুষকে ভালবাসতে চায়, মানুষ মানুষের সাথে মিলতে চায়। তাঁর কাব্যানুভূতিতে বিশ্ববোধ বহু পূর্বেই সূচিত হয়েছিল—ইয়োরোপ ভ্রমণের পর এবং 'গীতাঞ্জলি'র কবি হিসাবে সাহিত্যের

শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'নোবেল প্রাইজ' পাওয়ার পর এই বিশ্ববোধকে একটি সার্থক রূপ দেওয়ার কথা তাঁর মনকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করতে লাগল। তিনি কল্পনা করতে লাগলেন এমন একটি সংস্কৃতি ও শিক্ষার কেন্দ্র যেখানে বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন সভ্যতার মানুষ একত্র হবে প্রীতি ও শ্রদ্ধার বন্ধনে—'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে।' এই আকাঙ্ক্ষার পরিণতি 'বিশ্বভারতী' স্থাপন (৭ই পৌষ ১৩২৮)। ১৩৩০ সালের পৌষ উৎসব উপলক্ষে তিনি বলেছিলেন, "প্রথমে আমি শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করে এই উদ্দেশ্যে ছেলেদের এখানে এনেছিলুম যে, বিশ্বপ্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে আমি এদের মুক্তি দেব। কিন্তু ক্রমশঃ আমার মনে হয় যে, মানুষে মানুষে যে ভীষণ ব্যবধান আছে তাকে অপসারিত করে মানুষকে সর্বমানবের বিরাট লোকে মুক্তি দিতে হবে। আমার বিদ্যালয়ের পরিণতির ইতিহাসের সঙ্গে সেই আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাটি অভিব্যক্ত হয়েছিল। কারণ বিশ্বভারতী নামে যে প্রতিষ্ঠান তা এই আহ্বান নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল যে, মানুষকে শুধু প্রকৃতির ক্ষেত্রে নয় কিন্তু মানুষের মধ্যে মুক্তি দিতে হবে। জ্ঞানের তপস্যায় ও শিল্পসৃষ্টির আনন্দ-লোকে পূর্ব ও পশ্চিম, সমস্ত বিশ্বজগৎ একটি প্রাণময় মিলনকেন্দ্রে একত্র হবে এ আশা নিয়েই বিশ্বভারতী সৃষ্টি হয়েছিল। তাই তার মূল মন্ত্র হচ্ছে 'যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেকনীড়ম্'।"

আমাদের দেশ অপরের কাছ থেকে কিছুই নেবে না, সবই আমাদের ছিল, এ অন্ধতাও যেমন আমাদের অগ্রগমনের পথে বাধা, তেমনি আমাদের কিছুই নেই, সবই আমাদের পশ্চিমের কাছ থেকে ধার করে নিতে হবে, এমন মানসিক ক্লৈব্যও আমাদের পঙ্গু করে রেখেছে। তিনি একথা গভীরভাবে বিশ্বাস করেছেন যে প্রত্যেক জাতির নিজস্ব কিছু দেবার আছে, নিজস্ব প্রতিভা আছে। বিশ্বের সভ্যতার দরবারে প্রত্যেক জাতিকে তাই নিজস্ব শ্রেষ্ঠ সম্পদ দান করতে হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে কৌতূহলী ও জিজ্ঞাসু মন নিয়ে বিশ্বের অন্যান্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ দানকেও গ্রহণ করতে হবে এবং আপনার করে নিতে হবে। তিনি আমাদের নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পিছনে এই মোহ ও ভীরুতা দেখে দুঃখ বোধ করেছেন। তিনি একটি রচনায় লিখেছেন (১৩৬২), "আমাদের দেশে দুই রকমের ভীরুতা দেখা যায়। কাহারও ভীরুতা দেশী প্রকৃতিকে রক্ষা করিতে, কারও ভীরুতা য়ুরোপীয় শিক্ষা গ্রহণ করিতে। যাঁহারা এই দুই ভীরুতাকেই অতিক্রম করিয়াছেন তাঁহারাই ভারতবর্ষকে বাঁচাইবেন।"

"যখন মৈসুরের নূতন বিশ্ববিদ্যালয় দেখিলাম সেটা এতই বেসুরা বোধ হইল। ইহার মধ্যে আমাদের আপন কিছুই নাই, ইহা একেবারেই নকল। ইহাতেই বুঝিলাম, বিদ্যাসম্বন্ধে ভারতবর্ষ আপন সাহস একেবারেই হারাইয়া ফেলিয়াছে। যে বিদ্যালয়কে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া থাকি তাহার মধ্যে ভারতবর্ষকে বড়ো জায়গা দিতে আমরা কুণ্ঠিত। যেন বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে য়ুরোপের বাহিরে বিশ্বই নাই। যেন বিশ্বের মধ্যে ভারতবর্ষ বলিয়া পদার্থের অস্তিত্বই মেলে না, অথবা অণুবীক্ষণের সাহায্যে ধূলিকণার মধ্যে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায়।"

১৩২৮ সালের ২০শে ফাল্গুন উপদেশ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "চিরন্তন সত্যের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের ভেদ নেই। এই বিশ্বভারতীতে সেই সত্যসাধনার ক্ষেত্রকে আমার গড়ে তুলতে হবে। পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের দেওয়া-নেওয়ার সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া দরকার। আমরা এতদিন কেবলই পশ্চিমের কাছে হাত পেতে পাঠ শিখে নিয়েছি। কিন্তু পশ্চিমের সঙ্গে আমাদের আদান-প্রদানের সম্বন্ধ হয় নি। সাহসপূর্বক য়ুরোপকে আমি আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রে আমন্ত্রণ করে এসেছি। এখানে এইরূপে সত্যসম্মিলন হবে, জ্ঞানের তীর্থ-ক্ষেত্র গড়ে উঠবে। আমরা রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে খুব মৌখিক বড়াই করে থাকি, কিন্তু অন্তরে আমাদের আত্মবিশ্বাস নেই, যথেষ্ট দীনতা আছে। যেখানে মনের ঐশ্বর্যের প্রকৃত প্রাচুর্য আছে, সেখানে কার্পণ্য সম্ভবপর হয় না। আপন সম্পদের প্রতি যে জাতির যথার্থ আশা ও বিশ্বাস আছে, অন্যকে বিতরণ করতে তার সঙ্কোচ হয় না, সে পরকে ডেকে বিলোতে চায়। আমাদের দেশে তাই গুরুর কণ্ঠে এই আহ্বান-বাণী এক সময় ঘোষিত হয়েছিল 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা'।"

১৩২৮ সালের ৮ই পৌষ, বিশ্বভারতীর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠাদিবসে বিশ্বভারতীর মর্মের কথাটি তিনি প্রকাশ করেছিলেন, "...প্রথমে যে শিক্ষার আয়তনকে মনে করেছিলাম দেশের প্রয়োজনের মধ্যেই অবরুদ্ধ থাকবে, ক্রমে তা বৃহৎ আকাশে মুক্তিলাভের চেষ্টা করতে লাগল। যে অনুষ্ঠান সত্য তার উপর দাবি সমস্ত বিশ্বের।...এবার পশ্চিমে গিয়ে দেখেছি যে, পূর্বমহাদেশ কী সম্পদ্ দিতে পারে, তা সকলে জানতে চাচ্ছে। আজ মানুষকে বেদনা পেতে হয়েছে। সে পুরাকালে যে আশ্রয়কে নির্মাণ করেছিল তার ভিত্তি বিদীর্ণ হয়ে গেছে। তাতে করে মানুষের মনে হয়েছে, এ আশ্রয় তার অভাবকে পূর্ণ করবার উপযোগী নয়। পশ্চিমের

মনীষীরাও এ কথা বুঝতে পেরেছেন, এবং মানুষের সাধনা কোন পথে গেলে সে অভাব পূর্ণ হবে তাঁদের তা উপলব্ধি করবার ইচ্ছা হয়েছে।

কোন জাতি যদি স্বাজাত্যের ঔদ্ধত্যবশত আপন ধর্ম ও সম্পদকে একান্ত আপন বলে মনে করে তবে সেই অহংকারের প্রাচীর দিয়ে সে তার সত্য-সম্পদকে বেষ্টন করে রাখতে পারবে না। যদি সে তার অহংকারের দ্বারা সত্যকে কেবলমাত্র স্বকীয় করতে যায় তবে তার সে সত্য বিনষ্ট হয়ে যাবে। আজ পৃথিবীর সর্বত্র এই বিশ্ববোধ উদ্বুদ্ধ হতে যাচ্ছে। ভারতবর্ষে কি এই যুগের সাধনা স্থান পাবে না?……স্বজাতির অচল সীমানার মধ্যে আপনাকে সংকীর্ণভাবে উপলব্ধি করাই কি সবচেয়ে বড়ো গৌরব?

এই বিশ্বভারতী ভারতবর্ষের জিনিস হলেও একে সমস্ত মানবের ক্ষেত্র করতে হবে। কিন্তু আমাদের দেবার কী আছে? কল্যাণরূপী শিব তাঁর ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরিয়েছেন। সে ঝুলিতে কে কী দান করবে? আমাদের কি তাঁকে কিছু দেবার নাই? হাঁ, আমার দেবার আছে, এই কথা ভেবেই কাজ করতে হবে। এই জন্যেই ভারতের ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।" আর এক-জায়গায় লিখেছেন, "Visva-Bharati represents India where she has her wealth of mind which is for all. Visva-Bharati acknowledges India's obligation to offer to others the hospitality of her best culture and India's right to accept from others their best."

কিন্তু পরকে দিতে গেলে নিজেকে জানা চাই। ভারতের মহামানবের সাগরে যে অসংখ্য চিন্তার স্রোতোধারা এসে মিশেছে তার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সামান্য। দেশের নানা ধর্ম, নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে ভারতীয় চিন্তার নিজস্ব সম্পদ ছড়িয়ে আছে, তাদের আহরণ পরিশ্রমসাপেক্ষ। সে কাজের জন্যে যে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রয়োজন তার কেন্দ্র হতে হবে বিশ্বভারতীকে। শুধু সংগ্রহ নয়—সমন্বয়। এই বিভিন্ন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিপরীত ভাবধারার মধ্যে যে ঐক্যের সূত্র আছে—তাকে আবিষ্কার করাও এই আত্মজ্ঞানের একটি প্রধান অঙ্গ। সে কাজও হবে বিশ্বভারতীর শিক্ষক ও ছাত্রদের। বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ সম্বন্ধে ১৩২৬ সালের বৈশাখে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, "ভারতবর্ষ যখন নিজের শক্তিতে মনন করিয়াছে তখন মনের ঐক্য ছিল—এখন সেই মন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে। এখন তাহার মনের বড়ো বড়ো শাখাগুলি একটি কাণ্ডের মধ্যে

নিজেদের বৃহৎ যোগ অনুভব করিতে ভুলিয়া গেছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এক চেতনাসূত্রের বিচ্ছেদই সমস্ত দেহের পক্ষে সাংঘাতিক। সেইরূপ, ভারতবর্ষের যে মন আজ হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, মুসলমান, খ্রীষ্টানদের মধ্যে বিভক্ত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া আছে সে মন আপনার করিয়া কিছু গ্রহণ করিতে বা আপনার করিয়া কিছু দান করিতে পারিতেছে না। দশ আঙুলকে যুক্ত করিয়া অঞ্জলি বাঁধিতে হয়—নেবার বেলাও তাহার প্রয়োজন, দেবার বেলাও। অতএব ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্তসম্পদকে সংগৃহীত করিতে হইবে, এই নানা ধারা দিয়া ভারতবর্ষের মন কেমন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তাহা জানিতে হইবে। এইরূপ উপায়েই ভারতবর্ষ আপনার নানা বিভাগের মধ্য দিয়া আপনার সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে পারিবে।" বিশ্বভারতীর একটি পরিচয়পত্রে বিশ্বভারতীর সর্বোচ্চ শিক্ষাকেন্দ্রের (বিদ্যাভবন) উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "Rabindranath conceived in the Visva-Bharati the idea of a seat of learning with a three-fold objective, each merging with the other and forming one comprehensive whole. His University was, first of all, to be an Indian University helping us to realise the oneness of Indian cultures and traditions. In the second place it was to be an Eastern University, the union at one centre of the cultures of the East. And finally it was to be a World University, a meeting place of the East and the West......Rabindranath's conception of Indological studies includes the extention of our knowledge of the Vedic, Puranic, Buddhist, Jain, Zoroastrian and Islamic cultures ......Another line of study...was that of the contribution of the major languages and literatures of India. So far (1950), Bengali, Hindi, Urdu and Oriya have been represented in the Visva-Bharati. Possibilities of extension in other language fields, notably in Tamil, are at present being explored."

এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে হিন্দীভবন (১৯৩৯) ও চীনভবন (১৯৩৭) স্থাপিত হয়। এ জন্য যে অর্থ ও নানা উপকরণ প্রয়োজন, তা অধিকাংশ চীন, তিব্বত ও বাঙলার বাইরের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সংগৃহীত হয়। বাঙলাদেশ থেকে সাহায্য তিনি সামান্যই পেয়েছেন। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার আগেও তাঁর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় বিদেশের মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব ও

আদর্শে অনুরক্ত হয়ে দু'জন মহাপ্রাণ ইংরাজ এ বিদ্যালয়ে শিক্ষক হয়ে এসেছিলেন—তাঁদের নাম পিয়ার্সন ও সি. এফ. এণ্ড্রুজ। ভারতবর্ষের বন্ধন-মুক্তির জন্যে এঁরা যে চেষ্টা করেছিলেন তার জন্যে প্রত্যেক ভারতবাসী তাঁদের কাছে ঋণী থাকবে। বিশ্বভারতী স্থাপিত হওয়ার পর দেশ ও বিদেশের বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি এখানের কাজের সঙ্গে তাঁদের সাধনা যুক্ত করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম করা যেতে পারে—বিধুশেখর শাস্ত্রী, সিংহলের মহাস্থবির, শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী, সিলভ্যাঁ লেভি, মরিস ভিণ্টারনিজ্, ষ্টেন্ কোনো, ভি. লেজনী, ষ্টেলা ক্রামরিশ, কার্লো ফর্মিকি, জি টুচ্চি, জেমস বি প্র্যাট্। ক্ষিতিমোহন সেন, জগদানন্দ রায় এঁরা পূর্বেই এসেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় বা বিশ্বভারতীকে কেবলমাত্র বিদ্যাচর্চ্চার স্থান হিসাবেই গড়ে তুলতে চান নি। যে শিক্ষায় মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয় নি তা অসম্পূর্ণ—এ মতে তাঁর গভীর আস্থা ছিল। তাই বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেও শিল্পকলা, সঙ্গীত ও হাতের কাজ চর্চার ব্যবস্থা তিনি করে-ছিলেন। কলাভবন ভারতীয় শিল্পকলার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নন্দলাল বসুর নেতৃত্বে এ বিভাগ যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আজ ভারতবর্ষে যে কয়টি প্রধান শিল্পকলার কেন্দ্র আছে তাদের প্রধানদের মধ্যে অনেকেই কলাভবনের ছাত্র ছিলেন—এঁদের মধ্যে অসিত হালদার, সুরেন কর, মুকুল দে, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রমেন্দ্র চক্রবর্তী ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। ষ্টেলা ক্রামরিশ বিশ্বভারতীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কলাভবনে এসেছিলেন শিক্ষিকা হিসাবে।

সঙ্গীতচর্চার কেন্দ্র হিসাবে স্থাপিত হয় সঙ্গীত-ভবন। ভীমরাও শাস্ত্রী মহাশয় প্রথম এ ভবনের ভার নিয়েছিলেন। গীত, বাদ্য, নৃত্য—সঙ্গীতের এই তিনটি শাখার-ই এখানে চর্চা হয়। দীনেন্দ্র ঠাকুর এখানে বহুকাল শিক্ষকতা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বহু গান ও নাটক সঙ্গীত-ভবনকে প্রাণবন্ত করেছিল। শান্তিনিকেতনের ও পরবর্তী কালে বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের বহু অভিনয় নৃত্য ও সঙ্গীত বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে—দেশে ও বিদেশে। বাস্তবিকপক্ষে অনেকের কাছে শান্তিনিকেতনের বিশিষ্ট পরিচয় সেখানের এই দুটি বিভাগে। রবীন্দ্রনাথ শিল্পকলা ও সঙ্গীতে নিজে যেমন পারদর্শী ছিলেন তেমনি সমস্ত ছাত্র ও শিক্ষকদেরও অনুরাগী করে তুলতে সর্বদা চেষ্টিত ছিলেন। সঙ্গীত ও শিল্পের

মধ্য দিয়ে যে রুচিরম্যতাই লাভ হয় তা নয়, মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পক্ষেও তা অপরিহার্য, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস, তাই বিধুশেখর শাস্ত্রীর মত বৃদ্ধ মানুষকেও তিনি সঙ্গীত শেখার নেশায় মাতিয়ে তুলেছিলেন।

প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি নিতান্তই যেন কল,—তাতে ছাত্রেরা প্রাণের রস পায় না—সেখানে শুধুই বুদ্ধির চর্চা। জীবিকার প্রয়োজনেই এ শিক্ষা,—তাই এ শিক্ষা নিরানন্দ। তাই এ শিক্ষাব্যবস্থায় ডিগ্রীর দাম অত্যধিক, তাই ছাত্র ও অভিভাবকের উচ্চতম আদর্শ পরীক্ষা পাশ। বুদ্ধির চর্চাও এখানে পুঁথি প'ড়ে কয়েকটি তথ্য সংগ্রহ আর তোতাপাখীর মত তা মুখস্থ করার মধ্যেই পর্যবসিত। স্বয়ং আবিষ্কারের আনন্দ, নূতন সমস্যা সমাধানের সাহস—এ সব কিছুই এ প্রচলিত শিক্ষা দেয় না—এ ছিল রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় ধারণা, তাই তাঁর এই নূতন শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ নূতন পরীক্ষায় রত হয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। তাই বিশ্বভারতীতে উচ্চতম বিদ্যাচর্চার ব্যবস্থা থাকলেও তাতে ডিগ্রী দেবার ব্যবস্থা ছিল না। বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন, গঠন-প্রণালী সম্বন্ধে খুব কড়াকড়ি ছিল না। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন শিক্ষকদের ও ছাত্রদের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে। তিনি চেয়েছিলেন প্রত্যেক ছাত্রই তার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বিকাশের মধ্য দিয়ে সার্থক হয়ে উঠবে। বিশ্ব-ভারতী যখন ক্রমেই বড় হয়ে উঠতে লাগল, কবিও এর সমস্ত ভার বহন করতে অসমর্থ হলেন। তা ছাড়া ডিগ্রীহীন বিদ্যার, দেশের বর্তমান অবস্থায় দাম নেই, এ কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। তাই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এখান থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হোল। তা ছাড়া আশ্রমের চালনার কাজে বহু ব্যক্তি যখন সম্মিলিত হলেন তখন গণতন্ত্রসম্মত গঠন-প্রণালীর কথাও উঠল, তার ফলে বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় তার বিশেষত্ব অনেকটা হারিয়েছিল। এতে কবির মনে কিছু ক্ষোভ জন্মেছিল তা তিনি একাধিক জায়গায় স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করেছেন। ১৩৪২ সালের ৭ই পৌষ উৎসবের উপদেশে তিনি বলেছিলেন, "ক্রমে বিদ্যালয় বড়ো হয়ে উঠেছে। আমি যখন এর জন্যে দায়ী ছিলুম তখন অনেক সংকট এসেছে, সবই সহ্য করেছি, অনেক সময় বহুসংখ্যক ছাত্রকে বিদায় করতে হয়েছে—তার যা আর্থিক ক্ষতি যেমন করে পারি বহন করেছি। কেবল এইটুকু লক্ষ্য রেখেছি, যেন ছাত্র-শিক্ষক এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে চলেন। ক্রমে যেটি

সহজপন্থা বিদ্যালয় সেইদিকেই চলেছে বলে মনে হয়—শিক্ষার যে সব প্রণালী সাধারণত প্রচলিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি, সেইগুলিই বলবান হয়ে ওঠে, তার নিজের ধারা বদলে গিয়ে হাই-স্কুলের চলতি ছাঁচের প্রভাব প্রবল হয়ে ওঠে, কেননা সেই দিকেই ঝোঁক দেওয়া সহজ, সফলতার আদর্শ প্রচলিত আদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়ে। মাঝখানে এল কনষ্টিট্যুস্তন, ঠিক হ'ল বিদ্যালয় ব্যক্তির অধীন থাকবে না, সর্বসাধারণের রুচিই একে পরিচালিত করবে। আমার কবি-প্রকৃতি বলেই হয়তো, কনষ্টিট্যুস্তন, নিয়মের কাঠামো,—যাতে প্রাণধর্মের চেয়ে কৃত্রিম উপায়ের উপর বেশি জোর, তা আমি বুঝতে পারি নে, সৃষ্টির কার্যে এটা বাধা দেয় বলেই আমার মনে হয়। যাই হোক্ কনষ্টিট্যুস্তনে নির্ভর রেখে আমি এর মধ্য থেকে অবকাশ নিয়েছি, কিন্তু এ কথা তো ভুলতে পারিনে যে এ বিদ্যালয়ের কোন বিশেষত্ব যদি অবশিষ্ট না থাকে তবে নিজেকে বঞ্চিত করা হয়। সাধ্যের বেশি অনেক আমাকে এর জন্য দিতে হয়েছে, কেউ সে কথা জানে না—কত দুঃসহ কষ্ট আমাকে স্বীকার করতে হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখে যাকে গড়ে তুলতে হয়েছে সে যদি এমন হয় যা আরও ঢের আছে, অর্থাৎ তার সার্থকতার মানদণ্ড যদি সাধারণের অনুগত হয়, তবে কী দরকার ছিল এমন সমূহ ক্ষতি স্বীকার করবার? বিদ্যালয় যদি একটা হাই-স্কুলে মাত্র পর্যবসিত হয় তবে বলতে হবে ঠকলুম।" বাস্তবিকপক্ষে বিশ্বভারতী একটা নৈর্ব্যক্তিক সাধারণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নয়—এর সার্থকতা কিছুই থাকবে না যদি কবি রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ সৃজনী প্রতিভার বিশিষ্ট পরিচয় এ বহন না করে।

রবীন্দ্রনাথের মনে শিক্ষা গ্রামজীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে এ ভাবটি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময়ও ছিল—ব্রতী বালক গঠন ইত্যাদি এ ইচ্ছা থেকেই হয়েছিল। কিন্তু লোকসেবা ও গ্রাম উন্নয়নকে শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ করতে হবে এটা তিনি বুঝতে লাগলেন, তাই ইংরাজী ১৯২২ সালে শান্তিনিকেতনের কাছে গ্রামে এক নূতন গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হোল। এ প্রতিষ্ঠাকার্যে তাঁহার আদর্শে অনুরাগী আমেরিকার উৎসাহী সমাজ-কর্মী লিওনার্ড কে. এমহার্ষ্টের আনুকূল্য তিনি লাভ করেছিলেন। এমহার্ষ্টই এই প্রতিষ্ঠানের ভার গ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে কৃষির উন্নতি, সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামের লোকেদের শিক্ষিত করা, কুটিরশিল্পের পুনরুজ্জীবন, গ্রামোন্নয়নের নানা বিষয়ে গবেষণার কাজ সুরু করা হয়। ১৯২৪ সালে

প্রতিষ্ঠানটির কর্মপরিধি বিস্তার উদ্দেশ্যে এবং গ্রামজীবনের সঙ্গে অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তায় এ প্রতিষ্ঠানটি নিকটবর্তী গ্রাম শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত হয় এবং এ নূতন পরীক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষা-সত্র' নাম দেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এ প্রতিষ্ঠানের আদর্শ হচ্ছে "to bring back life in its completeness into the villages, making the rural folk self-reliant and self-respectful, acquainted with the cultural traditions of their own country and competent to make an efficient use of modern resources for the improvement of their physical, intellectual and economic condition."

যখন রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষা-সত্র প্রতিষ্ঠা করেন তখন তাঁর তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—

(1) That its students should be given full opportunity to enter into intimate relationship with the natural and social environment.

(2) Secondly, he wanted them to undertake a greater measure of responsibility in meeting the daily requirements of their individual and community life.

(3) Thirdly, he wanted the greatest emphasis to be given to learning through creative occupations, including craftwork, gardening, etc, and knowledge of formal subjects to be correlated as far as possible to such basic activities.

তিনি এই শিক্ষা-সত্রে ভারতের তপোবনের আদর্শের সঙ্গে পশ্চিমের কর্ম-কুশলতার আদর্শকে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন—"he sought to unite with the 'tapovana' ideal of education the western genius which knows how to clear the path towards a definite end of practical good."

যে সব ছাত্রেরা অত্যন্ত দরিদ্র এবং যাদের সাহিত্যিক শিক্ষায় যথেষ্ট রুচি নেই এবং যাদের জীবিকা উপার্জনের জন্যে দীর্ঘকাল শিক্ষালাভ করা সম্ভব নয় এমন কয়েকটি ছেলে নিয়েই প্রথমতঃ এ প্রতিষ্ঠানটি খোলা হয়। এতে জীবিকার্জনের উপযোগী শিল্পকর্ম, যেমন—তাঁত বোনা, গালার কাজ, বেতের কাজ, কাঠের কাজ, কৃষি ও পশুপালন ইত্যাদিকে কেন্দ্র করেই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। "The Siksha-satra was the new school he founded

in 1924 with a few boys, who either were orphans or whose parents were too destitute to be able to send them to any school whatever. ......Ms Elmhirst's special contribution was his desire to have village boys trained through modern science in the different rural handicrafts and in ariculture. The Siksha-satra was founded as a model school run on model methods for the building up of the ideal villager."

প্রথমতঃ ছাত্রদের কাছে কোন বেতন নেওয়া হত না। কিন্তু আর্থিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণে বেতন নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হোল। কারণ দেখা গেল যে শিক্ষা অবৈতনিক তাকে অভিভাবক বা ছাত্র কেউই মর্যাদা দেন না। তা ছাড়া বিনা পারিশ্রমিকে কোন বিদ্যা গ্রহণ করলে তাতে ছাত্রদের মনে একটা আত্মাবমাননার ক্ষোভ থাকে। তাই সামান্য বেতন নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হোল। তবে যারা দরিদ্র তারা তাদের অবস্থানুযায়ী ক্ষেতের ফসলের কিছু অংশও বেতন হিসাবে দিতে পারত। এখানে হাতে কলমে শিক্ষার উপরই জোর এবং ছাত্রদের স্বাবলম্বী, আত্মবল ও দৈহিক শ্রমে বিশ্বাসী করে গড়ে তুলবার শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেক ছাত্রকে আত্মকর্তৃত্বে অভ্যস্ত করবার জন্যে ছোট ছোট ক্ষেত দেওয়া হয়। তাতে তাদের ইচ্ছামত ফসল ফলাবার জন্যে উৎসাহ দেওয়া হয়। শিল্পকর্মের ব্যাপারেও ব্যক্তিগত রুচি বিকাশের জন্যে কিছুটা স্বাধীনতা ছাত্রেরা ভোগ করে। কিন্তু 'শিক্ষিত মজুর' সৃষ্টি করাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য নয়। ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার দিকেই দৃষ্টি। রুচি ও ক্ষমতা অনুযায়ী বিশ্বভারতীর কলাভবন, সঙ্গীতভবন ইত্যাদিতে শ্রীনিকেতনের ছাত্রদেরও প্রবেশাধিকার আছে।

শ্রীনিকেতন শিল্পভবসে আশেপাশের গ্রামের পুরুষ ও মেয়েদের অবসর সময় নানা অর্থকরী শিল্পশিক্ষা দানের ব্যবস্থা আছে। এখানে বাঙলার বাইরের বিভিন্ন রাজ্য-সরকার ছাত্র পাঠান এ সব বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণের জন্যে। "Since its inception it has consistently been striving to revive indigenous industries and at the same time provide subsidiary occupation to peasants. Silpa-Bhaban, as this department is called, provides training to village people, some of whom take up rural industries as professions while others use their leisure profitably by manufacturing things at home. Training is given

in a variety of crafts—weaving, dyeing, carpentry, leatherwork, pottery, paper-making, book-binding, bakery, tailoring, etc."

গ্রামগুলি যাতে স্বস্থ, স্বন্দর প্রাণবন্ত জীবিকা ও সামাজিক আনন্দের কেন্দ্র হতে পারে, সে জন্যে তিনি আদর্শগ্রাম রচনার কথা চিন্তা করেছিলেন। এ গ্রামগুলি শ্রীনিকেতনের কর্মীদের পরিচালনায় ও গ্রামবাসীদের নিজস্ব সমবেত উদ্যোগ ও উৎসাহে গড়ে উঠবে এই তিনি চেয়েছিলেন। এ উদ্দেশ্যের কথা তিনি এ ভাবে প্রকাশ করেছেন, "We must so endeavour that a power from within the villages may be working alongside of us, albeit undiscernible by us......If I can free only one or two villagers from the bonds of ignorance and weakness there will be built, on a tiny scale, an ideal for the whole of India......Our aim must be to give these villages complete freedom, education for all, the wines of joy blowing across the villages, music and recitations going on, as in the old days. Fulfil this ideal in a few villages only, and I will say that these few villages are my India. And only if that is done, will India be truly ours."

এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার জন্যে উপযুক্ত শিক্ষক অত্যাবশ্যক। চিরাচরিত পদ্ধতিতে যাঁরা শিক্ষা পেয়েছেন তাঁরা অনেক সময় এ নূতন পরীক্ষা সফল ভাবে পরিচালনায় অক্ষম। তাই শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র বিনয়-ভবন স্থাপিত হয়, ১৯৪৮ সালে, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর। এখানে শুধু সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষণের ব্যবস্থাই নেই—শিল্প, কলা, সঙ্গীত ইত্যাদি বিশেষ বিদ্যাশিক্ষণের ব্যবস্থাও আছে। রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকতেও শান্তি-নিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণের জন্যে শিক্ষা-চর্চা বিভাগ স্থাপিত হয়েছিল। বিশ্বভারতীর অন্তর্গত একটি পুস্তক-মুদ্রণ ও প্রকাশন বিভাগ আছে, তাতে শিক্ষার্থীরা বই ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদি কাজ শিখবার স্বযোগ পায়।

আজ শান্তিনিকেতন একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়—ভারত সরকার এর পরিচালনার ভার নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকতেও শিশুদের শিক্ষা থেকে স্বরু করে, মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চতর শিক্ষার জন্যে ব্যবস্থা ছিল,—শিশু-সদন একেবারে ছোটদের জন্যে—পাঠভবন ছয় থেকে ষোল বৎসরের বালক বালিকাদের জন্যে—শিক্ষাভবন ইণ্টারমিডিয়েট ও বি. এ. পরীক্ষার উপযোগী শিক্ষাদানের জন্যে—আর বিদ্যাভবন স্নাতকোত্তর ও উচ্চতর গবেষণার জন্যে।

বিশ্বভারতীর আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হচ্ছে গ্রন্থাগার। বিভিন্ন দেশ কবির বিশ্বভারতীর আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ বহু গ্রন্থ এখানে প্রেরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের বিনিময়েও নানা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পুস্তকাদি দান করেছেন। নানা দেশের সংস্কৃতি ধর্ম ও ইতিহাস সম্বন্ধে পুস্তক সংগ্রহ অত্যন্ত মূল্যবান্। বিদেশী ছাত্র ও শিক্ষকেরা এখানে এসে থাকবার ও কাজ করবার সুযোগ পান। বাস্তবিকপক্ষে সমগ্র বিশ্বের মানস-মিলনের যে আদর্শ রবীন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তা এখানে সার্থক রূপ পেয়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকেও বহু পুস্তক ও অর্থ সাহায্য পাওয়া গেছে, কিন্তু বাঙলাদেশ থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের পরিমাণ সামান্য।

এটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়—সমস্ত শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই বিশ্বভারতীর সীমার মধ্যে অবস্থিত ছাত্র-ছাত্রী নিবাসে বাস করে শিক্ষালাভ করে। বোলপুর ও আশেপাশের গ্রামের কিছু ছাত্র-ছাত্রীকে বাহিরে থেকে এসে ক্লাস করতে অনুমতি দেওয়া হয়।

প্রত্যেক বিভাগেই নির্দিষ্টসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী গ্রহণ করা হয়। প্রথম যখন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তখন সমস্ত ছাত্রদের ব্যয়ভার রবীন্দ্রনাথ নিজেই বহন করেছেন। তার পরে যখন বেতন নেওয়ার প্রথা হোল তাতেও বিদ্যালয়ের খরচ কখনও সংকুলান হত না—এখনও হয় না। বাস্তবিকপক্ষে ব্যবসায়িক বুদ্ধিদ্বারা এ প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালিত নয়। এবং আথিক স্বয়ং-সম্পূর্ণতা এর আদর্শ নয়। প্রাচীন ভারতে দেশের রাজা শিক্ষার জন্যে রাজস্বের ষষ্ঠ অংশ চতুষ্পাঠী, টোল ইত্যাদি বিদ্যা-প্রতিষ্ঠান রক্ষার জন্য ব্যয় করতেন। ছাত্ররা বিনাব্যয়ে গুরুগৃহে বাস করে শিক্ষালাভ করত। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন এটি অনুকরণীয় আদর্শ।

আমাদের দেশে বর্তমান যুগে দুটি অনন্যসাধারণ মানুষ শিক্ষা-সংস্কারের জন্য মৌলিক ও উল্লেখযোগ্য পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছিলেন—একজন রবীন্দ্রনাথ আর একজন গান্ধীজি। এই দুটি পরীক্ষায় এই দুটি মানুষের ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। দু'জনেই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় বীতশ্রদ্ধ। দু'জনেরই মত যে এ-শিক্ষা প্রাণহীন আদর্শহীন এবং দেশের প্রকৃত প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম। দু'জনেই বিশ্বাস করেন শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ। দু'জনেই দেশের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল। দু'জনেই বিশ্বাস করেন দেশের শিক্ষা এই

সংস্কৃতির ভিত্তির উপরই ভিত্তি করে গড়তে হবে। দু'জনেই মনে করেন সরল, শান্ত, শুদ্ধ ও কর্মময় আশ্রমই হবে বিদ্যালয়ের আদর্শ। দু'জনেই শিক্ষার ক্ষেত্রে দৈহিক শ্রম ও হাতের কাজকে বিশিষ্ট স্থান ও মর্যাদা দিয়েছেন। দু'জনেই মনে করেন শিক্ষাপ্রণালীর উৎকর্ষের অপেক্ষা শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র শিশুর শিক্ষার পক্ষে অধিকতর প্রয়োজন। দু'জনেই তাড়নাদ্বারা পুঁথি পড়ানো ও মুখস্থ করা বিদ্যাকে নিকৃষ্ট ও নিষ্প্রয়োজন মনে করেন। দু'জনেই ব্যক্তিগত উদ্যম ও কর্মকুশলতা বিকাশকে শিক্ষার একটি শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য মনে করেন। দু'জনেই প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় এবং প্রকৃতির সাহচর্য শিক্ষার জন্য অপরিহার্য মনে করেন। কিন্তু তাঁদের পরীক্ষার মধ্যে পার্থক্যও লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী, তাই ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্যে তাদের স্বাধীনতাকে তিনি অক্ষুণ্ণ রাখতে চান, শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের স্বাধীনতাকে তিনি খর্ব করতে চান নি। গান্ধী-প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য সমাজের ভিত্তির আমূল সংস্কার, তাই তাঁর শিক্ষা-ব্যবস্থায় সামাজিক উদ্দেশ্য, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও বাধ্যতার উপর জোর বেশী। ব্যক্তিগত ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও রুচিকে সামাজিক সংহতির প্রয়োজনে শাসন ও নিয়ন্ত্রণের তিনি পক্ষপাতী। বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "The scheme envisages the idea of a co-operative community in which the motive of social service will dominate all the activities of children during the plastic years of childhood and youth." রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়েও সামাজিক রীতি ও ভদ্রতা পালন ও সমাজ-সেবা শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে রয়েছে, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী গান্ধীজির চেয়ে পৃথক। গান্ধীজির দৃষ্টিভঙ্গী সমাজ-ভিত্তিক —রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ব্যক্তি-কেন্দ্রিক।

এ উপলক্ষ্যে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। গান্ধীজি একবার তাঁর আশ্রমের কয়েকটি ছেলেকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে বেড়াতে এসেছিলেন এবং একদিন সেখানে বাস করেছিলেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের নিয়ে নিজ হাতে আশ্রম ঝাঁট দেওয়া, ময়লা পরিষ্কার ইত্যাদি কাজ করেছিলেন। গান্ধীজির আশ্রমে ছাত্রদের এটা নিত্যকৃত্য। শান্তিনিকেতনে তা নয়। গান্ধীজির এই শান্তিনিকেতন বাস সেখানে স্মরণীয় হয়ে আছে এবং সেই দিনটিতে প্রতি বৎসর শিক্ষক ও ছাত্রেরা আশ্রম সম্মার্জন করে থাকেন। এই সময়ে একদিন

রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির আশ্রমের কয়জন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি করতে তাদের খুব ইচ্ছে করে, বা কি তাদের খুব ভাল লাগবে। ছেলেরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নাকি উত্তর করেছিল, "আমরা আমাদের শিক্ষককে জিজ্ঞেস করে এসে আপনাকে জানাব।" এতে সেই ছাত্রদের নিয়মানুবর্তিতা ও বাধ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু এটাও বোঝা যায়—এ শিক্ষায় স্বাধীন ইচ্ছা বিকাশের পথ প্রশস্ত নয়। সরল ও বিশুদ্ধ জীবন যাপনের অভ্যাস ছাত্রজীবনের একটি মূল ভিত্তি একথা গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথ এ দু'জনের শিক্ষা-পদ্ধতিতেই স্বীকৃত, কিন্তু এখানেও দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য আছে। গান্ধীজি কৃচ্ছ্র-সাধনায় যতটা বিশ্বাসী, রবীন্দ্রনাথ ততটা নন। রবীন্দ্রনাথ মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পক্ষপাতী, তাই বুদ্ধি, অনুভূতি ও ইচ্ছা এর প্রত্যেকটিরই বিকাশ শিক্ষার সত্য উদ্দেশ্য বলে তাঁর ধারণা। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে খেলা, আনন্দ, অভিনয়ের আয়োজন থাকা চাই। কিন্তু যে খেলা ও আনন্দ সমাজসেবার ও গঠনাত্মক কর্মের অঙ্গ নয়—গান্ধীজির কাছে তা মূল্যহীন। গান্ধীজির দৃষ্টি কর্মী ও সন্ন্যাসীর দৃষ্টি, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি কবি সৌন্দর্য-পিপাসুর। রবীন্দ্রদর্শন বৈরাগ্য সাধনে বিশ্বাসী নয়—"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।" এই মাটির পৃথিবীর রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শের সাড়া নিয়েই মানুষের আনন্দময় সত্তা বিকশিত হবে—রূপের মধ্য দিয়েই অরূপের সন্ধান মিলবে, এই রবীন্দ্রনাথের সাধনা। গান্ধীজি নিজেকে 'বেনে বলে পরিচয় দিতে গর্ব বোধ করে থাকেন। বাস্তবিকপক্ষে গান্ধীজির ব্যবসায়ী বুদ্ধির পরিচয় তাঁর শিক্ষা-ব্যবস্থায়ও প্রকট। গান্ধীজি একটি গ্রাম-কেন্দ্রিক আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করতে চেয়েছেন যা দেশের সরকারের উপর নির্ভরশীল হবে না—যা স্থানীয় চেষ্টাদ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে ও রক্ষিত হতে পারবে। তিনি চেয়েছেন দরিদ্র দেশের উপযোগী দরিদ্র ব্যবস্থা, যা দেশের অসংখ্য জনসাধারণের মৌলিক জীবনযাত্রার উপাদান সংগ্রহে সাহায্য করবে। এ শিক্ষাদর্শ স্বভাবতঃই সঙ্কীর্ণ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাসত্রে কতকটা এই আদর্শ গ্রহণ করলেও সমস্ত শিক্ষাকে এই সঙ্কীর্ণ আদর্শে সীমাবদ্ধ করতে ইচ্ছুক নন। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন শিক্ষার মধ্যে দিয়ে সমগ্র মানবের সঙ্গে মিলনের সেতু রচনা করতে। তাঁর শিক্ষার বিরাট আয়োজন স্বভাবতঃই আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না এবং দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। গান্ধীজির শিক্ষা-পদ্ধতি তার সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে অধিকতর উপযোগী তাতে সন্দেহ নেই,

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোন আশু উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে শিক্ষার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করতে ইচ্ছুক নন। ১৩২৯ সনের ৯ই ভাদ্র কোন উৎসব উপলক্ষ্যে বলেছিলেন, "আমাদের দেশবাসীরা 'ভূমৈব সুখম্' এই ঋষিবাক্য ভুলে গেছে। ভূমৈব সুখং, তাই জ্ঞানতপস্বী মানব দুঃসহ ক্লেশ স্বীকার করেও উত্তর-মেরুর দিকে অভিযানে বার হচ্ছে, আফ্রিকার অভ্যন্তর-প্রদেশে দুর্গম পথে যাত্রা করেছে, প্রাণ হাতে করে সত্যের সন্ধানে ধাবিত হচ্ছে। তাই কর্ম, জ্ঞান ও ভাবের সাধন-পথের পথিকেরা দুঃখের পথ অতিবাহন করতে নিক্রান্ত হয়েছেন, তাঁরা জেনেছেন যে ভূমৈব সুখং—দুঃখের পথেই মানুষের সুখ। আজ আমরা সে কথা ভুলেছি, তাই অত্যন্ত ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও অকিঞ্চিৎকর জীবনযাত্রার মধ্যে আত্মাকে প্রচ্ছন্ন করে দিয়ে দেশের প্রায় সকল লোকেরই কাল কাটছে।"

গান্ধীজির শিক্ষা চরকারূপ শিল্পকর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে, এ শিক্ষা শিল্পকর্মকেন্দ্রিক, craft-centred। কিন্তু যে শিল্পকর্ম গ্রাম্যজীবনের মৌলিক প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে সহায়ক নয়, বুনিয়াদী শিক্ষায় তার স্থান নেই। রবীন্দ্রনাথও নানা হাতের কাজকে শিক্ষার একটি প্রধান সহায়ক মনে করেন, কিন্তু তা জীবনের মৌলিক প্রয়োজন মেটাবার কাজেই সঙ্কীর্ণভাবে সীমাবদ্ধ থাকবে এটা তাঁর মত নয়। তাই ব্যক্তিত্ববিকাশের উপযোগী নানা কারুশিল্পেরও স্থান তিনি দিয়েছেন শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে। তাই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা নানা কর্ম ও ক্রীড়াকেন্দ্রিক activity-play-centred একথা বলিতে পারি। গান্ধীজি কাজের মানুষ (practical) আর রবীন্দ্রনাথ আদর্শবাদী বা idealist। শ্রীঅনাথ-নাথ বসু তাঁর একটি প্রবন্ধে এ সম্পর্কে বলেছেন, "When Tagore speaks of handwork, music and arts as vehicles of creative self-expression he puts his emphasis on the creative and artistic aspects. But in Basic Education side by side with the creative aspect the social and economic aspect of craft work are stressed." তবে এটা লক্ষণীয় যে, গান্ধীজির বহু পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরীক্ষা সুরু করেছিলেন এবং বুনিয়াদী শিক্ষার মূলনীতি তাঁর শিক্ষা-ব্যবস্থায় আংশিক রূপ পেয়েছিল 'শিক্ষা-সত্রে', "It is indeed curious to think that Rabindranath, nearly a quarter of a century back anticipated the most progressive educational thoughts and principles yet discovered and gave them a concrete shape in this small modest looking institution, 'Siksha-Satra'."

গান্ধীজির মানসিক গঠন রক্ষণশীল ও প্রাচীনপন্থী এবং পাশ্চাত্ত্য দেশের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিকে তিনি সন্দেহের চোখে দেখেন। রবীন্দ্রনাথও বিজ্ঞানের উগ্র বস্তুতান্ত্রিকতা এবং মানুষের ধ্বংসের ও উৎপীড়নের কাজে এর ব্যবহারের নিন্দা করেছেন। তথাপি তিনি বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে সচেতন এবং দেশের উন্নয়নের কাজে বিজ্ঞানের ব্যবহার অপরিহার্য বলে মনে করেন, তাই শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীতে বিজ্ঞানচর্চায় তাঁর উৎসাহ ছিল। গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ তুলনা করে শ্রীযুত সুনীলচন্দ্র সরকার Education in Free India and its Central Purpose প্রবন্ধে লিখেছেন—"Gandhiji's truth and non-violence are akin to, almost identical with, Tsgore's message of love and universal brotherhood, but still they are distinctly marked off as two distinct attitudes towards life. Whereas Gandhiji concentrates on the eternal problems of evil and evolves a philosophy of action, some thing like a simplified version of Karma-Yoga suited to the needs and abilities of each and every man, Tagore centres his philosophy on the joy of life, the eternal Ananda of realisation and expression which does not exclude action. Gandhiji established the everyday reality of life in his system and saved his education from the danger of 'escapism' in any form ; he gives it grip over the student mind which has so long been the dream of all educationists. Tagore presents reality in its largest perspective yet attained by man and saves education from the danger of all narrow limitations of place, time and people."

রুশোর সময় (১৭১২-১৭৭৮) থেকে সুরু করে পাশ্চাত্ত্য দেশে যে-সব শিক্ষা-সংস্কার বা শিক্ষা সম্পর্কে পরীক্ষা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ তাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং তদ্দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন এরকম অনুমান সম্ভবতঃ অন্যায় নয়। রুশোর মত তিনিও বিশ্বাস করেছেন যে, শিশুর শিক্ষার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গন। রুশোর মত তিনিও প্রকৃতির শিক্ষাকে উচ্চ মূল্য দিয়েছেন। রুশোর মত তাঁরও মনে ছিল শিশুর জন্য অপরিমিত স্নেহ ও করুণা। শিক্ষার ক্ষেত্রে কঠিন শাসন ও পীড়ন হতে শিশুকে মুক্তির পথ দু'জনেই দেখিয়েছেন। দু'জনেই চেয়েছেন শিশুর অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করে তার আত্মবিকাশের পথ প্রশস্ত করা, দু'জনেই বই-পত্রের গুরুভার থেকে শিশুকে মুক্তি দেওয়ার পক্ষপাতী। কিন্তু দু'জনের মধ্যে

পার্থক্য আছে। রুশোর পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে প্রকৃতি বাহ্য—মানুষ অনিচ্ছুক প্রকৃতির হাত থেকে ছিনিয়ে দেবে তার গোপন রহস্য, মানুষ তাকে বশ করবে, জয় করবে, ভোগ করবে। রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় দৃষ্টিতে প্রকৃতি কল্যাণময়ী মাতা, তা পালন করে, পোষণ করে, শান্ত করে। মানুষের শিক্ষার একটি শ্রেষ্ঠ অঙ্গ প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা। আর এক বিষয়েও তাঁদের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ রয়েছে। রুশো মানব-সমাজব্যবস্থাকে ঘৃণা করেছেন, মানব-সভ্যতাকে মনে করেছেন সমস্ত দুঃখ ও বিকৃতির কারণ। তাই রুশো তাঁর আদর্শ ছাত্র এমিলকে সমাজ ও সংসারের আবেষ্টন থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধুমাত্র গৃহশিক্ষকের সান্নিধ্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। রবীন্দ্রনাথও সংসারের আবিলতা ও বিকৃতি থেকে, শিক্ষার প্রথম অবস্থায়, শিশুকে রক্ষা করা বাঞ্ছনীয় মনে করেছেন। তাই তিনি তপোবনের আদর্শে আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। কিন্তু মানব-সমাজ ও সভ্যতাকে তিনি ঘৃণা করেননি। সামাজিক রীতি-নীতি আচার শিক্ষাও শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ বলে স্বীকার করেছেন। তাই তাঁর বিদ্যালয় পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই স্থাপিত।

পেস্তালৎসী ও আধুনিক সমস্ত শিক্ষাব্রতীর মত রবীন্দ্রনাথও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর শিক্ষাকে স্থাপনের পক্ষপাতী। তাই বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশে শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তাঁর মিল রয়েছে, কিন্তু তার বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র নন। শিশুর সমস্ত কর্ম, উৎসাহ, কর্মোদ্যম—বেগ ও গতি পাবে শিক্ষকের জীবন্ত ও সক্রিয় ব্যক্তিত্ব থেকে। শিশু-মনস্তত্ত্ব না জানলে শিশু-শিক্ষায় সফল হওয়া যায় না একথা রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেন। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে শিশুর মনকে যেমন বিশ্লেষণ ও স্তর বিভাগ করা হয়েছে তা রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ মনঃপূত নয়। তিনি মানুষকে খণ্ডিতভাবে দেখতে এবং তার বিভিন্ন শক্তিকে বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষা দেওয়ার রীতিতে বিশ্বাসী নন। তাই শিক্ষার আধুনিক প্রণালীগত উন্নতির সম্বন্ধে তাঁর ঔৎসুক্য ও উৎসাহ থাকলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রণালীর শ্রেষ্ঠতার চেয়ে শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের প্রভাবকে তিনি অধিকতর মূল্য দিয়েছেন।

শিশুর শিক্ষা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই সার্থক ও সত্য হয়ে ওঠে, ফ্রোএবেলের এ মতের সঙ্গে তাঁর মিল আছে—শিশুরূপ চারাগাছকে তার স্বকীয়তার পূর্ণ তেজে বেড়ে উঠতে সাহায্য করাই শিক্ষকের কর্তব্য এবং শিশু নানা ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার ও

নানা হাতের কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা পাবে, কিণ্ডারগার্টেনের এ নীতি তিনিও তাঁর বিদ্যালয়ে ব্যবহার করেছেন—কিন্তু কোন প্রণালীর যান্ত্রিক ব্যবহারেই তিনি বিশ্বাসী নন। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার একটি বিশেষত্ব—রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যালয়ে পরিপূর্ণভাবেই এর ব্যবহার করেছেন। তবে ফ্রোএবেলের মত তিনি একথা বিশ্বাস করেন না, যে শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক অনেকটা নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষক ক্রিয়াশীল পরিচালক।

মন্তেসরী তো প্রায় তাঁর সমসাময়িক। বরং রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষা সম্ভবতঃ মন্তেসরীর আগেই সুরু হয়েছিল। শিশুর স্বাধীন সত্তা বিকাশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মন্তেসরী বলেছেন—"The child who has never learned to act alone, to direct his own actions, to govern his own will, grows into an adult who is easily led and must always lean on others. The school child, being continually discouraged and scolded, ends by acquiring that mixture of distrust of his own powers and of fear, which is called shyness and which later, in grown up man, takes the form of discouragement and submissiveness,of incapacity to put up the slightest moral resistance. The obedience which is expected of a child both in the home and in the school, an obedience admitting neither of reason nor of justice, prepares the man to be docile to blind forces." একথা রবীন্দ্রনাথের কথাও বটে। মন্তেসরী শিশুর ইন্দ্রিয়ের সচেতনতা ও কর্মকুশলতা বিকাশের উদ্দেশ্যে ও আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষাদানের জন্যে খেলাকে একটি প্রধান স্থান দিয়েছেন। এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপ্রণালীর সাদৃশ্য আছে। কিন্তু মন্তেসরী শিশুর কল্পনার ক্ষেত্র সঙ্কোচনের পক্ষপাতী এবং তাঁর খেলাও কতগুলি সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতী (Montessori materials) দ্বারা সীমাবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ শিশুকে অধিকতর স্বাধীনতা দানের পক্ষপাতী।

আমেরিকার বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ জন ডিউইর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শেরও বহু মিল আছে। ডিউইর মতে শিক্ষাকে সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করলে তা প্রাণ হারায়। শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তির অভিজ্ঞতাকে সমাজের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত ও সমন্বয় সাধন। শিক্ষা ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতি মাত্র নয়, বর্তমান জীবন ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার যোগ থাকা চাই। বিদ্যালয় সামাজিক জীবনেরই একটি জীবন্ত অঙ্গ। প্রকৃত শিক্ষার ফল জীবনের সরলীকরণ ও

মানবের সমানাধিকারে বিশ্বাস ও মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশ। Dewey-র নিজের ভাষায় তাঁর শিক্ষাদর্শের কয়েকটি মূল সূত্র দেওয়া হোল :

"I believe that

...all education proceeds by the participation of the individual in the social consciousness of the race.

...the only true education comes through the stimulation of the child's power by demands of the social situation in which he finds himself.

...education...must begin with a psychological insight into the child's capacities, interests, and habits...These...must be continually interpreted—we must know what they mean. They must be translated into terms of their social equivalent—into what they are capable of, in the way of social service."

বিদ্যালয় কি, কি তার কর্তব্য সে সম্বন্ধে Dewey বলছেন :—

"I believe that

...the school is primarily a social institution...the school must represent present life—life as real and vital to the child as that he carries on in the home, in the neighbourhood, or on the play-ground.

...the school, as an institution, should simplify existing social life.

...as such simplified social life, the school life should grow gradually out of the home."

শিক্ষকের কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি বলছেন :—

"The teacher's place and work in the school is to be interpreted from this same (social) basis. The teacher is not in the school to impose certain ideas or to form certain habits in the child, but is there as a member of the community to select the influences which shall affect the child and to assist him in properly responding to these influences.

"...The teacher is engaged, not simply in the training of individuals, but in the formation of the proper social life.

"...Every teacher should realise the dignity of his calling; that he is a social servant set apart for the maintenance of proper social order and securing of the right social growth.

"...In this way the teacher always is the prophet of the true God and the usher in of the true kingdom of God."

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের সঙ্গে এ আদর্শের বহুলাংশে সাদৃশ্য আছে। তবে শিক্ষার সামাজিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ডিউই অধিকতর সচেতন। রবীন্দ্রনাথের কাছে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশই সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ এবং এ আদর্শ-উপযোগী শিক্ষা মানুষকে বাহ্যপ্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মবন্ধনে আবদ্ধ করে। শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু জ্ঞান আহরণ নয়—পরিপূর্ণ জীবন "to attain fullness by sympathy with the whole of nature." এই সার্থক শিক্ষার ফল আনন্দময় বন্ধনমুক্তি—"Perfect freedom lies in the perfect harmony of relationship which we realise in this world—not through our response to it in *knowing* but in *being*."

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপ্রণালী সুলভ নয় এবং রবীন্দ্রনাথের জীবন্ত ব্যক্তিত্বের প্রভাবে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী প্রাণবন্ত। সে প্রাণকেন্দ্রের অভাবে এ প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে। বাস্তবিকপক্ষে রবীন্দ্রনাথের এ শিক্ষার পরীক্ষা দেশের সাধারণের সমর্থন পায়নি। হয়তো তিনি তাঁর কালের পূর্বেই জন্মেছেন, তাই তাঁর সাধনা ও আদর্শ এদেশের লোক গ্রহণ করতে সমর্থ নয়। শেষ জীবনে একথা তিনি বুঝেছিলেন। এ ব্যর্থতার সুর মৃত্যুকালের পূর্বে ১৩৪৭ সনের ৮ই শ্রাবণ প্রার্থনায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট: "আজ বার্ধক্যের ভাঁটার টানে তোমাদের জীবন থেকে দূরে পড়ে গেছি। প্রথম যে আদর্শ বহন করে এখানে এসেছিলুম, আমার জীর্ণ শক্তির অপটুতা থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে নিজের হাতে বহন করবার আনন্দিত উদ্যম কোথাও দেখতে পাচ্ছি নে। মনে হয় এ যেন বর্তমান কালেরই বৈশিষ্ট্য। সব কিছুকে সন্দেহ করা, অপমান করা, এতেই যেন তার স্পর্ধা। তারই তো বীভৎস লক্ষণ মারী বিস্তার ক'রে ফুটে উঠেছে, দেশে বিদেশে আজকের দিনের রাষ্ট্রে, সমাজে বিদ্রূপ করছে তাকে যা মানবসভ্যতার চিরদিনের সাধনার সামগ্রী।

...বিরুদ্ধ ভাগ্যের নির্মমতা ভেদ করে সেই যে যাত্রাপথ চলেছিল সম্মুখের দিকে তার দুঃসহ ইতিহাস কেউ জানবে না। আজ এসেছি সেই দুঃখস্মৃতির

ভিতর দিয়ে। উৎকণ্ঠিত মনে তোমাদের মনে খুঁজতে এলাম তার সার্থকতা। আধুনিক যুগের শ্রদ্ধাহীন স্পর্ধা দ্বারা এই তপস্যাকে মন থেকে প্রত্যাখ্যান কোরো না—একে স্বীকার করে নাও।"

এই মর্মস্পর্শী বেদনাতুর আবেদনই তিনি করেছিলেন গান্ধীজির কাছে, তাঁর জীবিতকালে গান্ধীজি শেষ যেবার শান্তিনিকেতন আশ্রমে যান। পরম শ্রদ্ধা দিয়ে জীবনব্যাপী এই সাধনার ফলকে তিনি দেশবাসীর হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন—বিদেশ তাঁর এই দানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছে—কিন্তু দেশ তাঁর এই দানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করুক এই ছিল তাঁর অন্তরের কামনা। ১৩৪৫ সালের ৮ই পৌষ উৎসবে তিনি বলেছিলেন—"বহুদিনের ত্যাগের দ্বারা, চেষ্টার দ্বারা এই আশ্রমকে দেশের বেদীমূলে স্থাপন করবার জন্য নৈবেদ্য সংরক্ষণকার্য আমার আয়ুর সঙ্গে সঙ্গেই এক রকম শেষ ক'রে এনেছি। দূরের অতিথি-অভ্যাগতদের অনুমোদনের দ্বারা আমাদের কাছে এই কথা স্পষ্ট হয়েছে যে এখানে প্রাণশক্তি রয়েছে। ফুলে ফলে বাইরের ফসলের কিছু একটা প্রকাশ এঁরা দেখেছেন, তা ছাড়া তাঁরা এর অন্তরের ক্রিয়াকেন্দ্র দেখেছেন।...আমাদের এই আশ্রমের কর্মেতে আমি যে আপনাকে সমর্পণ করেছি তা সার্থক হবে যদি আমার এই সৃষ্টি আমি যাবার পূর্বে দেশকে সঁপে দিতে পারি। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ যেমন, শ্রদ্ধয়া আদেয়ম্। যেমন শ্রদ্ধায় দিতে চাই, তেমনি শ্রদ্ধায় একে গ্রহণ করতে হবে। এই দেওয়া-নেওয়া যেদিন পূর্ণ হবে সেদিন আমার সারা জীবনের কর্ম-সাধনার এই ক্ষেত্র পূর্ণতার রূপ লাভ করবে।"

রবীন্দ্রনাথ আজ নেই। তাঁর এই সাধনার ক্ষেত্র বিশ্বভারতীর ভার ভারত সরকার গ্রহণ করেছেন। কিন্তু একথা কি বলা যাবে—দেশ তাঁর শ্রদ্ধার দানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে তাঁর তপস্যার পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছে?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কার উদ্দেশ্যে একটি কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল। মাইকেল স্যাড্‌লার ছিলেন এর সভাপতি। বাঙলাদেশের নানা বিদ্যালয় পরিদর্শন করে এদেশের শিক্ষাপদ্ধতির একটি ত্রুটি প্রাণপূর্ণ ঐক্যের আদর্শের অভাবে এই কথা নির্দেশ করেছিলেন—

"In other parts of the world and not least in England, schools and colleges suffer to some extent from lack of an inspiring unity in their intellectual aim. The mass of new knowledge which now

claims a place in schemes of education has not yet found a synthesis. It has not yet been unified intellectually. Still less has it been co-ordinated with spiritual belief. And this dislocation between different departments of the intellectual life and their mal-adjustment to emotional aesthetic experience result in a lack of those simple authoritative generalisations which compel acceptance, touch every side of human experience and are the groundwork of definite teaching in primary and secondary school."

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর শিক্ষা-পদ্ধতির মূলে আছে—একটি প্রাণবন্ত সমন্বয়ী আদর্শ। বিশ্বভারতীর এ বৈশিষ্ট্য স্যাড্‌লার কমিশন লক্ষ্য করেছেন। এ আদর্শ ও উদ্দেশ্য বিশ্বভারতীর Memorandum of Association-এ এ-ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে—To bring the Mind of Man in its realisation of different aspects of truth from diverse points of view,

To bring into more intimate relation with one another, through practical study and research, the different cultures of the East on the basis of their underlying unity.

To approach the West from the standpoint of such a unity of Asia.

To seek to realise in a common fellowship of study the East and the West and thus ultimately to strengthen the fundamental condition of world peace through the establishment of free communication of ideas between the two hemispheres."

স্যাড্‌লার কমিশন শান্তিনিকেতনও পরিদর্শন করেছিলেন এবং সেখানের সুস্থ সুন্দর সামাজিক পরিবেশ স্যাড্‌লারের প্রশংসা অর্জন করেছে—"In Bengal a school is thought of too narrowly as a place of instruction. Its possibilities as a society are overlooked.......At school he (the student) ought to feel himself not a mere unit who has to learn things at an appointed time and place, not simply one of a multitude of similar units receiving instruction from his teachers ; but a member of a community, responsible for service to it, an active participant in its various occupations, attached to it by a net-

work of interests and responsibilities. It cannot be said that this side of education is impracticable in India. To give one example alone, it is highly developed at Bolpur."

এ প্রশংসা সামান্য নয়।

সংযোজনা

প্রবন্ধটি পুস্তকাকারে ছাপা শেষ হবার পর সম্প্রতি 'পরিচয়' পত্রিকার বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুত গোপাল হালদারের 'শিক্ষা ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি চোখে পড়ল। এমন তথ্যবহুল, চিন্তাপূর্ণ ও সুলিখিত প্রবন্ধ সচরাচর চোখে পড়ে না। একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী লেখকের চিন্তায় সুস্পষ্ট এবং সে দৃষ্টিভঙ্গী-সঞ্জাত তাঁর অনেক তীক্ষ্ণ উক্তি ও বিরূপ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একমত না হলেও তাঁর প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-ভাবনার বিশ্লেষণ খুবই স্বচ্ছ ও সুন্দর। তা থেকে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ ও গান্ধীজির আদর্শ হতে তার পার্থক্য সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য নীচে উদ্ধৃত করছি। এ জন্য লেখকের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাই। 'পরিচয়' পত্রিকা প্রকাশকদেরও ধন্যবাদ।

"**শিক্ষা-ভাবনার ভাবকেন্দ্র**—রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ধারা অনুসরণ করলে দেখি তাতে কয়েকটি ধারণা নানা সূত্রেই বারে বারে ফিরে আসে। যেমন ব্যক্তি-সত্তায় বিশ্বাস, বিশ্বসত্তায় আস্থা, মানবতায় শ্রদ্ধা, বিশ্বজীবনের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের সৌন্দর্য ও সুষমার সম্পর্কস্থাপনের কথা ইত্যাদি। এসব ধারণা একটি অখণ্ড জীবনদর্শনের নানা রূপ। সে জীবনদর্শনকে বলতে পারি ক্রিয়েটিভ্ ইউনিটি: সুষমাবাদ বা হার্মনিতে বিশ্বাস এবং জীবনের সৃজনধর্মে বিশ্বাস।......

শিক্ষাদর্শের দিক থেকে দুটি প্রধান কেন্দ্রপথ রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় দেখা যায়—পার্সোনালিটি বা ব্যক্তিসত্তার ভাবনা এবং জাতীয় চেতনার প্রকাশ ভাবনা। এই দুই কেন্দ্রপথ থেকে রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শের ক্রমবিকাশ ও ক্রমপরিণতি লক্ষ্য করা অসমীচীন নয়। অবশ্য তাতে তাঁর সুষমার বা হার্মনির আদর্শ, মানবতার আদর্শ প্রভৃতি পূর্বপরই অনুস্যূত ছিল, আর সমস্ত শিক্ষাদর্শকেই বলতে পারি সৃজন-সুষমার ধারণায় কেন্দ্রিত (ক্রিয়েটিভ্ ইউনিটি), সে-ভাবনায় অনুপ্রাণিত এক ক্রিয়েটিভ্ এডুকেশনের দর্শন।"

"**সংস্কৃতির দীক্ষা**—প্রকৃতির সংস্পর্শ ও মানুষের সংস্পর্শ—এই দুই সংস্পর্শকে জীবন্তরূপে গ্রহণ করলে ছাত্রমানস যে-শিক্ষা সহজভাবেই লাভ করবে তা শুধু শিক্ষা

নয়, শিক্ষারও যা লক্ষ্য, সংস্কৃতি। তা জ্ঞানের দীক্ষা, সুষমার দীক্ষা, মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ঐক্যের দীক্ষা। আরও সত্য এই যে, রবীন্দ্র-সংস্কৃতি সৌন্দর্য-বোধের দীক্ষা এবং জীবনানন্দের দীক্ষাও।......

......শিক্ষার সার্থকতা এই সংস্কৃতিতে শুধু রূপরসের অনুশীলনে নয়—জ্ঞান, সৌন্দর্যবোধ ও কর্মের সুষমা স্থাপনে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির এই সংজ্ঞা "লিবারাল্ এডুকেশনের" আদর্শসম্মত, তবে তা সংকীর্ণ নয় এইজন্য যে, রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে পূর্বাপর শ্রদ্ধা করতেন। এ বিষয়ে কোনদিনই তিনি সংশয় পোষণ করতেন না এবং সৌন্দর্য-বোধের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সত্যের বা প্রয়াসের কোন বিরোধও তিনি দেখেননি।"...

"**রবীন্দ্র-শিক্ষানীতির স্বরূপ**...বাইরের দিকে থেকে দেখি—পূর্বযুগে লিবারাল্ এডুকেশন ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের স্থানটা গৌণ বলেই স্থিরীকৃত ছিল, সম্ভবত এখন আর তা নেই।

...কিন্তু বাইরের নয়, লিবারাল্ এডুকেশন-এর আন্তরিক খর্বতাও রবীন্দ্র-নাথের শিক্ষানীতিকে খর্বিত করিতে পারেনি। কারণ লিবারাল্ এডুকেশনকে তিনি দেখেছিলেন মানবতার বা হিউম্যানিজ্ম-এর প্রধান পরিপোষক হিসাবে।

...রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ তাই রাইটস্-অফ-ম্যান্-এর মন্ত্রে অবিচলিত বিশ্বাস নিয়ে মানবতার পথে এগিয়ে গেল। শ্রেণীস্বার্থকেন্দ্রীয় লিবারাল্ নিয়তি ও লিবারাল্ এডুকেশনের স্বার্থজড়িত সংস্কার তা সমুত্তীর্ণ হল। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-নীতিকে তাই লিবারাল্ এডুকেশন লেবেল আঁটা অপেক্ষা লিবারাল্-হিউম্যানিষ্ট এডুকেশন নাম দেওয়াই অধিকতর সঙ্গত। মূলত লিবারাল্ হলেও শ্রেণীস্বার্থ-ভাবনায় তা নিয়মিত নয়, মানব-মুক্তি-ভাবনা দ্বারা অনুপ্রাণিত।"......

"বলা বাহুল্য, এই নীতির সঙ্গে 'বেসিক্ এডুকেশন'-এর 'ক্র্যাফ্ট্-ওয়ার্ক' বা চরকা-কেন্দ্রিক শিক্ষার কোন সম্পর্ক কল্পনা করে লাভ নেই। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি এক অর্থে 'আশ্রমের শিক্ষা'য় বিশ্বাস করতেন না। দু'জনার আশ্রমের রূপও এক নয়, আত্মাও এক নয়। রবীন্দ্রনাথ সভ্যতায় ও উন্নত জীবন-যাত্রায় বিশ্বাসী, গান্ধীজি সভ্যতা বা উন্নত-জীবন-মানে আস্থা রাখতেন না। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে মানুষের মনকে মুক্তি দেবার সদুপায় বলেই বিবেচনা করতেন। গান্ধীজির বিবেচনায় মানুষের মনকে নানাভাবে বাঁধাই—শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টিতে বিশ্বাসী, শিল্পে উদ্যোগী, বিজ্ঞানে অনুরাগী, মানুষের সভ্যতায় আস্থাশীল।

গান্ধীজির নিকট এর কোনটিরই মূল্য নেই—সভ্যতা ও বিজ্ঞান মানুষের বিকৃতি মাত্র; শিল্প, নৃত্য, নাট্য নিষ্প্রয়োজনীয়; বিদ্যা একটা বাড়াবাড়ি। গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন স্থূল জীবনোপায় উৎপাদনের (প্রোডাক্‌শন) শিক্ষাই শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথ জানতেন বৈজ্ঞানিক উৎপাদন-শিক্ষাই শিক্ষার ভিত্তি; কিন্তু উৎপাদনেই শিক্ষার শেষ নয়; সংস্কৃতিতে, সৃষ্টিতে (ক্রিয়েশন্) শিক্ষার সার্থকতা। একথা বললেই যথেষ্ট হবে—রবীন্দ্রসংস্কৃতির একটা প্রধান রূপ শ্রীনিকেতন এবং রাশিয়ার শিক্ষাক্ষেত্রের প্রচেষ্টা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমাজ-পুনর্গঠন, রবীন্দ্রনাথের বিচারে পরম শ্রদ্ধার বিষয়, বহুলাংশে অনুকরণীয়, এদেশেও পরীক্ষণীয় (এ বিষয়ে 'রাশিয়ার চিঠি'র উক্তিসমূহ সুবিদিত)।

শ্রীযুত হালদারের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় নীচের উদ্ধৃতিটুকু থেকে পাওয়া যাবে:

"...রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন মানবসত্তা মূলত একটা আধ্যাত্মিক সত্তা (দ্রষ্টব্য—মানুষের ধর্ম)। তাই তা এত বড় সত্য যে তার আত্মবিকাশের জন্য অর্থানুকূল্যের বিশেষ প্রয়োজন নেই। হয়তো তিনিও অর্থকে জীবন-শিল্পরচনায় প্রয়োজনীয় মনে করতেন—বিশ্বভারতীর জন্য এই রূঢ় সত্য তাঁর পক্ষে ভুলবার তো উপায় ছিল না। তিনিও হয়তো জানতেন—সভ্যতায় তার ইতিহাসে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতিও একসময়ে ছিল না; এবং লিবারাল্ সভ্যতার স্বীকৃতি পাওয়া গেলেও পৃথিবীতে এখনো শতকরা পঁচানব্বইটি মানুষই মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত, সত্তার স্বাধিকারহীন, অধিকাংশ জাতি যেমন শোষিত ও আত্ম-অধিকারশূন্য। শুধু তাই নয়, মানি-নেক্‌সাসের ঘূর্ণিতচক্রে শতকরা এই পঁচানব্বইটি মানুষের ব্যক্তিত্ব যেমন নিষ্পেষিত, সত্তা মূর্ছিত, বাকি পাঁচটি মানুষের ব্যক্তিত্বও তেমনি আত্মভ্রষ্ট, সত্তা কেন্দ্রচ্যুত। (এ বোধ তাঁর রাশিয়া থেকে লেখা কোন কোন পত্রে পরিষ্কার)। যতক্ষণ সভ্যতা ধনাশ্রয়ী, সভ্যতা মুনাফা-শিকারী, ততক্ষণ মানুষ আত্মদ্রোহী, মানবতাও ব্যাহত-বিকাশ। এ সত্যে সম্পূর্ণরূপে আস্থাশীল হ'তে পারলে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-স্বাধীনতার নীতি 'সোশ্যালিষ্ট পার্সোনালিটি' বা সামাজিক ব্যক্তি বিকাশের প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হত—তাঁর শিক্ষানীতি আর একটি উন্নততর স্তরে এসে পৌছত; হয়তো তিনি অনুভব করতেন—অধিকারবিহীন মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে প্রধানতম শিক্ষালয় হচ্ছে শ্রেণীসংগ্রাম।"

গান্ধীজির শিক্ষাদর্শ ও জাকীর হুসেন পরিকল্পনা

সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্যবিপণির একধারে
নিঃশব্দচরণ
আনিল বণিকলক্ষ্মী সুড়ঙ্গপথের অন্ধকারে
রাজসিংহাসন।
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি
নিল চুপে চুপে।
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী
রাজদণ্ডরূপে।[১]

ভারতে ইংরেজ শাসন আরম্ভের কলঙ্কময় ইতিহাস আজ সুবিদিত। এ অসদুপায়-লব্ধ রাজ্যশাসনের প্রয়োজনই দেশে ইংরেজী শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলনের মূল কারণ ছিল। একথা অনস্বীকার্য যে ইংরেজী শিক্ষা আমাদের বহু উপকার করেছে কিন্তু আমাদের কল্যাণকামনায় এ শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত হয়নি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। "...এই গোলামীর দেশে রাষ্ট্রশক্তি শিক্ষাবিস্তারের কোন চেষ্টা করে নাই বরং অশিক্ষা ও কুশিক্ষাকে কায়েম রাখিবার জন্যই নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছে।...রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু রাখিবার জন্য তখন তাঁহাদের প্রয়োজন হয় ইংরেজী ভাষা জানা একদল কেরানীর, এই বিশেষ উদ্দেশ্যে শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইল একদল কেরানী সৃষ্টির কাজে।" লর্ড হেলী স্বীকার করেছেন যে ব্রিটিশ শাসনাধীনে অশিক্ষা দূরীকরণ সমস্যার সমাধান সফল না হওয়ার কারণ হচ্ছে কোম্পানীর আমলে তাঁরা শিক্ষার বুনিয়াদ গড়তে সুরু করলেন ভুল দিক থেকে (began at the wrong end)। কোম্পানী-সরকারের প্রয়োজন হয়েছিল শাসনযন্ত্রের নিম্নস্তরে কিছু ইংরেজী-জানা কাজের লোকের, কাজেই স্বভাবতঃ তাঁদের চিন্তা প্রধানতঃ উচ্চশিক্ষা সম্পর্কেই আবদ্ধ ছিল, প্রাথমিক শিক্ষার কথা তাঁরা চিন্তা করেননি। কাজেই এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হয়েছে আগে। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা বহুকাল অবহেলিতই হয়ে থাকে।[২] অবশ্য এমন কোন কোন শাসকও ছিলেন যাঁরা

---

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শিবাজী উৎসব

২ শ্রীমতী লাবণ্যলতা চন্দ—বুনিয়াদী শিক্ষা ও বাংলাদেশের বিবরণ

বস্তুতই বিশ্বাস করতেন যে ইংরেজী শিক্ষা দিয়ে এই অসভ্য দেশবাসীকে তাঁরা "অন্ধকার হইতে আলোকে" নিয়ে যাচ্ছেন, এই অমানুষদের মানুষ করে তুলছেন। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজী শিক্ষা দিয়ে এমন একদল 'ভদ্র' 'সভ্য' 'মানুষ' তৈরী করে তুলবেন যারা আচারে, অভ্যাসে, চিন্তায় পুরাপুরি 'সাহেব' হয়ে উঠবে, যদিও তাদের গায়ের রংটাই থাকবে বাদামী। বলাই বাহুল্য এঁরা সকলেই এ দেশের শিক্ষা, সভ্যতা ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে শুধু অজ্ঞ ছিলেন না, পরম অশ্রদ্ধাশীল ছিলেন। পরাধীনতা রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেই একটা দেশকে পঙ্গু করে না, তা দেশের আত্মাকে পর্যন্ত কলুষিত করে। যদিও স্বার্থের খাতিরে মানুষ এ শিক্ষা-পদ্ধতিকে মেনে নিয়েছিল, কিন্তু এর প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ দেশের লোক অনুভব করেনি। আজ দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও তাই ইংরেজের ভাষার প্রতিও দেশের যুবকরা বীতরাগ। যাঁরা চিন্তাশীল, যাঁরা দেশপ্রেমিক তাঁরা শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণেই গোলামীর অবসানের জন্যে আন্দোলন করেন নি, তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন ইংরেজ আমাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকেও নিষ্প্রাণ ক'রে দেশের আত্মার অপমৃত্যু ঘটাচ্ছে। তাই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সর্বনাশা আধিপত্যের (cultural conquest) বিরুদ্ধেও দেশপ্রেমিকরা লড়াই করেছেন।

সে জন্যে স্বদেশী যুগের বোমা-রিভলভারের লড়াই-এর সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা চলেছে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ গঠন ক'রে দেশের আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়ার —এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করা যা সরকারী আওতার ও সরকারী হস্তক্ষেপের বাইরে থেকে দেশের যুবকদের 'দেশী' আদর্শে শিক্ষা দেবে। সে জাতীয় পরিষদ একদিন যে সামান্য আয়োজন করেছিলেন তার একটি ফল আমরা আজ দেখতে পাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে।

এরপর অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজির আহ্বানে সহস্র সহস্র বিক্ষুব্ধ যুবক 'গোলামখানা' ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিল। গান্ধীজি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "১৯২০ সালে যুবকদের আমি আহ্বান করেছিলাম 'গোলামখানা'— অর্থাৎ তাদের স্কুল-কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে...আমি তাদের এ উপদেশ দিয়েছিলাম যে গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে বইপত্রের শিক্ষালাভ করার চেয়ে স্বাধীনতার জন্যে নিরক্ষর থেকে রাস্তার পাথর ভাঙাও অনেক ভাল..."[৩] তখন

---

৩ M. K. Gandhi, *My Expriments with Truth*, p. 462

দেশনেতারা বুঝেছিলেন স্কুল-কলেজ বর্জনের শুদ্ধ নেতিবাচক পদ্ধতি নিষ্ফল হবে—যদি না সঙ্গে সঙ্গে 'জাতীয়' আদর্শে গঠিত বিদ্যালয় স্থাপন করা যায় এবং নূতন করে জাতীয় আদর্শ ও প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাপদ্ধতি সংস্কার না করা যায়। বাস্তবিকপক্ষে ক্ষণিক উত্তেজনার ফলে শহরে ও গ্রামে তখন শত শত 'জাতীয় বিদ্যালয়' গড়ে উঠলেও অচিরেই সেগুলি বন্ধ হয়ে গেল। তার কারণ সরকারী বিরুদ্ধতা ছাড়াও এ বিদ্যালয়গুলি সুচিন্তিত কোন প্ল্যান্ অনুযায়ী গঠিত হয়নি। এগুলি প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিরই মোটা খদ্দরের পোশাকে আবৃত সংস্করণ মাত্র ছিল। বাঙলা ও সংস্কৃত একটু বেশী জোর দিয়ে পড়ানো হোত,—কিছু স্বদেশী গান হোত আর হোত কিছু কিছু সুতোকাটা। কোথাও কোথাও তাঁত বোনারও আয়োজন ছিল। এ জাতীয় বিদ্যালয়ে পাস করে জীবিকা অর্জনের উপায় হোত না, আর এ বিদ্যালয়গুলির আর্থিক বুনিয়াদও ছিল নিতান্ত দুর্বল—সহৃদয় দেশবাসীর ভিক্ষার উপরই ছিল এদের নির্ভর। তথাপি এ নিষ্ফল প্রচেষ্টার পেছনেও মহৎ আদর্শের প্রেরণা ছিল, তাই তা নিষ্ফল হলেও অশ্রদ্ধেয় ছিল না।

তখন থেকে ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধীজি নেতৃত্ব নিয়েছিলেন। তিনি কোন সমস্যাকেই বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি। তাই এ সময় থেকে দেশের শিক্ষা-সমস্যাও তাঁর গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। অবশ্য ইতিপূর্বেও দক্ষিণ আফ্রিকা থাকাকালে নিজ সন্তানদের শিক্ষাদান সম্পর্কে এবং এর পরে টলষ্টয় আশ্রমের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান উপলক্ষ্যে তিনি এ বিষয়ে অনেক চিন্তা ও অনেক পরীক্ষা করেছেন। তিনি ছিলেন কর্মযোগী, তাই সমস্ত চিন্তাকেই কর্ম ও পরীক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই করে গ্রহণ করাই ছিল তাঁর রীতি। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর যে চিন্তা তাতেও এ রীতির ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি নিজে লিখেছেন, "আমার পরীক্ষাসমূহ সম্বন্ধে কোন প্রকার সম্পূর্ণতার আরোপ আমি করিতেছি না। বৈজ্ঞানিক যেমন অতিশয় নিয়মের সহিত, বিচারপূর্বক ও সূক্ষ্মভাবে নিজের পরীক্ষাসমূহ সম্পন্ন করিয়াও তাহা হইতে প্রাপ্ত পরিণামকে অন্তিম পরিণাম বলিয়া গণ্য করে না, যে ফল লাভ করিয়াছে তাহাই সত্য এ সম্বন্ধে সন্দেহ না করিলেও সে বিষয়ে নির্বিকার থাকে, আমার পরীক্ষাসমূহ সম্বন্ধেও আমি সেই ভাবই পোষণ করি।...আমি যে বস্তু দেখিয়াছি তাহার প্রত্যেকটিই ত্যাজ্য অথবা গ্রাহ্য এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া লইয়াছি এবং যাহা গ্রাহ্য বলিয়া বুঝিয়াছি সেই অনুযায়ী আচরণ করিয়াছি। এই ভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম যতক্ষণ

আমার বুদ্ধিকে এবং আত্মাকে সন্তুষ্ট রাখিবে ততক্ষণ আমি যে পরিণামকে লক্ষ্য করিয়া কাজ করি, তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব।" [৪]

গান্ধীজির শিক্ষানীতি (বা যে-কোন নীতি) আলোচনা কালে একথাটি স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

আর একটি কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন। এ অত্যাশ্চর্য মানুষটির সমস্ত চিন্তা, কর্ম ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটি সুষম সমগ্রতা ও সম্পূর্ণতা বর্তমান। তাঁর ব্যক্তিত্ব জীবন্ত ও গতিশীল কিন্তু তার প্রাণকেন্দ্রে আছে ধ্রুব সত্যের অসংশয় স্থিতি। তিনি কি শুধু রাজনীতিক্ষেত্রেই ভারতের মুক্তি-আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন? ভারতের আত্মার দিব্য প্রকাশ এই মানুষটি। ভারতের সমগ্র জীবনের দুঃখ ও বেদনাকে তিনি অন্তরের মধ্যে অনুভব করেছেন, ভারতের সনাতন আদর্শ ও মহত্ত্বে তিনি বিশ্বাস করেছেন, সমগ্র জীবনের সাধনাকে একটি স্থির কেন্দ্রে সংহত করেছেন। এই ধ্রুব আদর্শ ও স্থির কেন্দ্রকেই তিনি বলেছেন সত্য, অহিংসা—ঈশ্বরোপলব্ধি। শুধুমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলন, শুধুমাত্র শিক্ষাসংস্কার গান্ধীজির কাছে অকিঞ্চিৎকর অর্থহীন। তাঁর সমস্ত আন্দোলন, সমস্ত সংস্কার সমস্ত পরীক্ষা তাই সত্যেরই প্রয়োগ। তাই তাঁর আত্মজীবনীকে তিনি বলেছেন 'সত্যের ক্ষেত্রে আমার পরীক্ষা' My Experiments with Truth. তিনি লিখেছেন, "ভারতবর্ষকে কেবল ইংরেজের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিতে আমি আগ্রহশীল নহি। ভারতবর্ষকে সকল রকম দাসত্ব হইতে মুক্ত করিতেই আমি আগ্রহান্বিত···স্বরাজ আন্দোলন আমার নিকট আত্মশুদ্ধিরই আন্দোলন।" আবার লিখেছেন, "এই ত্রিশ বৎসর যাবৎ যাহা আমি লাভ করিতে চাহিয়াছি, যাহার জন্য আমি চেষ্টা করিয়াছি, যাহার জন্য আমি আকুলিত হইয়াছি, তাহা হইতেছে আত্মোপলব্ধি—ভগবৎ সাক্ষাৎকারলাভ, মোক্ষপ্রাপ্তি। এই লক্ষ্য অনুসরণই আমার জীবন, আমার কর্ম, আমার অস্তিত্ব। আমি যাহা কিছু বলি, যাহা কিছু লিখি, রাজনীতিক্ষেত্রে আমার সমস্ত প্রচেষ্টা এই একই লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত।" [৫]

গান্ধীজি সত্যেরই অনুসন্ধান করেছেন—সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্যেই তাঁর আজীবন সাধনা। বিদেশী শাসন ও শোষণের তিনি উচ্ছেদ চেয়েছেন তার কারণ এ নয় যে বিদেশীকে তিনি ঘৃণা করতেন। তিনি এর উচ্ছেদ চেয়েছেন কারণ

[৪] M. K. Gandhi, *The Harijan*, 1930

[৫] " " *My Experiments with Truth, Intr.*, pp. 4-5

তিনি বিশ্বাস করেছেন এ শাসন ও শোষণ মিথ্যা ও হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি শুধু বিদেশী শাসনেরই অবসান চাননি, তিনি চেয়েছেন সমগ্র পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার অবসান। তাঁর কাছে হিংসা শুধু যুদ্ধ, কলহ, পশুহনন মাত্র নয়—তাঁর কাছে হিংসার অর্থ আরও অনেক ব্যাপক। যারা অন্যের শ্রমের ফল ভোগ করে, যারা নিজ শ্রম দ্বারা উৎপাদন করে না, তারাও হিংসার পাপে লিপ্ত। তাই বর্তমান পাশ্চাত্ত্য-আদর্শ-চালিত পরাশ্রয়ী সমাজ-ব্যবস্থা গান্ধীজির চোখে পাপ—অন্যায়, মিথ্যাচার। তাই এ সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন তিনি চেয়েছেন। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামকেই সভ্যতার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ বলে মনে করেছে, তাই সে সমাজ-ব্যবস্থায় লোভ ও হিংসা প্রবল হয়ে উঠেছে। তার লোভের পরিতৃপ্তির জন্যে,আরামের আয়োজনের জন্যে, সে যন্ত্রের আবিষ্কার করেছে, প্রয়োজন বাড়িয়ে তুলেছে, তুমুল প্রতিযোগিতামূলক উপকরণবহুল জটিল ও অশান্ত জীবন-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। এ যন্ত্রের ফলে এসেছে ফ্যাক্টরী, পুঁজিবাদ, দরিদ্রের শোষণ ও অর্থের পূজা, যুদ্ধ, কলহ, পৃথিবীব্যাপী অশান্তি, ভয়, অবিশ্বাস ও উন্মত্ততা।

ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শ এ মিথ্যা ও হিংসার সম্পূর্ণ বিরোধী। গান্ধীজি সর্বান্তঃকরণে ভারতীয় আদর্শে বিশ্বাসী, তাই তিনি চেয়েছেন ভারতীয় আদর্শে সমাজকে গঠন করতে। তিনি খোলাখুলিভাবেই 'সনাতনী', কারণ তিনি জেনেছেন এ আদর্শই মানবের সত্য আদর্শ।* তিনি বিদেশীকে ঘৃণা ক'রে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাবর্জনের পক্ষপাতী নন। তাঁর চিন্তা ও কর্ম নেতিবাচক নয়। গান্ধীজি 'হিন্দ-স্বরাজ' গ্রন্থে লিখেছেন, "মানুষের মন চঞ্চল পাখীর মত; সে যত পায় ততই চায়, কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না। আমরা কামনার যতই ইন্ধন জোগাই তত বেশী তাহা অসংযত হইয়া পড়ে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাহার একটা সীমা নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন সুখ মানসিক

* সুবিখ্যাত দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ সত্যই বলেছেন, "Ghandhiji belongs to the race of prophets who have the courage of the heart, courtesy of the spirit and the laughter of the unafraid. Through his life and teachings he bears testimony to the values for which this country has stood for ages—faith in the spirit, respect for its mysteries, the beauty of holiness, the acceptance of life's obligations, the validity of character,—values which are neither national nor international but universal.—Probhu & Rao, *The Mind of Mahatma Gandhi,* Foreword by S. Rhadhakrishnan.

অবস্থার উপর নির্ভর করে। বড়লোক হইলেই সুখী ও দরিদ্র হইলেই অসুখী হইবে, এমন নহে। বরং দেখা যায় বড়লোকেরা প্রায়ই অসুখী, দরিদ্ররাই অনেক সময় সুখী।...এই সব দেখিয়া আমাদের পূর্বপুরুষেরা বিলাসিতা ও সুখান্বেষণ হইতে দূরে থাকিবার নির্দেশ দিয়াছেন...যন্ত্র আবিষ্কারের বুদ্ধি তাঁহাদের ছিল না এমন নহে। তবে তাঁহারা জানিতেন যদি আমরা এই সব তুচ্ছ প্রয়োজন মিটাইতে আত্মনিয়োগ করি, তাহা হইলে আমরা আধ্যাত্মিক গুণ হারাইয়া বাসনার দাস হইয়া পড়িব। তাঁহারা তাই অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করেন, যাহা আমাদের নিজের হাতে-পায়ের সাহায্যে করিতে পারি তাহাই শুধু করা উচিত। তাঁহারা নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন যে, আমাদের প্রকৃত সুখ ও স্বাস্থ্য নির্ভর করে আমাদের হাত-পায়ের উপযুক্ত ব্যবহারে।"[৬] 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকার আর একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, "প্রয়োজন বাড়াইয়া তুলিয়া এবং তাহা মিটাইবার জন্য যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া পৃথিবী যে তাহার লক্ষ্যের কাছাকাছিও পৌঁছিতেছে এ বিশ্বাস আমার নাই...উন্মত্তের মত দূরত্ব ও সময় সংক্ষেপের যে চেষ্টা হইতেছে তাহাকে আমি আন্তরিকভাবে ঘৃণা করি; অনুরূপভাবেই ঘৃণা করি অভাব বাড়ানো এবং এই অভাব মিটাইবার জন্য পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত উপকরণ সংগ্রহের চেষ্টাকে।"[৭]

গান্ধীজি ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শকে সত্য বলিয়া সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেন বলেই এ আদর্শ স্থাপনের উদ্দেশ্যে কোন মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে তিনি প্রস্তুত নন। তাই কম্যুনিষ্টদের মত হিংসা ও রক্তপাতের পথে এ আদর্শ প্রতিষ্ঠায় তিনি এতটুকুও আগ্রহান্বিত নন। কারণ তাঁর মতে হিংসার পথ মিথ্যার পথ। বাইবেলের মত তিনিও মনে করেন, "যাহারা অসি গ্রহণ করে, অসির আঘাতেই তাহাদের অবসান হয়।" গান্ধীজির সামাজিক বিপ্লবের আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা কালে শ্রীমান নারায়ণ আগরওয়াল বলেছেন, "যেহেতু পরিকল্পনা সামাজিক উদ্দেশ্য লাভের একটি উপায় মাত্র, সেইজন্য গান্ধীজি কিছুতেই হিংসানীতি অবলম্বন করিবেন না। যদি উহা শেষ লক্ষ্য হয় তবুও তিনি একথা স্বীকার করেন না যে, লক্ষ্যই পথের যাথার্থ্য স্থির করে, উদ্দেশ্যের পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য, উহা লাভার্থ যে উপায় অবলম্বন করা হয়, তাহাও পবিত্র রাখিতে হইবে। তাই গান্ধীজি বলেন যে

[৬] M. K. Ghandhi, *Hind Swaraj*, pp. 87-88

[৭] M. K. Ghandhi, *Young India*, 17. 3. 27

সমাজতান্ত্রিক সমাজ আনিতে হইলেও অহিংসানীতি অবলম্বন করা উচিত। রক্তাক্ত বিপ্লবের সাহায্যে উহা স্থাপন করা উচিত নহে।"[৮] গান্ধীজির কথার প্রতিধ্বনিই আমরা শুনতে পাই হ্যারল্ড ল্যাস্কির 'গ্রামার অব্ পলিটিক্স' ও 'স্ট্র্যাটেজী অব ফ্রীডম্' গ্রন্থে। ল্যাস্কি বলেছেন, "আমরা বিশ্বাস করি গণতান্ত্রিক উপায়ে যে সমাধানে পৌছা যায়, তাহা জোর-জবরদস্তির সাহায্যে যে সমাধান তার চেয়ে অধিক স্থায়ী।"[৯] "আধুনিক জগতে বলের পিছনে অধিকার থাকা চাই, যদি তা স্থায়ী করতে হয়। ইয়োরোপের মানুষ যে আধ্যাত্মিক গুণের অধিকারী তা তারা সীজার বা নেপোলিয়নের নিকট হতে পায় নাই, তা পেয়েছে যিশু খ্রীষ্টের নিকট হতে। প্রাচ্যের সভ্যতা চেংগিস্ খাঁ বা আকবর অপেক্ষা বহুলাংশে বুদ্ধদ্বারা প্রভাবান্বিত। যদি আমরা বাঁচতে চাই তবে আমাদের এই সত্যটি শিখতে হবে। প্রেম দিয়ে ঘৃণা জয় করতে হবে, ভাল দিয়ে মন্দ দূর করতে হবে। নীচতা নীচতারই সৃষ্টি করে।"[১০] তাই ল্যাস্কি সশস্ত্র বিপ্লবের পরিবর্তে, 'সম্মতি দ্বারা বিপ্লব' (Revolution by consent)-এর কথা বলেছেন।

হিংসাভিত্তিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা অর্থকেই সমস্ত জীবনের কাম্য, সমস্ত মূল্যের মান ব'লে গ্রহণ করেছে। যে অর্থ ছিল শুধু বিনিময়ের মাধ্যম, তাই হয়ে উঠেছে সর্বপ্রধান পণ্য, আর এই অর্থদৈত্যের সর্বনাশা প্রভুত্বে সমস্ত পৃথিবীর শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। গ্রীক্ উপকথার নার্সিসাসের মত আধুনিক সভ্যতা নিজ ঐশ্বর্যের দ্যুতির প্রেমে পাগল হয়ে ছুটেছে। এর ফলে বিত্তবান্ হচ্ছে অধিকতর বিত্তশালী আর দরিদ্র হচ্ছে দরিদ্রতর। ক্র্যাব্ একটি কবিতায় এ ভাবটি চমৎকার প্রকাশ করেছেন ঃ

ঐশ্বর্য যখন হেসে ওঠে, তখন কয়েকজন মাত্র সে প্রসাদ কুড়িয়ে নেয়,
আর অগণিত যারা ঐ ভাণ্ডারের দিকে তাকিয়ে থাকে মাত্র
অথচ তার আস্বাদন পায় না
তারা তো খনির ভেতর গর্ত খুঁড়ে যারা মরে
সেই ক্রীতদাসের মত
চারদিকের ঐশ্বর্যের আলো তাদের
অন্ধকার দারিদ্র্যকে দ্বিগুণতর অন্ধকার ক'রেই তোলে।

৮ শ্রীমান্ নারায়ণ আগরওয়াল, গান্ধী পরিকল্পনা, পৃ. ২৭-২৮
৯ Harold Lasky, *Strategy of Freedom*
১০ „ „ *Grammar of Politics*, p. 237

ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অর্থদাসত্ব সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টোর বিবৃতি এখানে উদ্ধৃত করা যায়—"উৎপাদন, বিনিময় আর অর্থসম্পদ নিয়ে পুঁজিবাদী সমাজ যে বিরাট উৎপাদন ও বিনিময়-যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেছে তাকে তুলনা করা যেতে পারে সেই যাদুকরের সঙ্গে, যে নরক থেকে জাগিয়ে এনেছে বিকট দৈত্যকে, যাকে আর সে শাসনাধীনে রাখতে পারছে না।"[১১]

এ বিষয়ে গান্ধীজির দৃষ্টি অত্যন্ত স্বচ্ছ। তিনি জেনেছেন এ পাপ ও সর্বনাশের অবসান হতে পারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনে। আমাদের আবার নূতন ক'রে গ্রহণ করতে হবে ভারতের প্রাচীন সনাতন আদর্শকে। গান্ধীজির মনে এ নিয়ে এতটুকুও সংশয় নেই যে ভারতের সরল জীবনের আদর্শই মানবজীবনে শান্তির একমাত্র পথ। যতদিন মানুষ মৈত্রেয়ীর মত বলতে না পারবে "যেনাহং নামৃতা স্যাম্ তেনাহং কেন কুর্যাম্"—"যা আমাকে অমৃতের অধিকার এনে দেবে না তা দিয়ে আমি কী করব?" ততদিন মানুষ তুচ্ছ সাংসারিক সুখের মোহে জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ, অন্তরের শান্তিকে হারাবে।

বর্তমান যুগে গান্ধীজির মত রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছিলেন, "সঞ্চয়ের পর সঞ্চয় বাড়িয়ে লাভ কী? শব্দের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িয়ে দিলে আমরা কর্কশধ্বনি ছাড়া আর কিছু পাই না। সুর পেতে হলে শব্দকে সংহত করে সুরের লহরীতে আনতে হবে।"[১২]

পাশ্চাত্ত্য জগতেও এ প্রাচীন পন্থা মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। বারট্রাণ্ড রাসেল্ বলছেন, "যদি সমাজতন্ত্রের পত্তন হয় তা হ'লে তা তখনই প্রকৃত উপকারে আসবে যদি তা অর্থের বিনিময়ে কেনা যায় না এমন দ্রব্যকে মূল্যদান করে এবং তা লাভ করতে চেষ্টা করে।"[১৩] একজন আধুনিক মহিলা দার্শনিক লিখেছেন, "বর্তমানকালে খুব কম লোকই এমন পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে যা তাদের আধ্যাত্মিক পুষ্টি দান করে। আমরা ক্রমেই প্রকৃতিকে বশ করছি কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে সামান্য কিছুই আমরা পাচ্ছি যাকে আমরা আত্মার আত্মীয় বলে দাবী করতে পারি। আমাদের জীবনের প্রকৃত মূল্যবোধ আমরা হারিয়েছি—আমাদের কর্মও তাই মূল্যহীন—তা পূজার অঙ্গ নয়।"[১৪]

---

১১ *The Communist Manifesto*

১২ *Thoughts from Tagore*

১৩ B. Russell, *Roads to Freedom*

১৪ Susan Langer, *Philosophy in a New Key, Introduction*

গান্ধীজি যে সরল জীবনের আদর্শে বিশ্বাসী, তার ক্ষেত্র নগর নয়, গ্রাম। নগর তো শ্রমবিমুখ বুদ্ধিজীবীদের শোষণের কেন্দ্র, তার সঙ্গে মাটির যোগ নেই, মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতির যোগ নেই। গান্ধীজি যে শাসনহীন শ্রেণীহীন সমাজ-জীবন স্থাপনের জন্মে আজীবন সাধনা করেছেন, তার কেন্দ্র হবে স্বয়ংপূর্ণ, পঞ্চায়েৎ-পরিচালিত সরল সহযোগিতা-ভিত্তিক কর্মমুখর গ্রাম। নগর-সভ্যতায় সম্পদ ও ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কয়েকজন সৌভাগ্যবানের হাতে কেন্দ্রীভূত। গান্ধী-পরিকল্পিত গ্রাম-সভ্যতায় সম্পদ ও শক্তি বিকেন্দ্রীকৃত—সমাজের সর্বস্তরে সুবন্টিত। তাই গান্ধীজি যখন শিক্ষাসংস্কারের কথা চিন্তা করেছেন তখন এমন একটি পরিকল্পনাই তিনি করতে চেয়েছেন যা সেই আদর্শের পরিপোষক। গান্ধীজি এমন একটি গ্রাম-কেন্দ্রিক কর্মভিত্তিক সম্পূর্ণ দেশীয় প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার কথাই চিন্তা করেছেন যা সরকারী প্রভাব ও পরিচালনার ওপর নির্ভর করবে না, যা দেশের প্রয়োজনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, যা দেশের দরিদ্র আপামর সাধারণের বিনামূল্যে শিক্ষার ভার নেবে এবং যা আত্মনির্ভর, সহ-যোগিতায় বিশ্বাসী, নিপুণ, সরল, সন্তুষ্ট, কর্মঠ ও বুদ্ধিমান সম্পূর্ণ মানুষ সৃষ্টি করবে। যাকে বলা হয় 'নঈতালিম' বা বুনিয়াদী শিক্ষা বা ওয়ার্ধা পরিকল্পনা, তার মূল উৎস গান্ধীজির সৃজনধর্মী কল্যাণকর চিন্তাধারায়। গান্ধীজি তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে এক জায়গায় বলছেন, "আমি চাই শিক্ষার মধ্যে দিয়ে শিশুর হাতের নিপুণতা, বুদ্ধির তীক্ষ্নতা ও আত্মার শক্তি বিকশিত হবে। বর্তমান শিক্ষায় হাত অবশ হয়ে যায়—আত্মার বিকাশ সম্পূর্ণ অবহেলিত থাকে।"

দেশপ্রেমিক এবং শিক্ষাব্রতী যাঁরা তাঁরা ইংরেজের শিক্ষাব্যবস্থা যে দেশের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম নয়, বরং এ শিক্ষা দেশের পক্ষে হানিকর ও অপমানজনক একথা অনেকদিন থেকেই বলছিলেন। গান্ধীজি বলেছিলেন, "বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা অলীক ও একটা ফাঁদ বিশেষ (a delusion and a snare)…। আমি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত, এ শুধু অপচয়কর নয়—উপরন্তু হানিকর ; এ শিক্ষার ফলে অধিকাংশ ছাত্রই তাহাদের পিতামাতা, সংসার ও তাদের মৌলিক জীবিকা থেকে বিচ্যুত হয়। তারা বদ্‌অভ্যাস আয়ত্ত করে, নিজেদের 'শহুরে' বলে ভাবতে শেখে, আর দু'চার পাতা বুলি যা শেখে তা আর যাই হোক শিক্ষা নয়।"

শ্রীমসরুওয়ালা এ শিক্ষার আর একটি মারাত্মক ত্রুটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে এ ব্যবস্থায় উচ্চতম শিক্ষা সম্পূর্ণ করেও

ছাত্ররা কি করে ভবিষ্যতে জীবিকা উপার্জ্জন করবে সে সম্বন্ধে তাদের মনে কোন স্পষ্ট ধারণা থাকে না। নিতান্ত অন্ধ ও উদ্দেশ্যহীন ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা এবং তা পেরিয়ে কলেজ বা বিশ্ব বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ ক'রে যখন ছাত্রেরা পাস ক'রে বেরোয় তখন তারা সংসারক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিঃসহায়। "জীবনের বৃদ্ধির শ্রেষ্ঠ কুড়ি বৎসর এমন অন্ধ ও উদ্দেশ্যহীন ভাবে কাটানোর ফলে ছাত্রদের দীর্ঘসূত্রতা, অস্থিরমতিত্ব, জীবনের সমস্যার ক্ষেত্রে সবল স্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার অক্ষমতা মজ্জাগত হয়ে পড়ে।"

যখন কংগ্রেস প্রদেশগুলির শাসনভার গ্রহণ করলেন তখন সমগ্র দেশের উপযোগী একটি নূতন শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের কথা বিশেষ ভাবে উঠল। ১৯৩৭ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে গান্ধীজির উপদেশ অনুযায়ী যাতে একটি সত্যিকার জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রণীত হয় সে জন্যে ডাঃ জাকীর হুসেন ও শ্রীআর্যনায়কম্‌কে একটি বোর্ড গঠন ক'রে এ সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত শিক্ষাবিধি প্রণয়ন করবার ভার দেওয়া হয়। তখনই বুনিয়াদী শিক্ষার (Basic education) মূলসূত্রগুলিও নির্দেশ ক'রে দেওয়া হয়। হরিপুরা কংগ্রেসে শিক্ষা সম্বন্ধে প্রস্তাবটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাচ্ছে—

"১৯০৬ সাল হইতেই কংগ্রেস জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়া আসিতেছে এবং অসহযোগ আন্দোলনের সময় কংগ্রেসের উদ্যোগে বহু জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। কংগ্রেস জনগণের উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার উপর বিশেষ জোর দিয়া থাকেন এবং কংগ্রেসের মতে সমস্ত জাতীয় উন্নতি মূলতঃ সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষার পদ্ধতি, বিষয় ও উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে ভারতের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি ব্যর্থ হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য সময়োপযোগী নহে এবং ইহা শিক্ষাকে অল্পসংখ্যক মানুষের জন্য শুধু সীমাবদ্ধ করিয়া দেশের বৃহত্তর জনসংখ্যাকে নিরক্ষর করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং সম্পূর্ণ নূতন ভিত্তির উপর শিক্ষাকে সমগ্র জাতির উপযোগী করিয়া পুনর্গঠন করা নিতান্ত প্রয়োজন। যেহেতু কংগ্রেস এখন দেশের সেবার ও দেশের শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার এবং জাতীয় আদর্শে শিক্ষাকে প্রভাবান্বিত করিবার নূতন সুযোগ পাইতেছে তখন ইহা খুবই আবশ্যক যে এ শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের মূল নীতিগুলি কি তাহা নির্ধারিত হয় এবং সেগুলি সফল করিয়া তুলিতে কি কি পদক্ষেপ প্রয়োজন তাহাও নির্ধারিত হয়। কংগ্রেসের ইহাই অভিমত যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে যে বুনিয়াদী শিক্ষাদান করা হইবে তাহা নিম্নলিখিত কয়টি নীতির অনুযায়ী হইবে :—

১। সমগ্র দেশের জন্য সাত বৎসরব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা বিনা বেতনে দেওয়া হইবে এবং ইহা আবশ্যিক হইবে।

২। মাতৃভাষা অবশ্যই শিক্ষার বাহন হইবে।

৩। এই শিক্ষা সম্পূর্ণ ভাবে কোন প্রকারের উৎপাদনধর্মী হাতের কাজকে কেন্দ্র করিয়া দিতে হইবে। এই হাতের কাজটি শিশুর পরিবেশ বিবেচনা করিয়া বাছিতে হইবে এবং শিক্ষায় সমস্ত স্তরের বিকাশই এই হাতের কাজ হইতে উদ্ভূত হইবে এবং সমস্ত শিক্ষাদানই যথাসাধ্য এই কর্মের মাধ্যমে এই কর্মের সঙ্গে সুসংহত করিয়া দিতে হইবে।

সুতরাং কংগ্রেসের এই মত যে প্রাথমিক বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য একটি সর্বভারতীয় শিক্ষাবোর্ড স্থাপিত হউক। এ বিষয়ে অবিলম্বে অগ্রসর হইবার জন্য গান্ধীজির পরামর্শ ও পরিচালনায় ডাঃ জাকীর হুসেন এবং শ্রী ই. আর্যনায়কম্‌কে এইরূপ বোর্ড গঠনের ভার প্রদান করিতেছে। তাঁহারা জাতীয় বুনিয়াদী শিক্ষার একটি সম্পূর্ণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন এবং যাঁহারা প্রাদেশিক বা বেসরকারী শিক্ষার পরিচালনা করেন তাঁহাদের অনুমোদন ও গ্রহণের জন্য এই পরিকল্পনা প্রেরণ করিবেন।"

* * * *

১৯৩৭ সালের ২২শে ও ২৩শে অক্টোবর ওয়ার্ধাতে জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে উপরের তিনটি মূল সূত্রের সঙ্গে আর একটি সূত্র যোগ করা হয়ঃ

৪। সম্মেলন এ আশা রাখে যে এই শিক্ষা-ব্যবস্থা দ্বারা ক্রমশঃ শিক্ষকের মাহিনা কুলাইয়া যাইবে।

ডাঃ জাকীর হুসেনকে সভাপতি করে ও নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে জাতীয় শিক্ষা-কমিটি (ডাঃ জাকীর হুসেন কমিটি) গঠিত হয়েছিল ঃ

সদস্যগণ :—

কে. গুলাম সৈদায়ন	কিশোরীলাল মসরুয়ালা
কে. টি. শাহ্	জে. সি. কুমারাপ্পা
বিনোবা ভাবে	শ্রীকৃষ্ণদাস যাযু
কাকা কালেলকর	শ্রীমতী আশা দেবী

আহ্বায়ক—ই. ডব্লউ. আর্যনায়কম্

এ কমিটি গান্ধীজির পরামর্শ অনুযায়ী যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষার বিভিন্ন দিক এবং বিস্তারিত পাঠক্রম বিবেচনা করেন এবং একটি সাত বৎসর-ব্যাপী বুনিয়াদী শিক্ষার খসড়া পরিকল্পনা তৈরী করে ২.১২.৩৭ তারিখে গান্ধীজির কাছে রিপোর্ট দাখিল করেন।

সেখানে সভাপতি ডাঃ জাকীর হুসেন গান্ধীজিকে লিখেছিলেন, "আমরা আমাদের নিজেদের ও যে রিপোর্ট দাখিল করছি, তার ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন। আমাদের নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি সীমাবদ্ধ এবং সময়ও ছিল নির্দিষ্ট, তাই এর চেয়ে উৎকৃষ্ট রিপোর্ট তৈরী আমরা করতে পারিনি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি আমরা সূতাকাটা ও তাঁতবোনা এ দুটি হস্তশিল্প সম্বন্ধে বিস্তৃত পাঠক্রম তৈরী করতে পেরেছি। যদি সময় পাওয়া যেত তবে আমাদের ইচ্ছা ছিল অন্যান্য হস্তশিল্প সম্বন্ধেও অনুরূপ পাঠক্রম তৈরী করা। কারণ এ ধারণা আমরা জন্মাতে চাই না যে অন্যান্য যে সব হস্তশিল্পের অনুরূপ বা অধিকতর শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্ভাবনা আছে তাদের আমরা সমান মূল্য দেই না।"

জাকীর হুসেন রিপোর্ট ছাপা হয়ে যখন প্রকাশিত হয় গান্ধীজি তার মুখবন্ধে লিখেছিলেন—"ডাঃ জাকীর হুসেন ও তাঁর কমিটি যাকে নামকরণ করেছেন বুনিয়াদী জাতীয় শিক্ষা (Basic National Education) সে সম্বন্ধে প্রকাশিত পুস্তিকার প্রথম একহাজার খণ্ড বিক্রয় হয়ে যাওয়াতে এটা বোঝা যায় এ শিক্ষা-পরিকল্পনা ভারতে ও তার বাইরে যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। এ পরিকল্পনার সঠিক নামকরণ সম্ভবত হওয়া উচিত 'গ্রাম্য হস্তশিল্পের মাধ্যমে গ্রাম্য জাতীয় শিক্ষা' যদিও এ নামকরণ তাদৃশ আকর্ষণীয় বিবেচিত হবে না। 'গ্রাম্য' এ কথা দিয়ে, তথাকথিত উচ্চশিক্ষা অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে 'জাতীয়' কথাটি সত্য ও অহিংসার দ্যোতক। এবং 'গ্রাম্য ও হস্তশিল্পের মাধ্যমে' মানে এই পরিকল্পনার রচয়িতারা এই শিক্ষার শিক্ষকদের কাছ থেকে এটা প্রত্যাশা করেন যে তাঁরা বাইরের বাধানিষেধমুক্ত পরিবেশে উপযুক্ত কোন গ্রাম্য হস্তশিল্পের মধ্য দিয়ে এমন শিক্ষা দিতে সমর্থ হবেন যাতে গ্রামের শিশুদের সমস্ত বৃত্তি ও ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিকাশলাভ করবে। এ দিক থেকে বিচার করলে এ ব্যবস্থা গ্রামের ছাত্রদের শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচনা করছে। এ ব্যবস্থা কোন ভাবেই পশ্চিম থেকে আমদানী নয়। এ পরিকল্পনাটি প্রস্তুত করতে দেশে শ্রেষ্ঠ কয়েকজন শিক্ষাবিদ তাঁদের অবিভক্ত মন নিয়োগ

করেছেন এবং এ পরিকল্পনার পাঠকেরা উপরের ক'টি কথা মনে রাখলে এ পরিকল্পনাটির মর্মোদ্ঘাটনে অধিকতর সমর্থ হবেন।"

* * * *

প্রথমেই নূতন শিক্ষাপদ্ধতির মূলনীতি আলোচিত হয়েছে। বলা হয়েছে—"অতীতে এই (ইংরেজী) শিক্ষা জাতীয় জীবনের প্রয়োজন ও আগ্রহ মেটাতে সক্ষম হয়নি এবং তার শক্তি ও গতিকে কল্যাণাভিমুখী করতেও চেষ্টা করেনি। বর্তমানে…পরিবর্তিত পরিবেশে বাস্তব প্রয়োজন মিটাতে এ শিক্ষা সম্পূর্ণ অসমর্থ এবং এর পশ্চাতে কোন প্রাণপ্রদ ও গঠনাত্মক আদর্শও বর্তমান নেই। এ শিক্ষায় ব্যক্তি সমাজের সজীব সহযোগী ও উৎপাদনক্ষম অঙ্গ হিসাবে গড়ে উঠে না। তাই এ শিক্ষার ফলে ব্যক্তি আত্মনির্ভর, নিপুণ ও সমাজ-জীবনে অভ্যস্ত কর্মী হিসাবে গঠিত হয় না। বর্তমানের প্রতিযোগিতা-ভিত্তিক শোষণ ও হিংসাত্মক সমাজব্যবস্থার পরিবর্তে শিক্ষার দ্বারা সাগ্রহ সহযোগিতা-ভিত্তিক সুষ্ঠু নূতন সমাজ-জীবনের আদর্শের দ্বারা এ ব্যবস্থা উদ্বুদ্ধ নয়।…কাজেই এ শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্যে সব দিক থেকেই দাবী উঠেছে।…ভারতবর্ষের জীবন পশ্চিমের জীবন থেকে বিভিন্ন, তাই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থারও মৌলিক প্রভেদ থাকবে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-ব্যবস্থার থেকে।…সুতরাং আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুরা শিখবে হিংসার উপরে অহিংসার শ্রেষ্ঠত্ব।

গান্ধীজি…ভারতীয় প্রতিভার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এমন শিক্ষাব্যবস্থা আবিষ্কার করেছেন যা স্বল্পকালের মধ্যে দেশের আপামর সাধারণের প্রথমিক শিক্ষার সমস্যা কার্যকরী ভাবে সমাধান করতে সক্ষম। তাঁর শিক্ষার মূলনীতি হচ্ছে… এ শিক্ষার মাধ্যম হবে কোন হস্তশিল্প বা উৎপাদন-কর্ম, যা হবে বিদ্যালয়ে সমস্ত শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। এ শিক্ষা নিপুণভাবে শিক্ষা দিলে ছাত্রদের উৎপন্ন দ্রব্যের দাম থেকেই শিক্ষকদের বেতন ইত্যাদি কুলিয়ে যাবে। তা হ'লেই রাষ্ট্র অবিলম্বে বিনামূল্যে (free) এবং আবশ্যিক (compulsory) বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচলন করতে পারবে। **তা না হলে দেশের বর্তমান** রাজনৈতিক ও আর্থিক অবস্থায় শিক্ষার ব্যয় এত অধিক হবে যে রাষ্ট্রের পক্ষে তা বহন করা অসম্ভব হবে।

শিল্পকর্মকে কেন্দ্র করে শিক্ষাদান কেন?

আধুনিক অগ্রসর শিক্ষাবিদেরা এ বিষয়ে একমত যে শিশুদের পক্ষে

গঠনকর্ম-কেন্দ্রিক শিক্ষাই সর্বশ্রেষ্ঠ। এ শিক্ষার মধ্য দিয়েই সব চেয়ে সফলভাবে শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সম্ভব।

মনস্তত্ত্বের দিক থেকে একথা বলা যায় যে শিশুর স্বাভাবিক কর্মচাঞ্চল্য শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এটাই মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ। তার হাতদুটি সর্বদাই কাজ করবার জন্যে অস্থির। এই শিক্ষায় বুদ্ধি ও ক্রিয়ার সম্পূর্ণ ও সজীব সমন্বয় ঘটে। শুধু বই পড়তে শেখা, আর দু' আঁচড় লিখতে শেখা সত্যিকারের শিক্ষা নয়—সেটা শিক্ষার ভান মাত্র।... শিক্ষায় কাজের মধ্য দিয়ে জীবন্ত শিক্ষা যেটা লাভ হবে সে হচ্ছে সমস্ত ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ শিক্ষা (the literacy of the whole personality)।

সমাজকল্যাণের দিক থেকে এ শিক্ষায় শিশু অন্য সমস্ত শিশুর সহযোগিতায় এমন উৎপাদন-কর্মে রত হবে যা সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত। এতে করে 'দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ' এই সুস্থ সামাজিক মনোবৃত্তি গড়ে উঠবে এবং জাতিভেদ ও শ্রেণীভেদের কুফল দূর হবে। এতে 'যারা খেটে খায়' আর 'যারা বুদ্ধি বেচে খায়' এ দুইএর মধ্যে যে অশুভ বিভেদ আছে তা দূর হবে। আর হাতের কাজের মধ্যে দিয়েই যখন সব শিক্ষা লাভ করতে হবে তখন শ্রমের প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদা শিশুকাল থেকেই শিশুরা বুঝতে শিখবে।

অর্থনীতির দিক থেকে বিবেচনা করলে এ শিক্ষা উপযুক্তভাবে দিতে পারলে দেশের কর্মীদের নিপুণতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে দেশকে সমৃদ্ধতর করবে এবং এ শিক্ষায় দক্ষ ছাত্রেরা কাজে স্বভবতঃই আনন্দ পাবে এবং তাদের অবসর সময়কে নিজেদের পছন্দমত কাজে ব্যয় করে লাভবান হতে শিখবে এবং আনন্দলাভ করবে।

বিশুদ্ধ শিক্ষাবিদের দৃষ্টিতে যে শিক্ষা ফলপ্রসূ কোন শিল্পকর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে তা সার্থক, কারণ তা শিক্ষণীয় বিষয়কে ছাত্রের মনে সজীব করে তোলে।

দুটি প্রয়োজনীয় উপদেশ

প্রথমতঃ এ শিক্ষা সফল করতে হলে শিল্পকর্মটি সযত্নে বেছে নিতে হবে। সেই শিল্পকর্মই বাছতে হবে, যাকে কেন্দ্র করে সম্পূর্ণ শিক্ষাদান সম্ভব। মানুষের মৌলিক জৈবপ্রয়োজনের সঙ্গে এ শিল্পকর্মটি স্বাভাবিক ও নিবিড়ভাবে সংযুক্ত

থাকতে হবে।...এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য নিতান্ত যান্ত্রিকভাবে উৎপাদনে সক্ষম নিপুণ কর্মী সৃষ্টি নয়। এর উদ্দেশ্য শিল্পকর্মটির মধ্যে যে সমগ্র শিক্ষার সম্ভাবনা আছে তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার। এর অর্থ হচ্ছে শিল্পকর্মের দ্বারা উৎপাদনই শুধু বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয় নয়, এই শিল্পকর্ম অন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষার মূল হবে, এবং সমস্ত শিক্ষা-প্রণালীকে উদ্বুদ্ধ করবে। এ শিক্ষার মধ্যে জোর দিতে হবে 'দশে মিলি করি কাজ' এ মনোবৃত্তি গঠনের উপরে, সুব্যবস্থা করতে শেখার (planning) উপরে এবং নির্ভুলতা ও সম্পূর্ণতার উপরে। গান্ধীজি তাই বলেছেন, "আজকাল এ শিল্পকর্মগুলি যেমন অন্ধ ও যান্ত্রিক ভাবে শেখানো হয়, এ শিক্ষাব্যবস্থায় তা না করে, বৈজ্ঞানিকভাবে শিক্ষা দিতে হবে, অর্থাৎ যে শিশু এ কাজটি শিখছে তা কেন ও কি ভাবে করতে হবে তাও যেন সে বুঝতে পারে।" এর জন্যে শিশুকে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে সব জিনিস বুঝতে উৎসাহ দিতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ এ নূতন শিক্ষা নূতন স্বাধীন দেশের সুনাগরিক সৃষ্টির সহায়ক হবে। এ শিক্ষার মধ্যে দিয়ে প্রকৃত গণতন্ত্রের মনোভাব গড়ে তুলতে হবে—প্রত্যেক ছাত্র সমাজের প্রতি নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে যাতে সচেতন হয়, সহযোগী সমাজক্ষেত্রে নিজ মূল্য যাতে সে বুঝতে পারে, যাতে সে স্বাবলম্বী ও অ-পরনির্ভর হয়, যাতে সমাজ-প্রয়োজনে উৎপাদনের সে উৎসাহী অংশভাগী হয়, সে দিকেই প্রধান দৃষ্টি রাখতে হবে।...এ শিক্ষার উদ্দেশ্য হতে হবে এমন সব গঠনকর্মী সৃষ্টি যারা সমাজের সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজকে—এমন কি মেথরের কাজকেও—শ্রদ্ধার চোখে দেখবে এবং সমাজ-প্রয়োজনে সকল রকম কাজই করতে ইচ্ছুক ও সক্ষম হবে। তাদের বুদ্ধিবৃত্তির এমন বিকাশ ঘটবে যে কোন অবস্থায়ই নিজেদের অসহায় মনে করবে না।

বর্তমানে বিদ্যালয় ও সমাজ-জীবনের মধ্যে যে কৃত্রিম ও অশুভ বিভেদ বর্তমান তা দূর হবে।

অর্থাৎ এই নূতন শিক্ষাবিধির উদ্দেশ্য হওয়া চাই শিশুকাল থেকেই একটি সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গীতে ছাত্রদের অভ্যস্ত করা যেন শিশুকাল থেকেই সমস্ত ক্রিয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য সমাজসেবা এ বোধ তাদের মধ্যে জাগ্রত হয়। তা হ'লেই বৃহৎ একটি সৃষ্টির কাজে তাদেরও অংশ আছে এ বোধ তাদের শিক্ষাকে উৎসাহপূর্ণ ও আকর্ষণীয় করে তুলবে।"[১৫]

---

১৫ *Basic National Education* (Dr. Zakir Husain Committee Report)

এ শিক্ষায় ইংরেজীর স্থান নাই কেন ?

শিশুশিক্ষার স্বাভাবিক বাহন মাতৃভাষা এ কথাটি এমনই স্বতঃসিদ্ধ যে তা প্রকাশেরও অপেক্ষা রাখে না, অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজী ভাষা আমাদের শিশুদের মাথায় জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে আছে। এতে যে আমাদের লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়েদের সময় ও মস্তিস্কশক্তির বহু অপচয় হয় একথা বলাই বাহুল্য। এতে শিশুরা শিক্ষার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। ভাষা আয়ত্ত করতেই যে শিশুর ক্ষুদ্র শক্তি ক্ষয়িত হয়ে যাচ্ছে, সে সাহিত্য, বিজ্ঞানের রসবোধ করবে কি করে? রবীন্দ্রনাথ বহু বহু প্রবন্ধে শিক্ষার বাহনের এই নির্মম মূঢ়তা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। 'বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বস্তুত আধুনিক শিক্ষা ইংরেজী ভাষাবাহিনী বলেই আমাদের মনের প্রবেশপথে তার অনেকখানি মার যায়। ইংরেজী খানার টেবিলে আহারের জটিল পদ্ধতি যার অভ্যস্ত নয় এমন বাঙালীর ছেলে বিলেতে পাড়ি দেবার পথে পি. এণ্ড. ও. কোম্পানীর ডিনার কামরায় যখন খেতে বসে, তখন ভোজ্য ও রসনার মধ্যপথে কাঁটা-ছুরির দৌত্য তার পক্ষে বাধাগ্রস্ত বলেই ভরপুর ভোজের মাঝখানেও ক্ষুধিত জঠরের দাবী সম্পূর্ণ মিটতে চায় না। আমাদের শিক্ষার ভোজেও সেই দশা,—আছে সবই অথচ মাঝপথে অনেকখানি অপচয় হয়ে যায়।"[১৬]

অন্যত্র কোন সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষ্যে তিনি বলেছেন—

"Learing loses its vitamins if strained through a foreign language."

এই ইংরেজী ভাষার চাপের ফলে যে অপচয় ঘটে তার উদাহরণস্বরূপ শ্রীযুক্তা চন্দ লিখেছেন, "প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা সাধারণত কি দেখি? প্রথমে পাঠ্যবিষয় আমরা মাতৃভাষায় পড়ি, তারপর আবার একই বিষয়, একই পড়া ইংরেজী ভাষায় অধ্যয়ন করি, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পঞ্চমশ্রেণী (Class V) পর্যন্ত আমরা এতদিন বাংলায় পাটিগণিতে যে গণিতশিক্ষা পাইয়া আসিয়াছি, তাহা বলিতে গেলে প্রবেশিকার সম্পূর্ণ কোর্স; চতুর্থ শ্রেণী হইতে (Class IV) প্রথম শ্রেণী (Class X) পর্যন্ত পাটীগণিতের একই বিষয় পুনরায় পড়ানো হয়, শুধু তফাৎ হইতেছে ইংরেজী সংখ্যা ও ইংরেজী ভাষায়। ইতিহাস-ভূগোলের

১৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বিশ্ববিদ্যালয় পৃষ্ঠা ৭

ব্যাপারও ঠিক এমনই…। ইহাতে হিসাব করিলে দেখা যায় যে, সাম্প্রতিক ব্যবস্থায় যে পাঠ্যবিষয় বিদ্যার্থীদের এগারো বৎসরে পড়ানো হয়, তাহা ইংরেজী বাদ দিলে সুষ্ঠুভাবে সাত বছরে পড়ানো সম্ভব।"[১৭]

"এই বুনিয়াদী শিক্ষার সময়কাল সাত বৎসর। ছেলেমেয়েরা সাত বৎসর হইতে চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে এ শিক্ষা সমাপ্ত করিবে। এই সময়কালের মধ্যে বিদ্যার্থীকে প্রচলিত ব্যবস্থায় ইংরেজী প্রভৃতি প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যন্ত যে জ্ঞান দেওয়া হয়, তাহা দেওয়া হইবে। চলতি ব্যবস্থায় এগারো বৎসরের পাঠ্যবস্তু তাহাকে সাত বৎসরে দেওয়া সম্ভব হইবে।"[১৮] "সাত হইতে চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ বুনিয়াদী শিক্ষাকালে ছাত্রছাত্রীদের কোন বৈদেশিক ভাষা শিক্ষার প্রশ্নই উঠে না। উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষাকালে বিদ্যার্থী ইচ্ছা করিলে ইংরেজী শিক্ষা করিতে পারিবে, এবং সেই অধ্যয়ন সত্যকার আনন্দপ্রসূ হইবে।"[১৯]

নূতন শিক্ষাপ্রণালীর ব্যয় সম্বন্ধে আত্মনির্ভরশীলতা

এই নূতন শিক্ষাপরিকল্পনার রচয়িতারা মনে করেন, যে বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকেরা যা উৎপাদন করবেন, তা থেকে বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার মেটানো সম্ভব হবে। সুতাকাটা ও কাপড়বোনাকে শিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ গ্রহণ করলে বিদ্যালয়ের পরিচালনের ব্যয়নির্বাহ সম্ভব হবে, এটা হিসাব করে দেখা গেছে। অবশ্য গান্ধীজির পরামর্শমত এ পরিকল্পনার রচয়িতারা এটা ধরে নিচ্ছেন, বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ব্যয় গ্রামবাসীরা স্বেচ্ছায় বহন করবেন এবং "রাষ্ট্র যদি বিদ্যালয়ের উৎপন্ন দ্রব্য (ভারতীয় কাটুনী সংঘ কর্তৃক নির্দিষ্ট মজুরী অনুযায়ী) ক্রয় করিবার দায়িত্ব নেয় তাহা হইলে এ বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি অবশ্যই আত্মনির্ভর হইতে পারে।"[২০]

এ নিয়ে বহু সমালোচনা হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান কথা হচ্ছে এতে ছাত্রের ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিকাশের আদর্শ ভুলে গিয়ে শিক্ষকেরা ছাত্রদের নিপুণ কারিগর ক'রে গড়ে তুলবার দিকেই মন দেবেন বেশী। এবং সব চেয়ে আপত্তিকর কথা হচ্ছে, বিদ্যালয়ের আয় বাড়াবার উদ্দেশ্যে শিক্ষকেরা ছাত্রদের নির্মমভাবে খাটাবেন।

---

১৭ শ্রীমতী লাবণ্যলতা চন্দ—বুনিয়াদী শিক্ষা ও বাংলাদেশের বিবরণ, পৃষ্ঠা ৯
১৮ " " " " " " " পৃঃ ৮
১৯ " " " " " " " পৃঃ ১২
২০ M. K. Gandhi, *Harijan* July 31, 1937.

এ সমালোচনা যে একেবারে অলীক নয় এ সম্বন্ধে পরিকল্পনা রচয়িতারা যথেষ্ট অবহিত। তাঁরা লিখেছেন, "এখানে একটা বিপদ সম্বন্ধে সাবধানতার বাণী উচ্চারণ করা প্রয়োজন। স্পষ্টতই এ বিপদ আছে যে এ পরিকল্পনাকে রূপ দিতে গিয়ে এর আর্থিক দিকটার উপরই বেশীটা জোর দেওয়া হবে এবং এ শিক্ষার সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার প্রধান দিকটা অবহেলিত হবে। শিক্ষকেরা ছাত্রদের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী কতটা কাজ আদায় করা যায় সে দিকেই বেশী মন দেবেন এবং শিল্পকর্মের মাধ্যমে শিক্ষার যে বুদ্ধিবিকাশ, সামাজিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী বিকাশ ইত্যাদি প্রধান উদ্দেশ্য অবহেলিত হবে। **শিক্ষক-শিক্ষণকালে** এ বিষয়টি সর্বদা মনে রাখতে হবে। এবং এ শিক্ষার পরিচালনা ও পরিদর্শনের ভার যাঁদের উপর, তাঁদের এ নূতন শিক্ষার আদর্শ-সম্বন্ধে সর্বদা অবহিত থাকতে হবে।"[২১]

এ কথা সহজেই বোধগম্য যে এ শিক্ষার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে সমাজসেবার আদর্শে বিশ্বাসী গ্রাম্য সরল জীবনে অভ্যস্ত কর্মীর ও বুদ্ধিমান্ শিক্ষক কর্মীর উপরে। তাই এ শিক্ষাদর্শ কার্যকরী করতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষণ।

সাতবৎসর ব্যাপী বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১। **কেন্দ্র শিল্পকর্ম**—পূর্বেই বলা গেছে যে শিক্ষা এমন হস্তশিল্প কেন্দ্র করে দিতে হবে যা জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনের সঙ্গে সংযুক্ত, যাকে কেন্দ্র করে সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ববিকাশোপযোগী শিক্ষা দেওয়া যায়, যা শিশুদের সাধ্যায়ত্ত এবং যে শিল্পকর্মকে ভবিষ্যৎ জীবনে জীবিকার্জনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করা যাবে।

কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করে নিম্নলিখিত কয়টি শিল্প উপযুক্ত মনে করা হয়।

(ক) সুতা কাটা ও কাপড় বোনা;

(খ) কাঠের কাজ;

(গ) কৃষি;

(ঘ) ফল ও সব্জীর চাষ;

(ঙ) চামড়ার কাজ;

(চ) এমন কোন শিল্প যা স্থানীয় বা ভৌগোলিক কারণে গ্রহণীয়।

যে কোন শিল্পকর্মই গৃহীত হোক না কেন, জীবনের প্রাথমিকতম প্রয়োজনের

---

[২১] *Basic Natianal Education*, p. I5

সঙ্গে সংযুক্ত দুটি কর্ম, যথা—কৃষি ও বয়ন (সুতাকাটা সহ) সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান ও যোগ্যতা, এবং স্থানীয় প্রয়োজন সম্বন্ধে ধারণা, প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই অর্জন করতে হবে।

২। মাতৃভাষা

মাতৃভাষা সমস্ত শিশুশিক্ষার স্বাভাবিক ভিত্তি। এর মাধ্যমেই শিশুর বুদ্ধি, কল্পনা, রুচি ওনীতিবোধের সম্যক্ বিকাশ সম্ভবপর এবং এর মধ্যে দিয়েই শিশু আত্ম প্রকাশের শ্রেষ্ঠ আনন্দের স্বাদ পায়। সাত বছরে এইমাতৃভাষা শিক্ষার লক্ষ্য হবেঃ

(ক) শিশুর চারদিকের স্বাভাবিক পরিবেশের দ্রব্যাদি ও তাদের গঠন সম্বন্ধে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে আলাপ আলোচনা করতে পারা। এ ক্ষমতার ক্রমশঃ পরিণতি হবে ঃ

(খ) প্রাত্যহিক ও বর্তমানকালের আগ্রহসঞ্চারী ঘটনাসমূহ পরিষ্কারভাবে সুসংলগ্নভাবে ও যথোপযুক্তভাবে বর্ণনার ক্ষমতায়,

(গ) খবরের কাগজ ইত্যাদি নীরবে পড়ে দ্রুত তার অর্থগ্রহণের ক্ষমতায়,

(ঘ) গদ্য বা পদ্য উচ্চৈঃস্বরে নির্ভুলভাবে প'ড়ে আনন্দ পাওয়ার ক্ষমতায় (সাধারণত একঘেয়েভাবে সুর করে পড়বার অভ্যাস দূর করতে হবে),

(ঙ) সূচীপত্র দেখে পুস্তকের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ধারণা, অভিধান ব্যবহারের ক্ষমতায় এবং পাঠাগারে পুস্তক-পুস্তিকা, সংবাদপত্র থেকে সংবাদ জানবার ও আনন্দ পাওয়ার ক্ষমতায়,

(চ) পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে মোটামুটি নির্ভুলভাবে দ্রুত লিখবার ক্ষমতায়,

(ছ) প্রাত্যহিক ঘটনা অথবা গ্রামের সভাসমিতির বিবরণী সহজ সরল ভাষায় লিখবার ক্ষমতায়,

(জ) সহজ ব্যক্তিগত বা ব্যয়সায়গত চিঠিপত্র লিখবার ক্ষমতায়,

(ঝ) প্রসিদ্ধ লেখকদের লেখবার সঙ্গে মোটামুটি পরিচয়লাভ ও তা থেকে জ্ঞান ও আনন্দলাভের ক্ষমতায়।

৩। অঙ্ক

বিদ্যালয়ের শিল্পসংক্রান্ত অথবা সমাজের বা সংসারের পরিমাপ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত অঙ্ক ও জ্যামিতির সাধারণ প্রণালীগুলির সঙ্গে পরিচয়। ছোট ব্যবসায়ের হিসাবপত্র রাখবার ক্ষমতা যাতে হয়, সে পর্যন্ত শিক্ষাদান এ শিক্ষার লক্ষ্য।

৪। **সমাজনীতি**

(ক) সমগ্র মানবজাতি, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের মানুষদের সামাজিক উন্নতি সম্বন্ধে আগ্রহসৃষ্টি এ সব আলোচনার লক্ষ্য হবে ঃ

(খ) তার চারদিকের সমাজের সমস্যা ও ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে কৌতূহল সৃষ্টি সমাজের উন্নতি বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি ;

(গ) দেশপ্রেম উদ্বোধন, দেশের অতীত সম্বন্ধে শ্রদ্ধা, এবং প্রীতি, সত্য ও অহিংসাভিত্তিক ভবিষ্যৎ সমাজসৃষ্টি সম্বন্ধে আগ্রহ ;

(ঘ) নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে চেতনার বিকাশ ;

(ঙ) প্রতিবেশী ও সমাজের কল্যাণপ্রসূ ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণাবলীর আলোচনা ;

(চ) পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা জাগরণ।

এ লক্ষ্যে পৌছতে হলে ছাত্রদের দেশের ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিজ্ঞানের সাধারণ সূত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। মহাপুরুষ, ধর্মনেতা, প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জীবনকাহিনী সম্বন্ধে নীচের শ্রেণীতে সাধারণভাবে আলোচনা ও উপরের শ্রেণীতে ভাবগত আলোচনা করতে হবে। তাদের গ্রামের বা দেশের বা তাদের জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে সংযুক্ত পরিচিত ব্যক্তিদের জীবন আলোচনার মধ্য দিয়ে শিশুদের উৎসাহ জাগিয়ে তুলতে হবে। সমস্ত দেশের ও ধর্মের মূলগত ঐক্যের কথাটি তাদের কাছে বিশেষ করে তুলে ধরতে হবে। হিংসা, ঘৃণা, অহংকার উদ্রেক করে এমন আলোচনা সযত্নে পরিহার ক'রে, যাতে সর্বসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তেমন ভাবে শিক্ষা দিতে হবে।

এ বিষয়ে আলোচনার মধ্যে সংক্ষেপে সমগ্র পৃথিবীর এবং পূর্ণতরভাবে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বিবরণ শিক্ষা দিতে হবে। এ সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও পাঠ্য ও আলোচনা-তালিকাভুক্ত হবে ঃ

(ছ) দেশের ও বিদেশের গাছপালা, জন্তু ও বিভিন্ন জাতীয় মানুষের বিবরণ ;

(জ) আবহাওয়া সম্বন্ধে আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ ;

(ঝ) ম্যাপ দেখা ও ম্যাপ আঁকতে শেখা ;

(ঞ) পরিচিত নানা শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পরিবহন ও সংবাদ প্রেরণ প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা ;

(ট) বিভিন্ন জীবিকা ও শিল্প, সেগুলির ভৌগোলিক অবস্থান, গুরুত্ব, পারস্পরিক সম্বন্ধ ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান।

৫। সাধারণ বিজ্ঞান

সাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ এবং সে সব ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ; এ বিষয়ে উৎসাহ ও আনন্দ সৃষ্টি। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকদের জীবন-কাহিনী এবং তাঁদের আবিষ্কারসমূহ আলোচনা-সূত্রে নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ইত্যাদি গুণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ।

এর মধ্যে থাকবে ঃ

প্রকৃতি-পরিচয়—(ক) পরিচিত পরিবেশে পাছপালা, পশুপাখী ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ ;

(খ) ঋতু পরিবর্তন এবং শস্য ও পশুপ্রাণীর উপর এ পরিবর্তনের প্রভাব লক্ষ্য করা ও আলোচনা করা ;

(গ) বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন শস্যাদির সঙ্গে পরিচয়।

উদ্ভিদবিজ্ঞান

(ক) উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ এবং প্রত্যেক অংশের কার্য আলোচনা ;

(খ) উদ্ভিদের জন্ম, বৃদ্ধি ও প্রজনন ক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা ;

(গ) বিদ্যালয়ের চতুষ্পার্শ্বের উদ্যানে হাতে-কলমে কাজ—যাতে বিভিন্ন বীজ, সার ও জল, উত্তাপ, আলো ইত্যাদির প্রভাব সম্বন্ধে নির্ভুল ও আনন্দময় জ্ঞানলাভ হয়।

প্রাণিতত্ত্ব

মানুষের বন্ধু ও শত্রু নানাপ্রকার পোকা-মাকড়, সরীসৃপ ও পাখী সম্বন্ধে আলোচনা।

শারীরবিজ্ঞান

মানবদেহ ও তার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব

(ক) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়—দাঁত, জিহ্বা, নখ, চুল, নাক, ত্বক্ ও পরিধেয় পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা ও উপায় শিক্ষা ;

(খ) গৃহ ও গ্রামের পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা ও উপায় শিক্ষা—মলমূত্রাদি অপসারণ ও স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবহার শিক্ষা ;

(গ) বিশুদ্ধ পানীয় জলের প্রয়োজনীয়তা ও প্রাপ্তির উপায়, স্বাস্থ্যপ্রদ কূপ খনন শিক্ষা ;

(ঘ) বিশুদ্ধ বায়ু—এ বিষয়ে বৃক্ষের কাজ, শ্বাসপ্রশ্বাসের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শিক্ষা।

(ঙ) খাদ্য—বিশুদ্ধ ও দূষিত খাদ্যের লক্ষণ—সুষম স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্যবিষয়ে আলোচনা ;

(চ) ফার্ষ্ট এড্ ও সহজ কয়েকটি চিকিৎসা শিক্ষা ;

(ছ) ছোঁয়াচে রোগ—সাবধানতা ও নিবারণের উপায় আলোচনা ;

(জ) স্বাস্থ্যরক্ষার সহায়ক হিসাবে সদাচারের প্রয়োজনীয়তা ও আচরণ শিক্ষা।

দেহচর্চা

ব্যায়াম, দেশী খেলাধূলা ও ড্রিল।

রসায়ন

বায়ু, জল, অম্ল, ক্ষার, লবণ ইত্যাদি সম্বন্ধে রাসায়নিক জ্ঞান।

জ্যোতির্বিদ্যা

বিভিন্ন গ্রহনক্ষত্র পরিচয় এবং নক্ষত্রাদির সাহায্যে সময় ও দিক্ নির্ণয়।

গল্প

বৈজ্ঞানিক, দেশপর্যটন আবিষ্কারকদের জীবনকাহিনী ও আবিষ্কারের আলোচনা।

৬। **চিত্রাঙ্কন**

লক্ষ্য হচ্ছে—

(ক) চোখকে বর্ণ ও আকার নির্ভুল পর্যবেক্ষণে অভ্যস্ত করা ;

(খ) আকারের স্মৃতি মনে রাখবার ক্ষমতার বিকাশ ;

গ। প্রাকৃতিক ও শিল্পদ্রব্যের সৌন্দর্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ এবং সে সৌন্দর্য উপভোগের ক্ষমতার সম্যক বিকাশ ;

ঘ। রুচিপূর্ণ শোভন নক্সা ও কারুকার্যের অভ্যাস গঠন ;

ঙ। যে সমস্ত জিনিস বিদ্যালয়ে বা গৃহে ছাত্রেরা তৈরী করে তার মোটামুটি নক্সা আঁকাবার ক্ষমতার বিকাশ।

এ লক্ষ্য সাধনের উপায় হিসাবে—

ক। যে সব দ্রব্য শিশুরা দেখে, অথবা যে সম্বন্ধে তারা পড়ে, সে সব জিনিস আঁকতে শেখানো ;

খ। বিজ্ঞানপাঠ বা হাতের কাজের সঙ্গে যুক্ত ক'রে, পঠিত দ্রব্যাদির স্মৃতির সাহায্যে চিত্রাঙ্কন ;

গ। কল্পনার সাহায্যে নক্সা আঁকা শিক্ষা ;

ঘ। স্কেল অনুযায়ী, ছোট করে আঁকা, গ্রাফ্ আঁকা শিক্ষা।

৭। সঙ্গীত

লক্ষ্য হচ্ছে শিশুদের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ গান শেখানো এবং সঙ্গীতে আনন্দ পাওয়ার ক্ষমতার বিকাশ। শিশুর ছন্দের জ্ঞান স্বাভাবিক। গানের সঙ্গে সঙ্গে হাততালি দিয়ে এ স্বাভাবিক ছন্দবোধ বিকশিত করা উচিত। গানের সুরের সঙ্গে সঙ্গে পা মিলিয়ে চলাও এ কাজে লাগানো যেতে পারে।

৮। হিন্দুস্থানী

সমগ্র ভারতের ঐক্যজ্ঞাপক হিন্দুস্থানী ভাষার সঙ্গে যাতে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর পরিচয় ঘটে সেজন্যে এটা শিক্ষা আবশ্যিক করা হয়েছে। যেখানে হিন্দীই মাতৃভাষা সেখানের শিক্ষক ও ছাত্রদের উর্দু‌ও শিখতে হবে। হিন্দুস্থানী ভাষা যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের দানে সমৃদ্ধ এ বোধটি ছাত্রছাত্রীদের মনে জাগাতে হবে।

সাধারণভাবে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠক্রম ছেলে এবং মেয়েদের বেলায় একই। তবে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে মেয়েদের বেলায় বিজ্ঞানপাঠের পাঠক্রম কিছু কমিয়ে তাতে গার্হস্থ্যবিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে মেয়েদের কেন্দ্রীয় হস্তশিল্পের পরিবর্তে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে স্বাধীনতা দিতে হবে।[২১]

২১ *Basic National Education*, pp. 16-27.

পরিচালনা

সাত বৎসর বয়স থেকে শিক্ষা সুরু হবে কেন ?

আধুনিক শিক্ষাব্রতীদের সকলেরই প্রায় এই মত যে শিশু-শিক্ষা ৪।৫ বৎসরেই সুরু করা উচিত। কিন্তু এত অল্পবয়স্ক শিশুরা নিজের ভার নিতে অসমর্থ, এদের শিক্ষা দিতে হ'বে রক্ষণাবেক্ষণ, খাওয়ানো পরানো এবং নানা খেলা কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দিতে গেলে শিশু-ছাত্রাবাস ইত্যাদি বহু ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থার প্রয়োজন। উপযুক্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব। কাজেই বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা রচয়িতারা প্রথমতঃ আর্থিক কারণেই সাত বৎসর থেকে চৌদ্দ বৎসর শিক্ষার কাল নির্দেশ করেছেন। এই সাত বৎসরের শিক্ষা সম্পূর্ণ আবশ্যিক (compulsory) ও বিনা-মূল্যে (free) হবে। সম্ভবতঃ আমাদের গ্রামদেশে প্রথম শিক্ষার্থীদের বয়স সাত বৎসরের উর্ধ্বেই হবে। চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত প্রত্যেক ছেলেকেই এ শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। মেয়েদের বেলায় দেশের অনগ্রসর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী বিবেচনা করে, ১২ বৎসর পরেই মেয়েদের বিদ্যালয় থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া যেতে পারবে।

এ পরিকল্পনা রচয়িতারা অবশ্য চার বৎসর থেকে সাত বৎসর বয়স্ক শিশুদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনার জন্যে সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন। অধিকাংশ গৃহপরিবেশ শিশুদের সুশিক্ষার সম্পূর্ণ প্রতিকূল এবং বাল্যে মনের উপর যে গভীর ছাপ পড়ে তা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে অনেকাংশে প্রভাবান্বিত করে। সুতরাং দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সম্পর্কে রাষ্ট্রের দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না।

সুতাকাটাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেন্দ্রশিল্প হিসাবে গ্রহণ করা হয় কেন ?

তার কারণ হচ্ছে বস্ত্র মানুষের একটি প্রাথমিক প্রয়োজন, এবং এ শিক্ষাকে কেন্দ্র ক'রে একটি সম্পূর্ণ শিক্ষা দেওয়া সম্ভব, এর জন্য মূল্যবান্ যন্ত্রপাতির প্রয়োজন নেই, আর নিতান্ত ছোট শিশুও তক্লীতে অন্ততঃ সুতো কাটিতে পারে। তা ছাড়া আমাদের কৃষিপ্রধান দেশে কৃষকেরা বৎসরের অনেকটা সময় ঘরে বসে থাকতে বাধ্য হয়, যখন তাদের কোন আয় থাকে না। কিন্তু সুতাকাটা ও কাপড় বোনা শিখলে উপরন্তু আয় যা হতে পারে তা এই দরিদ্র দেশে নিতান্ত সামান্য নয়।

এ নয়া শিক্ষায় কোন বিষয়ে কতটা সময় দিতে হবে? (Routine)

প্রতিদিন সাড়ে পাঁচঘণ্টা বিদ্যালয়ের কাজ চলবে, তার মধ্যে—

কেন্দ্র-শিল্প	৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট
গান, অঙ্কন, অঙ্ক	৪০ "
মাতৃভাষা	৪০ "
সমাজনীতি ও সাধারণ শিল্প	৩০ "
দেহচর্চা	১০ "
অবসর	১০ "
	৫ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

বিদ্যালয়ে বৎসরে ২৮৮ দিন অর্থাৎ প্রতিমাসে গড়ে ২৪ দিন কাজ হবে, এ রকম হিসাব ধরা হয়েছে।

আরো কয়েকটি বিষয়ে উপদেশ

বিদ্যালয়ের শেষ দুই শ্রেণীতে অন্ততঃ, যত বিভিন্ন রকমের শিল্পকর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে ততই ভাল। এ শিল্পশিক্ষা যাতে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবিকার্জনের সহায়ক হতে পারে।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সঙ্গে বাগান, কৃষিকর্ম ও খেলাধূলার জন্যে মাঠ থাকা দরকার।

গ্রামের অধিকাংশ বালকবালিকাই যথেষ্ট খাদ্য পায় না। এতে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিবিকাশও ব্যাহত হয়। তাই যাতে ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে কিছুটা পুষ্টিকর খাদ্য পায় সে বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। এ বিষয়ে গো-পালন যেখানে সম্ভব, তা করা যেতে পারে।

এক এক শ্রেণীতে ছাত্রের সংখ্যা গড়ে ৩০ এর অনূর্ধ্ব হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এ বিদ্যালয়গুলির সাফল্য অনেকাংশে উপযুক্ত শিক্ষকের উপর নির্ভর করে। যাঁরা গান্ধীজির সরল গ্রাম্য সমাজ-জীবনের আদর্শে সত্যই বিশ্বাসী, যাঁরা ধৈর্যশীল, পরিশ্রমী, শিশুদের প্রতি স্নেহশীল, নির্ভীক, চরিত্রবান্ ও বুদ্ধিমান তাঁরাই কেবল শিক্ষক হিসাবে গৃহীত হবেন। শিক্ষক-শিক্ষণ ও শিক্ষক গ্রহণের ব্যাপারে যথেষ্ট সাবধান না হ'লে, পরিচালনা সফল হতে পারে না। নীচের শ্রেণীতে বিশেষতঃ, উৎকৃষ্ট শিক্ষক একান্ত প্রয়োজন। এ কাজে মেয়েরাও যাতে আকৃষ্ট হন, সে চেষ্টা বিশেষভাবে করতে হবে।

শিক্ষক-শিক্ষণের অনেক কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। শিক্ষকেরা সেখানে বসবাস করবেন। সেখানে জাতি, বর্ণ, ধর্মের কোন বিভেদ থাকবে না। এইসকল সমাজ-জীবনের মধ্য দিয়ে শ্রেণীহীন ও শোষণহীন সমাজের আদর্শে নিষ্ঠাবান্ কর্মী হিসাবে তাঁদের গড়ে উঠতে হবে।

শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্যে শিল্পকর্মে নিপুণ কারিগরদের সাহায্য নিতে হবে, এবং বিদ্যালয়ের কার্যে স্থানীয় কারিগরদের কাজে লাগাতে হবে।

ক্রমশঃ ব্যাপকভাবে অল্পদিনের জন্যে পুরোনো বিদ্যা ঝালিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা (Refresher courses) করতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষণকেন্দ্রের সঙ্গেই শিক্ষণের হাতে-কলমে পরীক্ষার জন্যে বিদ্যালয় (demonstration schools) থাকবে। সেখানে পাঠক্রম, শিক্ষণ-প্রণালী ইত্যাদি শিক্ষার নানা সমস্যা নিয়ে পরীক্ষা ও আলোচনার ব্যবস্থা থাকবে। এ বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা বিশেষভাবে শিক্ষিত হবেন এবং স্থানীয় বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে এগুলি আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্রস্বরূপ (Model school) হবে।

সর্বভারতীয় ভিত্তিতে যাতে এ পরিকল্পনা সফল হতে পারে, সে ব্যবস্থার জন্যে এবং যাতে শিক্ষার মান, পদ্ধতি, পরীক্ষা-ব্যবস্থা ইত্যাদি একই প্রকারের হতে পারে, যাতে বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রের ফলাফল বিবেচনা করে, নূতন পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ পদ্ধতির সর্বদা উন্নতি হতে পারে সে জন্যে বেসরকারী কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পরিচালক কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। বর্তমানে পরীক্ষা-পদ্ধতি আমূল পরিবর্তন করে ছাত্রদের কর্মকুশলতা, সমাজসেবা, নিষ্ঠা, বুদ্ধি বৈজ্ঞানিকভাবে বাছাই করবার ভার এ সব কেন্দ্রের উপর থাকবে এবং এরকম বাস্তব ভিত্তিতে ছাত্রদের উপরের শ্রেণীতে তোলা (Promotion) ইত্যাদির ভার এঁরাই নেবেন। মুখস্থ করে পরীক্ষা পাশের বর্তমান পদ্ধতি সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া হবে।

বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ, শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে গবেষণা, আলোচনা, পুস্তিকা প্রণয়ন, পুস্তিকা বিতরণ, এ শিক্ষার অগ্রগতি ও বিস্তার সম্বন্ধে চেষ্টা ও সবের দায়িত্বই এ সব কেন্দ্রের উপর ন্যস্ত থাকবে। যথাসম্ভব সরকারী প্রভাবমুক্ত থেকে, এঁরা নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে এ সব কর্তব্যে রত থাকবেন।

বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা এ পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষার কাজে হাত দেন। মধ্যপ্রদেশে এ পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠক্রম নির্বাচনের জন্যে একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। যুক্তপ্রদেশ এই পরিকল্পনাকে সরকারী শিক্ষানীতি হিসাবে গ্রহণ

করে। বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে পরীক্ষাসাপক্ষে কয়েকটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে বুনিয়াদি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। তৎকালীন দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে কাশ্মীরই প্রথম এ ব্যাপারে বাস্তব উৎসাহ দেখায় এবং বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার সঙ্গে প্রথম থেকেই যুক্ত অধ্যাপক কে. জি. সৈয়দায়নকে শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা নিযুক্ত করে এবং রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে বুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলা হয়। তিনটি জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—জামিয়া-মিল্লিয়া-ইসলামিয়া, অন্ধ্র জাতীয় কলাশালা, ও বেদচ্ছি স্বরাজ-আশ্রম, তিনটি শিক্ষণ শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। গুজরাট সেবা-গ্রামে অবশ্য প্রথম থেকেই এ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। এর মধ্যে বিহার, গুজরাট ও কাশ্মীরে এ বিদ্যালয়সমূহের সর্বাধিক প্রসার হয়। কিন্তু ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর বুনিয়াদী শিক্ষা বিশেষ বাধাপ্রাপ্ত হয়। অধিকাংশ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ই বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও বিহার, গুজরাট ও দিল্লীতে জামিয়া-মিল্লিয়া আদর্শে অবিচলিত থেকে বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। এদের কাজের ফলেই হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘ (বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় বেসরকারী জাতীয় প্রতিষ্ঠান) বহু মূল্যবান্ উপাদান সংগ্রহ করেন। বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে আগ্রহ, প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও নির্বাপিত হয়নি। শিক্ষাবিদ্‌দের দৃষ্টি অধিকতর পরিমাণে এ পরিকল্পনার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং এ সম্বন্ধে আলোচনা বিভিন্ন পত্রিকা, প্রবন্ধাদির মধ্য দিয়ে চলতে থাকে। বিভিন্ন শিক্ষা সম্মেলনে এ পরিকল্পনার গুণাগুণ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড (Central Advisory Board) দেশে বুনিয়াদী শিক্ষার বিস্তার ও এর শিক্ষানীতি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিবেচনা ক'রে এর মূলনীতিগুলি মোটামুটি গ্রহণ করেন। কিন্তু এ শিক্ষার স্বয়ং-নির্ভরতার আদর্শ গ্রহণযোগ্য নয় ব'লে তাঁরা মনে করেন। ভারত সরকারের শিক্ষা-উপদেষ্টা স্যার জন্ সারজেণ্ট ১৯৪৪ সালে শিক্ষাসম্মেলনের মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞান শাখার সভাপতি হিসাবে ওয়ার্ধা পরিকল্পনার এই দিকটাকে অবাস্তব ব'লে সমালোচনা করেন। তিনি মনে করেন এ শিক্ষার ব্যয়ভার শিক্ষক ও ছাত্রদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে কিছুতেই নির্বাহ হতে পারে না। বড়জোর অতিরিক্ত যে সব উপাদান ও

২২ Sir John Sargent, *Presidential Address*, Psychology & Educational Science Section, 1944.

সরঞ্জামের (চরকা, তকলী, তূলা ইত্যাদি) দাম উঠে আসতে পারে। গান্ধীজি এর উত্তরে তাঁর দৃঢ় মত প্রকাশ করেন যে, নঈতালিমের এটি একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব যে এর ব্যয় এ শিক্ষা নিজেই বহন করতে সমর্থ।[২৩] ১৯৪৭ সালের ২রা মার্চ-এর 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধীজি এ বিষয় নিয়ে বিস্তৃততর আলোচনা করেন। এ প্রবন্ধে তিনি হিসাব করে দেখান যে দৈনিক গড় হাজিরা ৮৫ জন ধরে, এবং কেন্দ্র শিল্প সাহায্যে প্রত্যহ দু'ঘণ্টা উৎপাদন করা হলে, শিক্ষকের বেতন মাসিক ৩৫৲ ক'রে খরচ কুলিয়ে যায়। অবশ্য ছাত্ররা কৃষি, সবজী ইত্যাদি যা উৎপাদন করবে তারও প্রচলিত বাজারদর ধরতে হবে।"[২৪]

গান্ধীজি এদিকটার উপর এত জোর দিতে চান, তার কারণ তিনি নিজেকে 'বেনে' বলে পরিচয় দিতে আনন্দ পান। 'বেনে'র কাছে, যে পরিকল্পনা কাজে লাগানো যাবে না, তা মূল্যহীন। স্যার জন্ সারজেণ্ট ভারতের ভবিষ্যৎ বিনামূল্যে এবং আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে যে পরিকল্পনা (Sargent Scheme) তৈরী করেন তার জন্যে খরচ হিসাব করেছেন দুই শত কোটি টাকা! গান্ধীজি ঠিকই মনে করেছিলেন দেশের বর্তমান অবস্থায় এ খরচ করা সরকারের পক্ষে অসম্ভব। তাই বলে চুপ করে বসে থাকা, আরও অসম্ভব। বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যালয়ে শিক্ষার সবটা খরচ যদি উঠে নাও আসে, তবুও সেটা সরকারের সাধ্যায়ত্ত হবে এবং অবিলম্বেই সমগ্র দেশে বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষার কাজে হাত দেওয়া চলবে।[২৫] জাকীর হুসেন রিপোর্টেও আর একটা কথা ঠিকই বলা হয়েছে—তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেওয়া যায় যে এ শিক্ষা সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর হতে পারবে না, তথাপি এ নূতন শিক্ষানীতির বিচার শিক্ষানীতির আদর্শ ও কার্যকারিতার দিক থেকেই করতে হবে। সে বিচারে নিশ্চয়ই এ শিক্ষাদর্শ গ্রহণীয় বলেই প্রমাণিত হবে।[২৬]

বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এ নিয়ে যে পরীক্ষা হয়েছে তার ফল যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক। ১৯৪৫ সালে সেবাগ্রামে এ বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্যে যে দ্বিতীয় সম্মেলন

---

[২৩] M. K. Gandhi, *Address to the National Edn. Conference*, 1945.

[২৪] M. K. Gandhi, *Harijan*, 2. 3. 47.

[২৫] Priya Ranjan Sen, *Basic Education*. Education Number, Viswa-bharati Qtly., 1947.

[২৬] *Basic National Education*, p. 26.

ডাকা হয় তাতে গান্ধীজি এ পরীক্ষার ফলাফলে সন্তুষ্ট হন এবং তখন স্থির হয় এই মূল আদর্শ অনুযায়ী প্রাক্-বুনিয়াদী ও উত্তর-বুনিয়াদী পরিকল্পনার পাঠক্রম স্থির করতে হবে। এ পাঠক্রম তৈরী করা হয়েছে এবং কয়েকটি নূতন কেন্দ্রে এ নিয়ে কাজও সুরু হয়েছে।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর আবার নূতন করে বুনিয়াদী শিক্ষার দিকে দেশের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। অনেক রাজ্যেই নূতন নূতন কেন্দ্র খোলা হয়েছে। নূতন করে স্বাধীনতার নূতন পরিবেশে কাজ সুরু হয়েছে। কিন্তু গঠনকর্মীর যথেষ্ট অভাব রয়েছে, তাই আজ গান্ধীজির অবর্তমানে তাঁর জীবন্ত ব্যক্তিত্বের উৎসাহদ্যোতক প্রভাব অন্তর্হিত হওয়াতে এ পরীক্ষা ও কাজ অনেক ক্ষেত্রে যান্ত্রিক ও আন্তরিকতাশূন্য হয়ে পড়েছে।

বাঙলাদেশ এ ব্যাপারে পিছিয়ে আছে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি কতকটা কুণ্ঠিতভাবেই যেন সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পাশাপাশি কাজ করে চলেছে—দেশের জীবন থেকে যেন সেগুলি আন্তরিক সমর্থন পাচ্ছে না। দেশের সমগ্র শিক্ষানীতির সঙ্গে এদের সম্পর্ক শিথিল। আর্থিক মানের তারতম্যের জন্যে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা অসন্তুষ্ট। সাংসারিক অনটনে বিব্রত শিক্ষক শুদ্ধ আদর্শের আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হতে পারছেন না।

বাঙলাদেশের মধ্যে বলরামপুর কেন্দ্রের কাজ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এখানে আদর্শে বিশ্বাসী অনলসকর্মী, অভিজ্ঞ শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের উদ্যমে পতিত বনজঙ্গলপূর্ণ জমি পরিষ্কার করে, একটি বলিষ্ঠ ও ক্রমবর্ধমান সুস্থ শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়ে, কাজ চলছে। বলরামপুর কেন্দ্রের শিক্ষক-শিক্ষাকেন্দ্রের বিবরণ থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি, তাতে এ বিদ্যালয়গুলির কাজ বাস্তবিকপক্ষে কি ভাবে চলে, সে সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হবে—

"প্রথম যথন আমরা বলরামপুর আসি, রাস্তাঘাট কিছুই ছিল না। সুতরাং প্রথম দিকে রাস্তাঘাট তৈয়ারি করা, পাথর সরানো, ঘরের সম্মুখস্থ জমি সমান করা এবং পরিষ্কার করা, পতাকা-উত্তোলনের স্থান ইত্যাদি করিতে আমাদের অনেক সময় ব্যয়িত হইয়াছে।

"শিক্ষা-শিবিরে কাজ আরম্ভ হয় ২২শে নভেম্বর হইতে। নভেম্বর মাসে আমরা কেবলমাত্র সাফাই, সূত্রযজ্ঞ, কাতাই, রান্না ও রান্নাঘর এবং এই সকল কাজের, আলোচনা লইয়া কাজ শুরু করি। আমাদের বর্তমান কার্যসূচী

নিম্নলিখিতরূপ: প্রাতে ৪-৩০ টায় শয্যাত্যাগ, ৪-৩০—৫টা প্রাতঃকৃত্যাদি, ৫—৫-১৫ প্রার্থনা, ৫-১৫—৫-৪৫ ব্যায়াম কুচকাওয়াজ, ৫-৪৫—৬-১৫ প্রাতরাশ, ৬-১৫—৭-১৫ সাফাই, ৭-১৫—৭-৪৫ সূত্রযজ্ঞ, ৭-৪৫—১০-১৫ কাতাই, কাতাই বিজ্ঞান, ১০-১৫—১টা স্নান, আহার, বিশ্রাম, ১—১-৩০ দৈনিক কার্য আলোচনা, ১-৩০—৩-১৫ সপ্তাহে ১ ঘণ্টা করিয়া তিন দিন সেলাই, এক দিন কৃষি-বিজ্ঞান, এক দিন শরীর বিজ্ঞান ও খাদ্যতত্ত্ব, ৪৫ মিনিট করিয়া তিন দিন হিন্দী, এক দিন গ্রামের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা, এক দিন দৈনিক কার্যের আলোচনা। শনিবার দিন বৈকালে কোন বর্গ (class) হয় না। বিদ্যার্থীরা সে সময় গ্রন্থাগার ব্যবহার করে বা স্বাধ্যায়ের জন্য ব্যয় করে। রবিবার সকালে সাফাই প্রয়োজন মত ১২/২ ঘণ্টা পর্যন্ত হয়। ৩-৩০—৪-৩০ কৃষিকাজ করা হয়। ৪-৩০—৫-৩০ খেলাধূলা। ৫-৩০—৬টা বিশ্রাম। ৬—৬-১৫ প্রার্থনা, ৬-১৫—৭টা আলোচনা, পত্রিকাপাঠ, ৭—৯-৩০ স্বাধ্যায়, ৯-৩০ নিদ্রা। প্রতি সোমবার ৭-৩০—৮টা পতাকা উত্তোলন হয়।

"সাফাইতে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা হইতেছে: (১) ৫টি খাদ-পাইখানা তৈয়ারি করা ও তাহা সর্বদা ঠিক রাখা, (২) একটি প্রস্রাবখানা টিন দিয়া করা হইয়াছে। এ টিনে জমা প্রস্রাব প্রতিদিন খোলা ক্ষেতে ফেলা হয় এবং তাহার উপর প্রচুর জল ঢালিয়া দিয়া তাহার উপর কাঠকয়লা বিছাইয়া দেওয়া হয়। এখানকার জমি অত্যন্ত নীরস, এই ব্যবস্থায় আমরা যথেষ্ট ফল পাইবার আশা করি। কাঠকয়লায় দুর্গন্ধ হয় না এবং এখন পর্যন্ত এই সকল স্থানে কোন মাছি জন্মায় নাই। (৩) ঝাঁট দেওয়া ময়লা, থুথুর পাত্র পরিষ্কার করিয়া আবর্জনা ফেলার জন্য গর্ত খোঁড়া ও তাহাতে সর্বদা মাটি দেওয়া, তরকারির খোসা ও ভুক্তাবশিষ্ট ফেলিবার জন্য গর্ত খোঁড়া। (৪) থুথু ফেলিবার পাত্র ঠিক রাখা, ঘর বারান্দা ঝাঁট দেওয়া ও লেপা। (৫) উঠান ও ঝাণ্ডাচক পরিষ্কার রাখা, রাস্তা তৈয়ারি করা। (৬) বাসন মাজার স্থান পরিচ্ছন্ন রাখা ও প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করা।

"দৈনিক কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা, বিশেষভাবে সাফাই, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার সমস্যাসমূহের মাধ্যমেই হইয়াছে। প্রতিদিন আধঘণ্টা করিয়া এবং প্রথম দুই সপ্তাহে প্রতিদিন ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট করিয়া আলোচনা হইয়াছে।—(১) কাজ করিতে গেলে কি কি প্রয়োজন? পরিকল্পনা, সরঞ্জাম, নিষ্ঠা ও বুদ্ধি।

(২) নাকোয়া দ্বারা নাক মুখ না ঢাকিয়া ঝাঁট দেওয়ার ক্ষতি। ইহার মাধ্যমে ধূলা ও রোগ, জানা থাকা সত্ত্বেও ঠিকভাবে কাজ না করার কারণের বিশ্লেষণ, থুথুর মারফতে রোগ ছড়াইবার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। সেলাই বর্গে প্রথমেই নাকোয়া বানাইতে শিখানো হইয়াছে। খুরপীর বদলে বাঁশের লাঠি, বাঁশের নাটাই, আসন তৈয়ারি, খড় দিয়া লেপা, চট, তালপাতা, হোগলা ইত্যাদির পাইখানা, প্রস্রাবখানা, ঘরের বেড়া তৈয়ারি, ফেনাইলের অভাবে গোবর, ছাই, ইত্যাদি সামান্য ও সহজপ্রাপ্য জিনিস দ্বারা কি করিয়া চেষ্টা করিলে বহুবিধ সরঞ্জামের অভাব মেটানো যায় তাহা কার্যত দেখান হইয়াছে। (৩) পায়খানা ও প্রস্রাবখানা সাফাই প্রসঙ্গে মূত্র ও বিষ্ঠার রাসায়নিক উপাদান, জমির উপর ইহাদের প্রভাব, এগুলির অবজ্ঞা করিলে আমাদের স্বাস্থ্য ও সম্পদের উপর উহার ফল আলোচনা করা হয়। কি ভাবে ঠিক খাদ খোঁড়া উচিত তাহার মারফতে উদ্ভিদের খাদ্য ও খাদ্য গ্রহণ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। (৪) সাফাইয়ের কাজের পরিকল্পনা করা ও কার্য বণ্টনের ভার সাফাই-মন্ত্রীর উপর। তাহার কাজের আলোচনা প্রসঙ্গে কি করিয়া সময়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা যায় সে কথা ভাবিয়া পূর্ব হইতেই পরিকল্পনা রচনা করিতে হয়, কি ভাবে অল্প সরঞ্জামে অনেক কাজ করিতে পারা যায় ইত্যাদির আলোচনা হইয়াছে। (৫) বাসনপত্র সর্বদা ঠিকভাবে সাফাই হইত না। এই প্রসঙ্গে বর্গে আলোচনা উঠে এবং বাসনের পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য, ছাইয়ের রাসায়নিক উপাদান, তেঁতুল, লেবু ইত্যাদির রাসায়নিক উপাদান, অম্ল ও ক্ষার কি ভাবে দ্রব্য পরিষ্কার করিতে সাহায্য করে এ সকল আলোচনা হয়। এই সম্পর্কে মাটির রাসায়নিক গঠন সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং স্থানীয় বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকা পর্যবেক্ষণ করিয়া বলা হয়। (৬) প্রাতরাশের পরেই লেপা হয়, এজন্য অনেকেই ছড়াইয়া-ফেলা মুড়িগুলি পর্যন্ত ফেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া যায়। এ প্রসঙ্গে ইহার মধ্য দিয়া আমাদের রুচিহীনতা, পরশ্রম-নির্ভরতা ও অন্যকে শোষণ করার প্রবৃত্তি কি রকম দৃঢ়মূল হইয়াছে তাহার আলোচনা করা হয়।

"কাতাই ও কাতাইয়ের শাস্ত্রীয় জ্ঞানের জন্য প্রথমাবধি দৈনিক ৩ ঘণ্টা করিয়া ব্যয় করা হয়। ইহার মধ্যে ½ ঘণ্টা সূত্রযজ্ঞ হয়, বাকি আড়াই ঘণ্টার মধ্যে মোটামুটি ১½ ঘণ্টা কাতাইয়ের ব্যবহারিক শিক্ষা এবং ১ ঘণ্টা কাতাই সম্বন্ধে বহুবিধ আলোচনা হয়।

"বাগানের কাজ প্রথমাবধি ১½ ঘণ্টা করিয়া করা হয়। লাঙ্গল দেওয়ার কাজ ছাড়া সকল কাজই বিদ্যার্থীরা করিয়াছে। সপ্তাহে ১ ঘণ্টা উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের বর্গ হয়। এই বর্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী কাহাকে বলে, কাজ করিতে করিতে কিভাবে সমস্যাগুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যায়, মৃত্তিকার উৎপত্তি ও বিভিন্ন প্রকারের মৃত্তিকা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। বাগানের কাজ করার সময় পোকা চেনা, পোকা বাছাই, ছাইয়ের ব্যবহার, গাছের গোড়া নিড়ানো, জল দিবার প্রক্রিয়া দেখানো ও শিখানো হয়।

"দুইটি সর্তাধীনে এখানকার সমাজ-জীবনে বিদ্যার্থীদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। শর্তগুলি এই :—(১) তাঁহারা বুনিয়াদী শিক্ষার মূলপদ্ধতিগুলির পরিপন্থী কোন কাজ করিতে পারিবেন না। নীতিগুলিকে এই বলিয়া ধরা হইয়াছে—সত্যনিষ্ঠা, অহিংসা ও পারস্পারিক ভালবাসা ও সহযোগিতা, আত্মশ্রম-নির্ভরতা। (২) অধ্যক্ষের অনুমতি ব্যতীত তাঁহারা শিক্ষাশিবিরের কার্যসূচীর অসুবিধা ঘটিতে পারে এমন কোন কাজ হাতে লইবেন না। ইহা মানিয়া লইয়া বিদ্যার্থীরা তাঁহাদের নিয়মতন্ত্র গঠন করিয়াছেন এবং একটি নির্বাচিত মন্ত্রিমণ্ডলীর সাহায্যে এখানকার সমাজ-জীবনের সকল কার্য পরিচালনা করিতেছেন।

"শরীর-বিজ্ঞান ও খাদ্যতত্ত্বের আলোচনাবর্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়—নরদেহতত্ত্ব, বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়া, অস্থি, দন্ত, রক্তসঞ্চালনতন্ত্র, শ্বাসপ্রশ্বাসগ্রহণ, পাচকতন্ত্র, পরিপাকক্রিয়া, খাদ্য, হৃদ্‌পিণ্ড ও ইহার ক্রিয়া।

"হিন্দী-বর্গ তিন সপ্তাহে ৮ দিন হইয়াছে। ঝাণ্ডা-বন্দনার কাজ প্রধান বিদ্যার্থীদের দিয়া করানো হয়। কি ভাবে অধ্যক্ষ, গায়ক ইত্যাদির কাজ করিতে হয় তাহা তাহাদের কাজের মধ্য দিয়া শিখানো হয়। ঝাণ্ডা-বদলের দায়িত্ব, পতাকার অর্থ ও ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা হয়।"

উদ্ধৃত বিবরণ থেকে এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যে এ বিদ্যালয়ের পরিবেশ সুশৃঙ্খল, কর্মময় ও উদ্দেশ্যমুখী। আত্মনির্ভরতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে এ জীবন গড়ে ওঠে। উৎসাহ, নিষ্ঠা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, কর্মকুশলতা, সমাজসেবা ইত্যাদি গুণ বিদ্যার্থীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আনন্দ ও স্বাধীনতার মধ্যে দিয়ে বিদ্যার্থীর উৎসুক মন নিরলস কর্মের মাধ্যমেই শিক্ষা আহরণ করে। এ শিক্ষা সার্থক কারণ তা জীবন-প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত,—নিজ চেষ্টা ও উদ্যমের দ্বারা ও বহুর সহযোগিতায় আহৃত।

যে শিক্ষার্থীরা এ শিক্ষা লাভ করবে, তারা বর্তমান ছাত্রদের মত জীবন-সংগ্রামে অসহায় ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হবে না। এখানে বিদ্যার্থীরা বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবনের অংশীদার। তাদের আলোচনায় যোগদানের অধিকার, সমালোচনার অধিকার স্বীকৃত। তারা নিজেদের শ্রমের মধ্যে দিয়ে বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবনকে পুষ্ট করছে; কাজেই একদিকে তারা আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, অন্যদিকে পরমসহিষ্ণুতা, সহযোগিতা ও শ্রমের মধ্য দিয়ে গঠনের আনন্দ পেতে তারা শিখছে। এটা যুক্তিসঙ্গতভাবেই আশা করা যেতে পারে যে বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের তুলনায় সম্পূর্ণতর মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে।

এ বিষয়ে তুলনামূলক পরীক্ষা কয়েকজন শিক্ষাব্রতী করেছেন। তার মধ্যে পাটনা ট্রেনিং কলেজের শ্রী ইউ. সি. চ্যাটার্জি, চম্পারণের অন্তর্গত বেতিয়া থানায় সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যারা চার বছর পড়েছে, এবং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যারা চার বছর পড়েছে এমন দুটি বৃহৎ দল ছাত্রের বুদ্ধি, জ্ঞান, কর্মকুশলতা ইত্যাদি গুণের তুলনামূলক পরীক্ষা করেন। তাঁর সিদ্ধান্ত হচ্ছে—"বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে চার বৎসর পড়েছে এমন ছাত্রদের বুদ্ধিবৃত্তি ইত্যাদির বিকাশ একই অঞ্চলের অন্যান্য বিদ্যালয়ে যে ছাত্রেরা চার বছর পড়েছে তার চেয়ে বেশী—এ উৎকর্ষ পাঠ, প্রাথমিক বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যনীতি এবং সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অন্যান্য বিষয়ে তাদের তেমন বিশেষ উৎকর্ষ দেখা যায় না।"

দিল্লীর জামিয়া-মিল্লিয়ার বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্পর্কে আর একজন অভিজ্ঞ পরিদর্শক বলেছেন, "এখানের ছাত্রদের জীবন আনন্দময় ও উৎসাহপূর্ণ। এ ছেলেরা বেশ চটপটে, আলাপ-আলোচনায় একেবারেই আড়ষ্ট নয়। কোন কোন ছেলে বরং বয়সের তুলনায় একটু বেশী পাকা। এরা আত্মনির্ভর, প্রত্যুৎপন্নমতি, কৌতূহলী ও সন্তুষ্ট। তবে বইপুস্তকগত সাহিত্যিক শিক্ষা (literary education)-এর ক্ষেত্রে হয়তো এরা অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রের তুলনায় কিছুটা হীন।"

বিহারে বেতিয়া থানার অন্তর্গত রাণীপুর বিদ্যালয়ের সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে ছাত্রদের মত দেওয়া হ'চ্ছে,—

"আগে বাড়ির কাপড়-চোপড় এবং ঘরদুয়ার খুব অপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকত। গ্রামের রাস্তাঘাটও মোটেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল না। এখন আমরা নিজেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকি এবং বাড়িঘর পরিষ্কার রাখবার কাজে মেয়েদের সাহায্য করি। ছেলেদের নিয়ে একটা গ্রাম-সাফাই দল করা হয়েছে। এই দল সপ্তাহে

একদিন করে গ্রামের রাস্তাবাট পরিষ্কার করে। বয়স্ক ছেলেরা প্রথমে দূরে দূরে থাকত। এখন তাদের মধ্যেও অনেকে এসে আমাদের কাজে যোগ দেয়।

"খাওয়া দাওয়ার বিষয়ে আগে কোন সাবধানতা ছিল না। এখন হয়েছে। খাবার না ঢেকেই রেখে দেওয়া হত, বাসি পচা কোন কিছুর বাছ-বিচার ছিল না। এখন আর তা নেই।

"দেশবিদেশের খবর জানবার বা বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করবার কোন আগ্রহ আগে ছিল না। এখন মাষ্টার মশায়দের কাছে এসে অনেকে নানা বিষয়ে অনেক কথা শোনে। গ্রামে সভাসমিতি হলে শুনতে যায়, এবং পরে আবার সেইসব নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে।

"আগে বেশির ভাগ লোকই পড়তে জানত না। যারা পড়তে জানত তাদের পড়ার আগ্রহ ছিল না। এখন আমরা অনেককে পড়তে শিখিয়েছি। গ্রামে লাইব্রেরী হয়েছে। তা থেকে বই নিয়ে অনেকে পড়ে। আমাদের একটা রামায়ণমণ্ডপ আছে, সেখানে সন্ধ্যাবেলায় আমরা রাময়ণ পড়ে শুনাই। মাঝে মাঝে আমরা গ্রামের মধ্যে সভা করি। সভায় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।

"আগে আমাদের কোন কাজেই গ্রামের লেকের কোন উৎসাহ ছিল না। এখন তারা আমাদের গ্রাম পরিষ্কারের কাজে সহায়তা করে। গ্রামের উৎসব প্রভৃতিতে সকলে মিলে মিশে ভাল করে যাতে উৎসব পালিত হয় তার চেষ্টা করে। আমরা অভিনয় প্রভৃতি করলে আগ্রহ করে শুনতে আসে। অনেকে আমাদের অভিনয়ে যোগও দেয়।"

পরিসংহারে পরিদর্শক মন্তব্য করেছেন, "গ্রামের লোকের সাহস বেড়েছে। বাহির থেকে বড় বড় লোক স্কুল দেখতে আসেন। আগেকার দিনে হয়তো ভরসা করে কাছে যেতেই পারতো না। এখন তাঁদের কাছে যায়, কথাবার্তা বলে, আলাপ-আলোচনাও হয়।

"গ্রামে ঝগড়াঝাঁটি কমে গেছে। শিক্ষকেরা গ্রাম্যসমাজের নেতার স্থান গ্রহণ করেছেন। ঝগড়াঝাঁটি বিবাদ-বিসংবাদ হলে লোকে তাঁদের কাছে আসে। তাঁরাই সালিসি করে মিটিয়ে দেন।"[২৭]

উপরোক্ত মন্তব্যগুলি এ নূতন শিক্ষা-নীতির সাফল্যই সূচনা করে।

গান্ধীজি পাশকরা মনোবিজ্ঞানী নন, ছাপমারা শিক্ষাবিদ্‌ও নন। তথাপি

২৭ বিজয়কুমার—বুনিয়াদী-শিক্ষা।

তাঁর মনীষা অসামান্য, ভূয়োদর্শন প্রচুর, দৃষ্টির স্বচ্ছতা অসাধারণ, শিশুর সম্বন্ধে প্রীতি ও সহানুভূতি অপরিসীম। আর নিজে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ না করে, নিজে বারে বারে পরীক্ষা না করে, কোন পরিকল্পনায় তিনি অভ্যস্ত নন। তাই তাঁর শিক্ষানীতিকে অবহেলা করবার উপায় নেই। তিনি তাঁর শিক্ষানীতির খুঁটিনাটি পদ্ধতি ইত্যাদি নির্ধারণকল্পে দেশের কৃতী ও নিষ্ঠাবান মনোবিজ্ঞানীর ও অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদের সাহায্য নিয়েছেন। এ পরিকল্পনা একটা অ্যাকাডেমিক্ পোষাকী প্ল্যান্মাত্র নয়, বাস্তবক্ষেত্রে একে যাচাই করা হয়েছে, বা যাচাই করা হচ্ছে। এর মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি ও শিক্ষানৈতিক ভিত্তি সম্বন্ধে বহু আলোচনা হয়েছে এবং এ ভিত্তি যথেষ্ট দৃঢ় বলেই প্রতিপন্ন হয়েছে।[২৮]

বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি বিরূপ সমালোচনা

কেউ কেউ বলেছেন এ শিক্ষাপদ্ধতিতে ভাল তাঁতী, ভাল ছুতোর মিস্ত্রী তৈরী হতে পারে, কিন্তু এ 'গ্রাম্য' শিক্ষা বৈদগ্ধ্যের (culture) অন্তরায়। এ শিক্ষায় স্বকুমার রুচিবোধ বিকশিত হতে পারে না।

প্রশ্ন হচ্ছে—বৈদগ্ধ্য কাকে বলে? স্বকুমার রুচিই বা কী? গান্ধীজির এ শিক্ষাব্যবস্থা উঁচুদরের শিল্পীসৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়নি একথা স্বীকার্য, কিন্তু এ শিক্ষা স্বকুমার শিক্ষাবোধ-বিরোধী একথা সত্য নয়। এ শিক্ষানীতি মানুষের শোভন মানবিক রুচিবিকাশেরই অনুকূল এবং ব্যক্তির প্রতিভা বিকাশে বিশ্বাসী। তবে প্রচলিত যে সঙ্কীর্ণ ও বিকৃত অর্থে অলস মনের আপাত সৌন্দর্যবোধকে 'বৈদগ্ধ্য' বলে ভুল করা হয়, এ শিক্ষা সে বৈদগ্ধ্যের বিরোধী। যে বৈদগ্ধ্য শুধু মাত্র মুষ্টিমেয় ধনীর অবসর বিনোদনের বিলাস মাত্র, গান্ধীজির শিক্ষানীতি সে বৈদগ্ধ্যের বিরোধী। কিন্তু যে বৈদগ্ধ্য মানুষকে অপরের প্রতি সংবেদনশীল, শ্রদ্ধাশীল করে, যা মানুষের জীবনকে সরল স্বন্দর ও শোভন ভিত্তিতে গড়ে তুলতে আগ্রহী, সে বৈদগ্ধ্যই এ শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য।

বুনিয়াদী শিক্ষার সাধারণ বিদ্যালয়ে পাঠ্য কতকগুলি বিষয়ে ছাত্রেরা ততটা ব্যুৎপত্তিলাভ করবে না তা সম্ভবতঃ সত্য। এ বিষয়ে জেস্যুইটস্-পরিচালিত 'দ্য নিউ রিভিয়ু'-তে বলা হয়েছে, "হস্তশিল্পের মাধ্যমে ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় গ্রামের ছাত্রদের শিক্ষার যে ব্যবস্থা হয়েছে তাতে ভীত হওয়ার কারণ নেই। বরঞ্চ বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে যে কৃত্রিম ও নির্বোধ উপায়ে শিক্ষা

---

২৮ A. N. Basu, *The Psychological Basis of Basic Education.*

দেওয়া হয়ে থাকে তার চেয়ে ওয়ার্ধা পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বাভাবিক পদ্ধতিতে তারা অনেক বেশী ভাল শিক্ষালাভ করবে। তারা হয়তো বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হয় সেগুলি কিছু কম জানবে। কিন্তু যেটুকু তারা জানবে, তা জানবে বুদ্ধিমানের মত, সমগ্রভাবে এবং জীবন্তভাবে। শিক্ষার শেষ উদ্দেশ্য উৎকৃষ্ট মানুষসৃষ্টি,—এ বিষয়ে নিশ্চয়ই বুনিয়াদী শিক্ষা সফল।

এ শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে আর একটি সমালোচনা হচ্ছে যে এতে শিশুর বুদ্ধি ও শক্তির পরিপক্কতা আসবার আগেই সে একটি বিশেষ জীবিকা বা শিল্পকর্ম বেছে নেয়। এ সমালোচনাও সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। এ পদ্ধতিতে একটি মাত্র শিল্পকর্মই এক বিদ্যালয়ে এক অঞ্চলের সব বিদ্যালয়ে শেখানো হবে এমন কোন কথা নেই। বরং স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন শিল্পকর্মের মাধ্যমে শিক্ষারই ব্যবস্থা থাকবে, এটাই এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। কাজেই রুচি, শক্তি ও প্রয়োজন অনুযায়ী শিশু বা তাঁর অভিভাবক ও শিক্ষকেরা তাকে তার উপযুক্ত শিল্পকর্মটি বাছতে সাহায্য করবেন। কেউ কেউ এ অভিযোগ করছেন এ শিক্ষানীতির আহ্বান শুধু 'গ্রামে ফিরে চলো নয়, সমস্ত সভ্যতার দিকে মুখ ফিরিয়ে আদিম মানবের অবস্থায় ফিরে যাও।' গান্ধীজি এ শিক্ষানীতির মধ্য দিয়ে তাঁর যন্ত্র-বিরোধী অবৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় দিচ্ছেন।"

এখানেও প্রশ্ন হচ্ছে 'সভ্যতা' বা 'বিজ্ঞান' কাকে বলে? গান্ধীজি যন্ত্রবিরোধী নন, কিন্তু যন্ত্র যেখানে শোষণ ও উৎপীড়নের উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হয় সেখানে যন্ত্রকে প্রাধান্য দিতে তিনি অনিচ্ছুক। ছাত্রের মন উৎসুক হবে, প্রশ্ন করবে, নূতনকে জানতে আগ্রহান্বিত হবে—তাঁর শিক্ষানীতি এ 'বৈজ্ঞানিক মন' তৈরীরই পরিপোষক। কিন্তু যে 'সভ্যতা' আমাদের যন্ত্রের দাস করে, যে বিজ্ঞান উপকরণ-বাহুল্যে মনের শক্তিকে পঙ্গু করে, তাকে তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন।

কেউ কেউ বলেছেন এ শিক্ষাপ্রণালীতে উপযুক্ত ীংবদ্ধতার (correlation) অভাব। মূল শিল্পকর্মের সঙ্গে অন্যান্য শিক্ষিতব্য বিষয়ের সংযোগ শিথিল।

বরং উল্টে এ কথা বলা চলে গান্ধীজির এ শিক্ষানীতি জীবনের প্রয়োজন ও আগ্রহের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংবদ্ধ এবং এ প্রণালীতে শিক্ষিতব্য বিষয়গুলি জীবন্ত ঐক্যবন্ধনে পরস্পরের সঙ্গে ও মূল শিল্পকর্মের সঙ্গে যুক্ত। জাকীর হুসেন রিপোর্টে এর রচয়িতারা একটি সযত্ন-অঙ্কিত ছবি দিয়ে এ শিক্ষাপ্রণালীর গভীর সুসমঞ্জস সংবদ্ধতা প্রমাণ করেছেন।

এ শিক্ষাবিধির বিরুদ্ধে একটি মারাত্মক অভিযোগ এই যে, এতে ধর্মশিক্ষার কোন স্থান নেই। গান্ধীজি ধর্মকে জীবনের কেন্দ্র বলেই বিবেচনা করেন, তাই তাঁর শিক্ষানীতিতে ধর্মের স্থান না থাকাতে অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

এখানেও প্রশ্ন হচ্ছে 'ধর্ম' ও 'ধর্ম-শিক্ষা' বলতে কি বোঝায়?

অনেক সময় 'ধর্ম' বলতে বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক আচরিত কতকগুলি ক্রিয়া মাত্রকেই ধর্ম বলা হয়ে থাকে,—যেমন হিন্দুর পক্ষে গঙ্গাস্নান, মুসলমানের হজ্-যাত্রা ইত্যাদি। গান্ধীজি ধর্মীয় আচারপালনে বিশ্বাসী হলেও, যে আচারপদ্ধতি ঈশ্বরে গভীর বিশ্বাস, বিশুদ্ধ নৈতিক জীবন ও মানবপ্রীতির মূলভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, যা নিতান্তই বাহ্যিক কতকগুলি অভ্যাস মাত্র, তাকে 'ধর্ম' নাম দিতে গান্ধীজি কুণ্ঠিত। এবং যে ধর্ম-শিক্ষা এই বাহ্যিক আচারের খুঁটিনাটি নিয়েই সর্বদা অতিমাত্রায় ব্যতিব্যস্ত সে শিক্ষা তিনি শুধু নিষ্প্রয়োজন মনে করেন নি, তা হানিকর ও সাম্প্রদায়িক বিরোধের আকর বলে গান্ধীজি তাঁর শিক্ষাবিধি থেকে সযত্নে পরিত্যাগ করেছেন। যাঁরা ইংল্যাণ্ডের এবং য়ুরোপের অন্যান্য দেশের সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্ম-শিক্ষার নাম দিয়ে যে উৎপীড়ন, পরমত-অসহিষ্ণুতা, সাম্প্রদায়িক কলহের কাহিনী জানেন তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে গান্ধীজি ভুল করেন নি। গান্ধীজি নিজে বলেছেন, "লোকে অনেক সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করে থাকেন, কেন আমি ধর্ম-শিক্ষার উপর জোর দেই নি? এর কারণ আমি ছাত্রদের স্বাবলম্বনরূপ প্রকৃত ধর্ম শিক্ষা দিচ্ছি।" বাস্তবিকপক্ষে গান্ধীজির সমগ্র শিক্ষাবিধিই গভীর নৈতিক মূলের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ শিক্ষার উদ্দেশ্য শুচি ও সরল জীবন গঠন, সেবাবুদ্ধি ও মানব-প্রীতির উদ্বোধন। এ শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম-শিক্ষা। তা ছাড়া এ শিক্ষাবিধিতে প্রত্যেক ধর্মের মূলনীতি শিক্ষার জন্যে বিভিন্ন ধর্মের ধর্মনেতা ও মহাপুরুষদের জীবন আলোচনা, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ হ'তে নীতি ও আদর্শবোধ ও সাম্প্রদায়িক প্রীতিবর্ধক নানা সুন্দর কাহিনী আলোচনার ব্যবস্থা আছে। আর সর্বোপরি থাকবে শিক্ষকের নৈতিক জীবনযাপনের জীবন্ত আদর্শ।

কিন্তু তথাপি ধর্ম-আচরণ শিক্ষার প্রয়োজন সম্বন্ধে কেউ কেউ সবল মত পোষণ করে থাকেন। তাঁরা মনে করেন এ শিক্ষা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের শিশুকে শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এটা শিক্ষকের অবশ্য কর্তব্য ও শিশুর একটি মৌলিক অধিকার। তা হলে কি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা আলাদা

বিদ্যালয় গড়ে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকেই উদগ্র করে তুলতে হবে? আমাদের দেশের পক্ষে এ সমস্যা বিশেষ গুরুতর, কারণ এখানে বহু ধর্মমত প্রচলিত। রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণে এ বিরোধ মারাত্মক আকার ধারণ করে। 'নিউ রিভিয়ু' পত্রিকার সম্পাদক 'লাইট্ ফ্রম ওয়ার্ধা'-শীর্ষক মন্তব্যে এ সমস্যা সমাধানের একটি উপায় নির্দেশ করেছেন, "এ প্রাথমিক শিক্ষাবিধি পরিকল্পনা যথোচিত বিবেচনার পর রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত হলে, এর সম্পাদনের ভার উপযুক্ত পরিচালনা সাপেক্ষে বিভিন্ন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মোৎসাহী ও স্থিরমতি প্রতিষ্ঠানদের বিভিন্ন গ্রামকেন্দ্রে এরকম বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হোক। এ শর্ত থাকবে যে মূলনীতি অনুযায়ী পাঠক্রম তাঁরা অনুসরণ করবেন, তবে তাঁদের সম্প্রদায়ের ছাত্রদের বিদ্যালয়ে পাঠের সময়কালে বা তার বাইরে ধর্মীয় শিক্ষা দেবার স্বাধীনতা থাকবে। তবে অন্য সম্প্রদায়ের ছাত্রদের জোর ক'রে এ ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া চলবে না।......উদার দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষকের অধীনে ও উপযুক্ত পরিদর্শনের ব্যবস্থা হলে, এতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছাত্রদের বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়ে বিচ্ছিন্ন করা হবে না। কারণ ধর্মীয় শিক্ষার সময়টুকু ভিন্ন অন্য সবসময় ছাত্রেরা একত্র মিলে মিশে কাজ করবে। খেলাধূলা, গান, দৈহিক পরিশ্রম, আলোচনা, ভাববিনিময়ের মধ্য দিয়ে বিদ্যালয় জীবনের ঐক্যবোধের মধ্য দিয়েই তারা বর্ধিত হবে, তাতে তাদের মনে সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণতা আসতে পারে না।"

অন্যান্য শিক্ষাব্রতীদের সঙ্গে গান্ধীজির তুলনা

রুশোর মত গান্ধীজিও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপ্লবের পক্ষপাতী। দু'জনেই মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বে বিশ্বাসী, দু'জনেই স্বভাব-অনুসারী সরল জীবনের আদর্শে বিশ্বাসী, দু'জনেই শোষণহীন নূতন সমাজ-ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু রুশোর চিন্তা নেতিবাচক, উচ্ছৃঙ্খল ও সহিংস। গান্ধীজির চিন্তা গঠনাত্মক, সত্যাগ্রহী ও অহিংস-ভিত্তিক। রুশোর 'এমিল্' সমাজ-জীবন থেকে বিচ্যুত, একক। গান্ধীজির বিদ্যার্থী বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবনের মঙ্গলময় কর্ম ও চিন্তার অংশভাগী।

পেস্তালৎসী ও মন্তেসরীর মত গান্ধীজির শিক্ষা-পরিকল্পনার মূল দেশের

দরিদ্রদের শিক্ষার বাস্তব প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত। পেস্‌তালৎসীর মত গান্ধীজিও শিক্ষার ক্ষেত্রে নিত্য নব নব পরীক্ষার পক্ষপাতী। দু'জনেই সরল কর্মময় জীবনকে শিশুশিক্ষার ভিত্তি বলে গ্রহণ করেছেন। তবে পেস্‌তালৎসীর মত গান্ধীজি মনোবিজ্ঞানের খুঁটিনাটি তথ্য সম্বন্ধে আগ্রহশীল নন,—আবার হারবার্টের মত শুধুমাত্র শিক্ষাপ্রণালীর উৎকর্ষ বিধানে উৎসাহ নেই। গান্ধীজি চেয়েছেন একটি নূতন সমাজ-জীবনের আদর্শ স্থাপনের উদ্দেশ্যে শিক্ষানীতি ও প্রণালীর আমূল পরিবর্তন।

মন্তেসরী ও ফ্রোএবেল্‌-এর মত শিশুর স্বাভাবিক উৎসাহ, উদ্যম ও কর্ম-প্রেরণাই শিশুশিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন, এ কথা গান্ধীজিও মেনেছেন। তবে মন্তেসরী খেলাকেই এই স্বাভাবিক আগ্রহের কেন্দ্র বলে স্বীকার করে তার উপরই শিক্ষার বুনিয়াদ গড়তে চেয়েছেন। গান্ধীজি মনে করেছেন এ দরিদ্র দেশের পক্ষে, বিশেষ করে যে কর্ম জীবনের মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম, এমন শিল্পকর্মই সহজ ও স্বাভাবিকভাবে শিশুর উৎসাহ উদ্রেক করে, এবং তা কল্যাণাদর্শে সমাজগঠনের সহায়ক হয়। যে ক্রিয়া উৎপাদনধর্মী নয়, গান্ধীজির কাছে তা বিলাস মাত্র। আমাদের মত দরিদ্র দেশে তাই ফ্রোএবেল্‌ ও মন্তেসরীর উপকরণবহুল ও ব্যয়বহুল শিক্ষা দেশের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম নয়।

ফ্রোএবেল্‌ হারবার্টের মত শিক্ষার নৈতিক ভিত্তি সম্বন্ধে গান্ধীজিও অত্যন্ত সচেতন। ফ্রোএবেল্‌ পেস্‌তালৎসীর মত গান্ধীজিও গভীরভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী, কিন্তু শুধুমাত্র তত্ত্বে গান্ধীজি আগ্রহশীল নন এবং সচেতনভাবে কোন বিশেষ ধর্মমত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শিক্ষাকে ব্যবহারের গান্ধীজি পক্ষপাতী নন। গান্ধীজি তাঁর শিক্ষার মধ্য দিয়ে সৎ, সরল, আদর্শনিষ্ঠ, সত্যসন্ধ, মানবপ্রেমিক মানুষই সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, গোঁড়া হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান সৃষ্টি করতে চান নি।

ডিউইর মত গান্ধীজিও বিদ্যালয়কে সমাজ-জীবনের অচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে গ্রহণ করেছেন এবং সমাজসেবাই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য ব'লে নির্দেশ দিচ্ছেন। কিন্তু কাল্পনিক ও ব্যয়সাধ্য 'প্রজেক্ট'-এর মাধ্যমে শিক্ষার পরিবর্তে গান্ধীজি গ্রাম-জীবনে নিত্য প্রয়োজনের উদ্দেশ্যসাধনকেই শিক্ষার উপায় বলে গ্রহণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি দু'জনেই ভারতীয় প্রাচীন আদর্শে গভীরভাবে বিশ্বাসী, কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আদর্শ রবীন্দ্রনাথকে যতটা প্রভাবান্বিত করেছে, গান্ধীজকে ততটা করেনি। বরং বলা যেতে পারে গান্ধীজি পশ্চিমের

মনোমুগ্ধকর আপাতরম্য সভ্যতার মোহ থেকেই দেশকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার ক্ষেত্রে সুকুমার কলা ও শিল্পচর্চা ও সুকুমার রুচি বিকাশকে অনেকখানি স্থান দিয়েছেন, গান্ধীজি জীবনের এই দিকটাকে বরং কিছুটা উপেক্ষাই করেছেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য সুস্থ সমাজ-জীবন গঠন, এ বিষয়ে গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথ একমত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে অধিকতর বিশ্বাসী, গান্ধীজি ব্যক্তিজীবনকে সমাজ-জীবনের সঙ্গে নিবিড়তর সহযোগিতার সম্বন্ধে বন্ধনের পক্ষপাতী। রবীন্দ্রনাথ কবি, গান্ধীজি সন্ন্যাসী। ভারতবর্ষ কবির চেয়ে সাধককে অধিকতর শ্রদ্ধা দিয়েছে, তাই রবীন্দ্রনাথের সমৃদ্ধতর শিক্ষাদর্শ যেখানে সফল হয়নি, গান্ধীজির সরল জীবনের সহজ আদর্শ হয়তো সেখানে সফল হবে।